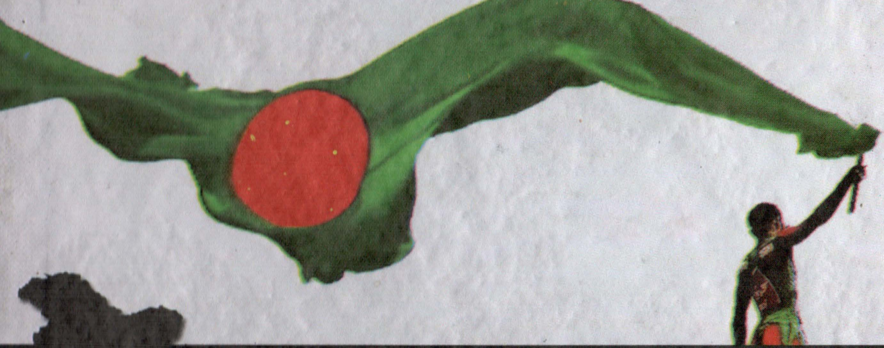
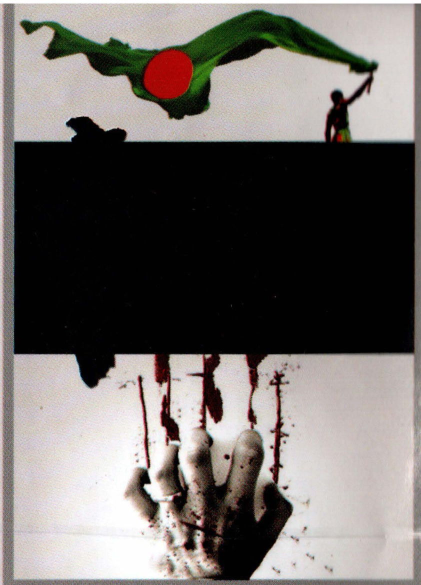


বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারত প্রশ্ন

আনু মুহাম্মদ





বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ ও ভারত বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা এবং ৬০ দশক বিষয়ে প্রবন্ধ নিয়ে এই গ্রন্থ সংকলিত করা হয়েছে। ৬০ দশক প্রবন্ধে পাকিস্তান রাষ্ট্র, সাম্রাজ্যবাদ ও সামরিক শাসন আশ্রিত শাসক শ্রেণী, জাতিগত নিপীড়ন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ধারার বিশদ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক বক্তৃতায় মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নানাদিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যুক্ত করা হয়েছে। 'ধর্মের নানা ভাষা...' শীর্ষক বক্তৃতায় স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের বিকাশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক যোগসূত্র অনুসন্ধান করা হয়েছে। ভারত নিয়ে দুটো বক্তৃতায় প্রধানত বাংলাদেশে ও দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতপ্রশ্ন আলোচনা করা হয়েছে। শেষ বক্তৃতায় সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার ধারাবাহিকতা ও নানা পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে এনজিও, ধর্মপন্থী ও বাম আন্দোলন নিয়েও আলোচনা আছে। জনগণের চিন্তা ও লড়াই-এর গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো আলোচনায় আনা হয়েছে। বর্তমান সময়ের বিশ্বব্যবস্থা, দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির অনেকগুলো দিক বিশ্লেষণে এই গ্রন্থটি সমৃদ্ধ।

প্রচ্ছদ :: সহিদুল ইসলাম রনি



আনু মুহাম্মদ

শিক্ষক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ই-মেইলঃ anujuniv@gmail.com

প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আছে:

বিশ্ব পুঁজিবাদ ও বাংলাদেশের অনুন্নয়ন। বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজ। বাংলাদেশের উন্নয়ন সংকট এবং এনজিও মডেল। বাংলাদেশের কোটিপতি, মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক। অনুন্নত দেশে সমাজতন্ত্র: সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতা। ক্রান্তিকালীন বিশ্ব অর্থনীতি ও উন্নয়ন সাম্রাজ্য। পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ ও অনুন্নত বিশ্ব। সমাজ, সময় ও মানুষের লড়াই। ধর্ম, রাষ্ট্র ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন। বাংলাদেশের উন্নয়ন কি অসম্ভব? কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার ও বহুজাতিক মানুষের। নারী, পুরুষ ও সমাজ। রাষ্ট্র ও রাজনীতি: বাংলাদেশের দুই দশক। বাংলাদেশের অর্থনীতির চালচিত্র। আতঙ্কের সমাজ সন্ত্রাসের অর্থনীতি। সত্তর দশকে। অর্থশাস্ত্র পরিচয়। বাংলাদেশের তেল-গ্যাস: কার সম্পদ কার বিপদ। বিশ্বায়নের বৈপরীত্য। বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিমুখ। মানুষের সমাজ। উন্নয়নের রাজনীতি। বিপ্লবের স্বপ্নভূমি কিউবা: বিশ্বায়িত পুঁজিবাদে ল্যাটিন আমেরিকা। ফুলবাড়ী, কানসাট, গার্মেন্টস ২০০৬। কোথায় যাচ্ছে বাংলাদেশ। Development or Destruction, Essays on Global Hegemony, Corporate Grabbing and Bangladesh। পুঁজির অন্তর্গত প্রবণতা: মানুষ সম্পদ ও প্রকৃতি। সামরিক শাসনের দশকে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ ও ভারত প্রশ্ন
আনু মুহাম্মদ

প্রকাশক
আবদুল মালেক
নবরাগ প্রকাশনী
বাবুল টাওয়ার
৩৫ বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা-১০০০
মোবাইল : ০১৫৫২-৪৯১৯৮৫, ৭৪৫৩০১৭
e-mail : nabaragprokashani@gmail.com

প্রচ্ছদ
শহিদুল ইসলাম রনি

প্রকাশকাল : জুলাই ২০১৪

বর্ণবিন্যাস
বীথি রহমান
২৫/সি দীননাথ সেন রোড, ঢাকা

মুদ্রণ
জননী প্রিন্টার্স
১৯ প্রতাপ দাস লেন

মূল্য : ৩০০ টাকা মাত্র।

Bangladesher Muktijuddo, Samragobad O Varot Prosno by Anu Muhammad. Published by NABARAG PROKASHANI, Babul Towr, 35 Banglabazar (First Floor) Dhaka-1100, Bangladesh. Copy Right Writer. Date of Publication : July 2014.'Price: Tk. 300 Only.US$ 12.

ISBN -978-984-8401-98-9

উৎসর্গ

মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান ময়না।

আমার বড়ভাই, যিনি কিশোর বয়স থেকে নিজের শিক্ষা ও পেশাগত জীবন তুচ্ছ করে বন্ধুদের নিয়ে পল্লীমা সংসদের মতো একটি বহুমুখি সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও বিকশিত করেছেন। 'শহীদ বাকী স্মৃতি পাঠাগার' ও 'শহীদ বাবুল শিশু একাডেমী'সহ এই সংসদ এখন কিশোর তরুণদের সামাজিক তৎপরতার একটি অনন্য কেন্দ্র। এসব সংগঠনে সক্রিয় থেকেই ৬০ বছরে পা দিয়েছেন তিনি।

এবং

মুহাম্মদ লুৎফর রহমান
মুহাম্মদ ফজলুর রহমান
মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান
মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান

আমার ছোট ভাইয়েরা, জ্ঞান হবার পর থেকেই যারা এসব সংগঠনে সাধ্যমতো ভূমিকা রেখেছেন।

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ ও ভারত বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা এবং ৬০ দশক বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধ নিয়ে এই গ্রন্থ সংকলিত করা হয়েছে। ৬০ দশক বস্তুত বাংলাদেশের ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের জমিন তৈরি করেছে। এই প্রবন্ধে পাকিস্তান রাষ্ট্র, সাম্রাজ্যবাদ ও সামরিক শাসন আশ্রিত শাসক শ্রেণী, জাতিগত নিপীড়ন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ধারার বিশদ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক বক্তৃতায় মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নানাদিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যুক্ত করা হয়েছে। যার মধ্য দিয়ে ১৯৭১ এর কিশোর বয়সীদেরও মুক্তিযুদ্ধ কীভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলো, সক্রিয় করেছিলো তা অনুধাবন করা সম্ভব। হুমায়ূন আজাদের ওপর সন্ত্রাসী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত 'ধর্মের নানা ভাষা..' শীর্ষক বক্তৃতায় স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের বিকাশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক যোগসূত্র অনুসন্ধান করা হয়েছে। এখানে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের ফ্যাসিবাদী জালে ধর্মীয় শক্তির ভূমিকা কীভাবে নিপীড়কদের সহযোগী হয়ে দাঁড়ায়, আবার জাল থেকে মুক্ত থাকলে কীভাবে বিপরীত কণ্ঠ সম্ভব সে বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে। ভারত নিয়ে দুটো বক্তৃতায় প্রধানত বাংলাদেশে ও দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতপ্রশ্ন আলোচনা করা হয়েছে। ভারত সম্পর্কে দুই ভুল বয়ান ও তিন মিথ বিশ্লেষণ করে সেগুলো খন্ডন এবং ভারতের জনগণের সাথে মুক্ত দক্ষিণ এশিয়া প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ লড়াইএর তাগিদ এই দুটি বক্তৃতারই কেন্দ্রীয় বক্তব্য। শেষ বক্তৃতায় সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার ধারাবাহিকতা ও নানা পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে এনজিও, ধর্মপন্থী ও বাম আন্দোলন নিয়েও আলোচনা আছে। জনগণের চিন্তা ও লড়াইএর গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো আলোচনায় আনা হয়েছে।

যাঁরা বক্তৃতাগুলো আয়োজন করেছেন, যাঁরা অনেক কষ্ট করে এগুলোর অনুলিখন করেছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। এই গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগ নেবার জন্য নবরাগ প্রকাশনীকেও ধন্যবাদ।

৮ আগস্ট ২০১৪

আনু মুহাম্মদ
অর্থনীতি বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
anujuniv@gmail.com

সূচী

৬০ দশক : বাংলাদেশের প্রস্তুতি

১৯৬০ দশক নিয়ে ঐ দশকের পাকিস্তানের প্রবাসী ছাত্রনেতা তারিক আলী একটা বই লিখেছিলেন। নাম দিয়েছিলেন '*স্ট্রীট ফাইটিং ইয়ারস*'। আসলেই ঠিক। ঐ দশককে এক নামে অভিহিত করতে গেলে এই নামটি যথার্থ। বাংলাদেশ তখন পাকিস্তানের অংশ, পূর্ব পাকিস্তান। সেই পাকিস্তানেও পৃথিবীর অন্য অনেক দেশের মতো এরকম অবস্থাই ছিল। ৬০ দশক একদিকে ছিল দেশে দেশে সামরিক শাসন জারীর মাধ্যমে মার্কিন নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী কেন্দ্রের আধিপত্য বিস্তারের সময়। সদ্য স্বাধীন দেশগুলোর অনেকগুলোই তখন নতুন শৃঙ্খলে বন্দী হবার পথে, তারই একটি প্রকাশ ছিল মার্কিনপন্থী সামরিক অভ্যুত্থান। আবার একই সময়কাল ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও সামরিক বা অন্যধরনের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনবিরোধী আন্দোলনের বিস্তারেরও সময়।

বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিত : নতুন দখল ও বিদ্রোহ

কোরিয়ায় পরাজয়ের পর যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে তার ধ্বংস ও আগ্রাসনের সর্বশক্তি নিয়োগ করে। লক্ষ লক্ষ মার্কিন সৈন্য ভিয়েতনামে নিয়ে যাওয়া হয়, সর্বাধুনিক মানব ও পরিবেশ বিধ্বংসী অস্ত্র প্রয়োগ করা হতে থাকে। ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয় ভিয়েতনাম, লক্ষ লক্ষ নারীপুরুষ শিশু বৃদ্ধ নিহত হন, বিষাক্ত বোমায় পুরো দেশ যেভাবে ক্ষতবিক্ষত হয় যেভাবে মাটি পানি বৃক্ষরাজি বিষাক্ত হয় তার চিহ্ন এখনও আছে। এখনও অনেকের শরীরে এমনকি পরের প্রজন্মের অনেক মানুষও সেই আক্রমণের ক্ষত বহন করে চলেছেন। কিন্তু সারা দুনিয়ার মানুষের মাথা উঁচু করে দিয়ে পৃথিবীর বৃহত্তম, সবচাইতে শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে মাসের পর মাস বছরের পর বছর লড়াই করে গেছেন ভিয়েতনামের মানুষ। সেই লড়াই এতই তাপ সৃষ্টি করেছিল যে সারা দুনিয়ায় মার্কিন বিরোধী আন্দোলন সংগ্রামও অনেক বেড়ে যায়। তা বিশ্বব্যাপী সামগ্রিক বিপ্লবী আন্দোলনকেই সমৃদ্ধ করে। ভিয়েতনামের জনগণের প্রতিরোধের মুখে বহু মার্কিন সৈন্য নিহত হবার ফলে যুক্তরাষ্ট্রেও অভূতপূর্ব সর্বব্যাপী যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন সৃষ্টি হয়।

পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার কেন্দ্র দেশগুলির তরুণদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী নীতি ও কর্মসূচি বিরোধী চেতনা ও সক্রিয়তা অনেকগুণে বেড়ে যায় এই দশকে। এই চেতনা ও সক্রিয়তা আরও সমৃদ্ধ হয় এসব দেশের মধ্যেকার নানা বৈষম্য ও

নিপীড়ন বিরোধী উপাদান এর মধ্যে যুক্ত হওয়ায়। প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা সেসময়ের ইউরোপ উত্তর আমেরিকার তরুণদের মধ্যেও প্রধান প্রবণতা হয়ে ওঠে। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্রে বিরাট বিরাট ছাত্র আন্দোলনের জন্ম হয়। যুক্তরাষ্ট্রে হিপ্পি প্রজন্মও যুদ্ধ বিরোধিতার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠে। ৬০ দশকে যুক্তরাষ্ট্রে একদিকে যুদ্ধ বিরোধিতা অন্যদিকে দেশের ভেতর বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন বিস্তারের সঙ্গে সমাজে ক্রমাগত বিপ্লবী চিন্তাচেতনা ও সংগঠন শক্তিশালী হওয়ার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। বিপ্লবী আন্দোলন আর তার মতাদর্শ সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা প্রকাশনা বিতর্ক ইত্যাদিও ক্রমে জোরদার হচ্ছিল তখন।

সেসময় যুক্তরাষ্ট্রে কিংবা পশ্চিম ইউরোপের এমন কোন বিশ্ববিদ্যালয় খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল যেখানে কোন না কোন মাত্রায় বিপ্লবী সংগঠন বা তৎপরতা ছিল না। তরুণ শিক্ষার্থী, শিক্ষক, লেখক, শিল্পীদের মধ্যে এর প্রভাব ছিল খুবই স্পষ্ট। শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত চলচ্চিত্রে নতুন সৃষ্টিশীলতার ঢেউ তৈরি হয়েছে। একটি বিপ্লবী রূপান্তরের সংগ্রাম অত্যাবশ্যক এবং এতে অংশগ্রহণ করতে হবে এই তাগিদ নিয়ে তরুণ সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তখন অস্থির। যুক্তরাষ্ট্রে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরোধিতার মধ্য দিয়ে এই আকাঙ্খা আর সক্রিয়তা এত বেড়েছিল যে, মার্কিন প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত গোয়েন্দা সংস্থাগুলো প্রেসিডেন্টকে শুধুমাত্র সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রিত এলাকা ছাড়া অন্য কোথাও প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে যোগ দিতেও নিষেধ করেছিল।

এই ৬০ দশকে রাষ্ট্র পর্যায়েও তখন মার্কিন বিরোধী বিভিন্ন জোট গড়ে উঠছিল। সমাজতান্ত্রিক জোটের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে জোট নিরপেক্ষ জোট। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অবস্থান নিয়ে মিশরের জামাল আবদেল নাসের, আলজিরিয়ার হুয়ারি বুমেদিন, ইন্দোনেশিয়ার সুকার্ণো, লিবিয়ার গাদ্দাফির পাশাপাশি বিপ্লবী নেতা হিসেবে চীনের মাও সে তুং, ভিয়েতনামের হো চি মিন, কিউবার ফিদেল ক্যাস্ট্রো, চে গুয়েভারা, কঙ্গোর প্যাট্রিস লুমুম্বা, তানজানিয়ার জুলিয়াস নায়ারেরে বিশ্বের বিপ্লবীদের কাছে শুধু নয় সাধারণভাবে তরুণদের কাছে এককজন নায়ক। দিকে দিকে স্বাধীনতা যুদ্ধ, সমাজ বদলের সংগ্রাম ইত্যাদিতে তাঁদের নাম উচ্চারিত হয়।

কিউবার নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিপ্লবী দুনিয়ায় নতুন এক শক্তি হিসেবে কিউবা তখন যুক্তরাষ্ট্রের উঠানে হাজির, মোকাবিলা করছে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক হুমকি, সামরিক অর্থনৈতিক অবরোধ। এশিয়া আফ্রিকা ল্যাটিন আমেরিকা তখন একনামে উচ্চারিত হয়- বিপ্লবের ক্ষেত্র হিসেবে। অনেকে তাই এই দশককে যখন বলেন লাল দশক তখন তা সময়ের ধার ধারণ করেই বলেন। এই দশকেই তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে কৃষিতে বহুজাতিক সংস্থার দখল অভিযান শুরু হয় যে কর্মসূচি দিয়ে তাকে 'সবুজ বিপ্লব' নাম দেয়া তাই কোন নিরীহ ব্যাপার ছিল

না। জনগণের লাল বিপ্লবের বিপরীতে দাঁড় করানো হয়েছিল শাসকদের সাম্রাজ্যবাদীদের তথাকথিত সবুজ বিপ্লব।

বাংলাদেশ বা সেই সময়ের পূর্ব পাকিস্তানও তখন প্রত্যক্ষ করেছে চিন্তা, বুদ্ধিবৃত্তি, সংগঠন, মুক্ত সমাজের স্বপ্ন ও লড়াই এর এক সজীব দশক। পুরো পাকিস্তানই এই দশকে টালমাটাল ছিল, পথ খুঁজেছে নানাদিকে। একদিকে বিপ্লবীরা কাজ করেছেন বিপ্লবী আন্দোলন বিস্তারের, অন্যদিকে সেই সময়েই জাতিগত বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে ক্রমে শক্তিশালী হয়েছে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। এই দুই কখনো এক সঙ্গে প্রবাহিত হয়েছে কখনো বিরোধিতায় পতিত হয়েছে। সবশেষে জাতীয়তাবাদী স্রোতই শক্তিশালী হয়েছে। কীভাবে হয়েছে এবং কীভাবে শ্রেণী আন্দোলন ও নতুন সমাজের আকাঙ্খা বা বিপ্লবী তৎপরতাও বাঙালী মালিকদের প্রভাবিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়লো তার এক অসাধারণ বিশ্লেষণ পাওয়া যায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উপন্যাস '*চিলেকোঠার সেপাই*' এ।

জিন্নাহর স্বপ্নভঙ্গ ও পাকিস্তানের ভুল যাত্রা

১৯৪৭ সালে রক্তাক্ত ভারত বিভাগের পর খন্ডিত ভারত ক্রমে একটি স্থিতিশীল রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে সক্ষম হলেও নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান সেরকম কোন কাঠামো গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। রাষ্ট্র হিসেবে প্রথম থেকেই তার একটা পরিচয় সংকট দেখা দেয়, অস্থিতিশীলতা গ্রাস করে। এর আগে বিশ শতকের প্রথম থেকেই, ভারতবর্ষে বর্ণহিন্দুদের সাম্প্রদায়িক বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষার বিষয় ক্রমে সর্বস্তরের মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয় হতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে শ্রেণীগত নিপীড়নও ধর্মীয় নিপীড়নের আকারেই হাজির হতে থাকে। উদীয়মান শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্তের মধ্যে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ক্রমেই দানা বাঁধতে থাকে। নিপীড়ন, বৈষম্য ও তা নিয়ে অসন্তোষ এর উপর ভর করেই মুসলমানদের স্বতন্ত্র বাসভূমি হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার হয়।

বৃটিশদের জন্য হিন্দু মুসলমান এই বিভক্তি ও সংঘাত ছিল খুবই সুবিধাজনক। বৃটিশ বিরোধী অসাম্প্রদায়িক আন্দোলন এতে শুধু বিপর্যস্তই হয়নি কৃষক শ্রমিক আন্দোলনও অনেক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক এজেন্ডার মধ্যে হারিয়ে যায়। আর বৃটিশ পৌরহিত্যে যেভাবে ভারত ভাগ হয় তাতে এই অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী ভিত্তি স্থায়ী করবার ক্ষেত্র পাকাপোক্ত হয়। কেবিনেট মিশন ব্যর্থ হবার পর, বাংলা নামে ভিন্ন রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত ভাগ হয়ে মুসলমানদের বাসভূমি হিসেবে পাকিস্তান এর উদ্ভব হয়।

কাশ্মীর এবং পাঞ্জাবের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাও তখন বিভক্ত হয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে ভোটের মাধ্যমেই পূর্ব বাংলা যুক্ত হয় পাকিস্তানে। দেশভাগের কারণে বিপুলসংখ্যক মুসলমান ভারত থেকে পাকিস্তানে এবং বিপুলসংখ্যক মুসলমান পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে যাওয়ার ঘটনা এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়, রক্তপাত ও বিদ্বেষের জন্ম দেয়। এর সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ দেখা দেয় বাংলা এবং পাঞ্জাবে। কাশ্মীরের বিভক্তির পর তা নিয়ে দুই দেশের সংঘাত এবং কাশ্মীরীদের দুর্ভোগ এতো বছর পরে এখনও চলছে। খেয়াল করবার বিষয় যে, যে সংখ্যক মুসলমান নিয়ে মুসলমানদের রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হলো তার প্রায় সমসংখ্যক মুসলমান ভারতেই থেকে গেলেন। আবার মুসলমানদের বাসভূমি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম দুই প্রান্তেই উল্লেখযোগ্যসংখ্যক হিন্দু জনগোষ্ঠী নিজেদের জন্মভূমি ত্যাগ না করবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যেই এর রাষ্ট্রচরিত্র নিয়ে বিভিন্ন মত দেখা দেয়। জন্মের প্রেক্ষাপটের কারণেই প্রবল মত ছিল পাকিস্তানকে একটি ধর্মরাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার। কিন্তু প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে ১৯৪৭ সালের ১১ আগষ্ট প্রথম সংবিধান সভায় প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মুহম্মদ আলী জিন্নাহ যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন তা ছিল স্পষ্টতই এর বিপরীত। তিনি স্পষ্ট করেই পাকিস্তানের সকল নাগরিককে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আপনারা স্বাধীন; আপনারা আপনাদের ধর্মস্থানে যাবার ক্ষেত্রে স্বাধীন। আপনারা যে কোন ধর্ম বা বর্ণ বা বিশ্বাস ধারণ করেন না কেন তার সাথে রাষ্ট্রের কোন সম্পর্ক নেই।' আরও বললেন, 'সময়ে হিন্দুরা আর হিন্দু থাকবে না এবং মুসলমানরাও আর মুসলমান থাকবে না, ধর্মীয় অর্থে নয়, কেননা তা প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব বিশ্বাসের ব্যাপার, তা হবে রাজনৈতিক অর্থে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে।'

(http://www.pakistan.gov.pk/Quaid/speech03.htm)

এই বক্তৃতার ১৩ মাস পর ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মুহম্মদ আলী জিন্নাহ মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যু পাকিস্তানে নেতৃত্বের সংকট শুধু বৃদ্ধি করেনি পাকিস্তানের পরিচয় সংকটও ঘনীভূত করে। পাকিস্তান আন্দোলনের মূল বক্তব্য ছিল মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা করবার জন্য পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। রাষ্ট্র সম্পর্কে জিন্নাহর এই উত্তর-চিন্তা তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে তেমন কোন প্রভাব রাখতে পারেনি, রাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করবার মতো আর নতুন কোন ধারাও সৃষ্টি হয়নি। উপরন্তু মুসলিম লীগের মধ্যে সামন্তপ্রভুদের একচ্ছত্র আধিপত্য, এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিতে ব্যর্থ হবার ফলে ক্রমে রাষ্ট্রযন্ত্রে সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণই সুদৃঢ় হয়। পাকিস্তানের ক্ষমতা তাদের হাতেই কেন্দ্রীভূত হয়। আবুল মনসুর আহমদের *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর* এবং

সদ্য প্রকাশিত শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* ঐ সময়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দলিল। এই অবস্থা থেকে পাকিস্তান আর কখনোই মুক্তি পায়নি। এখনও নয়।

ক্ষমতার তিনখুঁটি ও বশ্যরাষ্ট্রে রূপান্তর

পাকিস্তানের এই দশালাভে তৎকালীন বিশ্ব রাজনীতি ও ক্ষমতা গতিপ্রকৃতিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে ইউরোপের পুরনো ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে। যুদ্ধের পর আভ্যন্তরীণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বহু উপনিবেশ এক একে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হতে থাকে। এই জোয়ারের সময়ে অন্য অনেক দেশের মতো ভারত ও পাকিস্তানও বৃটিশ আধিপত্য থেকে মুক্তিলাভ করে। তবে এই সময়কালে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র আর অপরিবর্তিত থাকেনি। বৃটিশ সাম্রাজ্য তখন অস্তমিত, নতুন পরিপ্রেক্ষিতে তার অবস্থা বিদায়ী সর্দারের মতো। বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নতুন সর্দার হিসেবে ততদিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবির্ভূত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে একমাত্র অক্ষত এই বৃহৎ শক্তি তখন বৃটিশ সাবেক উপনিবেশগুলোতে নিজের ক্ষমতার জাল তৈরিতে ব্যস্ত।

কিন্তু পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে পুনর্বিন্যস্ত হতে থাকলেও এই কেন্দ্র তখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো না। কেননা ততদিনে বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রধান দুই শক্তির একটি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ১৯৪৯ সালে সংঘটিত চীন বিপ্লব পুরো এশিয়ায় শুধু নয় সারা বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকেই শক্তিশালী করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, পূর্ব ইউরোপ, কিউবা মিলে একটি শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক বলয় বিশ্ব রাজনীতি ও বিভিন্ন অঞ্চলে জনগণের চিন্তা ও লড়াইকে তখন প্রবলভাবে প্রভাবিত করছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতান্ত্রিক বিস্তার ঠেকানোর জন্য পুঁজিবাদী বিশ্বের সর্দার হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র সামরিক অর্থনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠায় আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করে। এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য তার দরকার ছিল বিভিন্ন দেশে তার জন্য প্রতিকূল সরকার উচ্ছেদ এবং সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন সরকার ও শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এর জন্য দরকার ছিল কোন না কোন ধরনের স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা যার মাধ্যমে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা তুলনামূলকভাবে সহজ। আর দরকার ছিল সেসব দেশের অর্থনীতি ও শিক্ষা মিডিয়াসহ বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের উপর পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করা। এই কাজ করবার জন্য যে সামরিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা দরকার তা পুঁজিবাদী পশ্চিমা বিশ্বে তখন একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেরই ছিল।

১৯৫০ এ কোরিয়া যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র কার্যত পরাজিত হলেও দক্ষিণ কোরিয়ায় নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ১৯৫৩ সালে ইরানে নির্বাচিত মোসাদ্দেক সরকারকে হটিয়ে তারা শাহানশাহ-র মাধ্যমে একটি বশ্য সরকার প্রতিষ্ঠা করে। তাইওয়ান দিয়ে চীনের বিপরীত শক্তি প্রতিষ্ঠা করে। ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক রাখলেও মার্কিন মডেল -এর মধ্যে প্রবেশে সম্মত হয়নি। বরঞ্চ অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষত পরিকল্পিত ভারীশিল্প ভিত্তিক উন্নয়নে ভারত ক্রমে সোভিয়েত সমর্থনে অগ্রসর হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমে পাকিস্তান হয়ে দাঁড়ায় দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিনী প্রধান অবলম্বন। পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি মার্কিন অনুকূল ছিল বরাবর। পাকিস্তানকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখবার জন্য তাদের দরকার ছিল তল্পীবাহক আমলাতন্ত্র এবং সামরিক বাহিনী। এবং বলাই বাহুল্য, পাকিস্তানের এই দুই গোষ্ঠীই ছিল পশ্চিমা ক্ষমতার প্রত্যক্ষ স্থানীয় প্রতিনিধি। প্রশিক্ষণ, বিদেশী সাহায্য, বিদেশ সফর, বৃত্তি ইত্যাদি মাধ্যমে এই সম্পর্কটিই পুনরুৎপাদিত হয়েছে বরাবর। এর মধ্য দিয়ে পাকিস্তানে রাজনৈতিক দলসহ অন্যান্য সামাজিক শক্তির তুলনায় বেঢপ মাত্রায় বিকশিত ও মোটাতাজা হয় সামরিক বাহিনী ও আমলাতন্ত্র, যাকে হামজা আলাভী বলেছেন 'অতিবিকশিত' বা 'ওভারডেভেলপড'।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই ভারত পাকিস্তানের জন্য হুমকি ছিল। এই হুমকি বা নিরাপত্তাহীনতার বোধ কাজে লাগিয়ে পাকিস্তানে একদিকে সামরিক বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি, রাজনীতি ও প্রশাসনে তাদের আধিপত্যবৃদ্ধিকে বৈধতা দেয়া হয়েছে এবং অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আপাদমস্তক শৃঙ্খলিত অবস্থান তৈরি হয়েছে। ১৯৫৪ সালের মধ্যেই পাকিস্তান দুটো সামরিক চুক্তিতে যুক্ত হয়। একটি সিয়াটো, আরেকটি সেন্টো যা বাগদাদ চুক্তি নামেও পরিচিত, পরে যা থেকে ইরাক সরে যায়। পাকিস্তান, ইরান এবং তুরস্ক নিয়ে মার্কিনী সামরিক বলয় বরাবর কার্যকর ছিল। পাকিস্তানের নিরাপত্তার নামেই এগুলো করা হয়েছে। তবে এটা এখানে মনে রাখতে হবে যে, যুক্তরাষ্ট্র যখন পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্য সামরিক বাহিনীর অস্ত্র প্রশিক্ষণ যোগান দেবার মাধ্যমে স্থায়ী নির্ভরশীলতার বন্ধন তৈরি করছে ঠিক সেই সময়ে ভারতকেও তারা প্রতিরক্ষা সমর্থন দিয়েছে। আইয়ুব খান তাঁর '*প্রভু নয় বন্ধু*' (সৈয়দ আলী আহসান অনূদিত) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, কীভাবে যুক্তরাষ্ট্র একই সঙ্গে দুই রাষ্ট্রকেই সামরিক সমর্থন দিয়ে গেছে। ১৯৬২ সালে ভারত চীনের যুদ্ধের পর ভারতের সঙ্গে মার্কিন সামরিক ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। ভারত একদিকে যুক্তরাষ্ট্র অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন দুদিকের সমর্থনই গ্রহণ করতে থাকে। আইয়ুব খান সোভিয়েত ইউনিযনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন করতে চেষ্টা করলেও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক চুক্তি থাকায় তা খুব অগ্রসর হযনি। তখন থেকে এখন পর্যন্ত পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রকে প্রয়োজন অনুযায়ী সব সার্ভিসই দিয়েছে, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র ভারতের

সঙ্গে তার অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামরিক সম্পর্ক বহাল রেখেছে অধিক গুরুত্বের সঙ্গে।

দেশের ভেতর ও বাইরের শর্তাবলী মিলিয়ে তাই পাকিস্তানে কখনোই রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া দাঁড়াতে পারেনি। এই ব্যাপারে যেকোন উদ্যোগই শুরুতেই আক্রান্ত হয়েছে। পাকিস্তানের ক্ষমতার তিন খুঁটি - সামন্তপ্রভু, আমলাতন্ত্র এবং সামরিক বাহিনী, এগুলো কেন্দ্রীভূত ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে, প্রধানত পাঞ্জাবে। এই ক্ষমতায় আবার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কোন শরীকানা ছিল না। সামরিক বাহিনীতে এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনেও আধিক্য ছিল পশ্চিমাদেরই। তার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ এই ক্ষমতা বিন্যাসের জন্য যে নিপীড়ন আর ভোগান্তির শিকার হয়েছেন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ পেয়েছেন তার থেকে একটি বাড়তি - জাতিগত বিদ্বেষ, বৈষম্য আর নিপীড়ন।

পাকিস্তান প্রকল্পের ফাটল

মাঝখানে ভারত রেখে ১২০০ মাইল দূরের দুই অঞ্চল নিয়ে একটি দেশ এমনিতেই ছিল একটি উচ্চাভিলাষী প্রকল্প। 'সব মুসলমান ভাই ভাই' এই অনুমিতির উপরই এই প্রকল্প দাঁড়িয়েছিল। ধারণা ছিল এই যে, এই দেশে মুসলমানরা, তাদের ভাষা বা গায়ের রং যাই থাকুক না কেন তারা সমান মর্যাদা নিয়ে থাকবে। মুসলমান হিসেবে বর্ণ হিন্দুদের কাছে অপমান ঘাড়ধাক্কা খেয়ে খেয়ে বাঙালী মুসলমানের মধ্যে এই সমাধানই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। পাকিস্তানের সমর্থন ভিত্তিও অনেকখানি নির্ভরশীল ছিল বাঙালী মুসলমানের সমর্থনের উপরই। কিন্তু আরেকটি বড় আঘাত তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ছোটবড় নানা ঘটনা, সরকারি নীতি ও কর্মসূচি, সরকারি ক্ষমতাবানদের ভাষ্য, বিভিন্ন ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় এই বিষয়গুলি ক্রমে স্পষ্ট হয় যে এই অঞ্চলের মুসলমানেরা পাকিস্তানী ও মুসলমান পরিচয় নিয়ে অন্যদের সাথে সম্পর্ক গঠনে আগ্রহী হলেও পাকিস্তানী ক্ষমতাবানদের তাতে কোন আগ্রহ নেই। তারা নিজেদের মুসলমান বা পাকিস্তানী হিসেবে ভাববার আগে পাঞ্জাবী, সিন্ধী বা বেলুচ ভাবতে ভালবাসে। আর দূরের বাঙালীদের প্রতি তাদের অবজ্ঞা, সন্দেহ, বিদ্বেষ এতবেশি যে প্রতি কথা আচরণ আর হাসিঠাট্টায় বারবার তা প্রকাশিত হয়। এগুলো প্রায় সাধারণ ব্যাপার ছিল। বাঙালী মুসলমানদের অপূর্ণাঙ্গ মুসলমান হিসেবে দেখার এবং তাদের মুসলমান বানানোর জন্য বাংলা ভাষা সংস্কৃতিকে হেয় করা ছিল একটি নিয়মিত চর্চা। এই একই দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বাঙালী সমাজের 'আশরাফ' মুসলমানদেরও। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী মুসলমান কার্যত আতরাফ হিসেবেই নিজেদের নতুন করে উপলব্ধি করেন অবাঙালী বা আশরাফ মুসলমান ভাইদের সামনে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরই বাঙালীদের মুসলমান বানানোর চেষ্টার বহিপ্রকাশ ঘটে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করবার চেষ্টায়। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালে এই ঘোষণা দিয়েছিলেন, অথচ তিনি নিজেই উর্দু ভাষায় কথা বলতেন না। আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসেই রোমান হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এই সময়ে গঠিত 'ব্যুরো অব রিকন্সট্রাকশন' বা বিএনআর থেকেও একই প্রস্তাব দেয়া হয়। পরে শিক্ষা নিয়ে যিনি পাকিস্তান কমিশনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেই হামুদুর রহমান ১৯৬৭ সালে বাংলা একাডেমীর এক অনুষ্ঠানে আরবী হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং এ নিয়ে কাজ করবার জন্য শওকত ওসমানকে বলেছিলেন। ইসলাম বিরোধী অভিহিত করে রবীন্দ্র সাহিত্য ও সঙ্গীত থেকে বাঙালী মুসলমানদের 'রক্ষা' করবার নানা উদ্যোগ নেয়া হয়। বাংলা বাঙালী সবকিছুই যেন হিন্দুয়ানি। এসবের প্রতিবাদে ক্রমে সরব হতে থাকেন লেখক শিল্পীরাও। ১ বৈশাখে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান শুরু, পোষাক সাজে বাঙালী রূপ আনা, মেয়েদের কপালে টিপ দেয়া এগুলোও ছিল প্রতিবাদেরই অংশ।

পূর্ব বাংলার ভিন্ন যাত্রা

১৯৫০ সালের ১৬ ডিসেম্বর পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে জমিদারী প্রথা বাতিল পাকিস্তানের সামন্তপ্রভু গোষ্ঠী ভালো চোখে দেখেনি। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন -এর মধ্য দিয়ে বাঙালী মুসলিম মানস নিজেদের সত্ত্বাকেই নতুন করে আবিষ্কার করে যা পাকিস্তানী প্রকল্পের জন্য মানানসই ছিল না। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগকে উচ্ছেদ করে দিয়ে হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট যেসব কর্মসূচি নিয়ে আবির্ভূত হয় সেগুলো পাকিস্তানে ত্রয়ী ক্ষমতার সবাইকেই যে সতর্ক করে তুলেছিল তা পরবর্তী ঘটনাবলী থেকেই বোঝা যায়। যুক্তফ্রন্ট এই ২১ দফার ভিত্তিতেই নির্বাচন করেছিল এবং নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেছিল। কিন্তু পাকিস্তানের আসল ক্ষমতার কাছে জনগণের এই নির্বাচিত ক্ষমতা টিকতে পারেনি।

এই ২১ দফা এখানে উল্লেখ করা দরকার কেননা ৬০ দশকের গণতান্ত্রিক আন্দোলন ছিল এরই ধারাবাহিকতা। এগুলো ছিল সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

১. বাঙলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা।

২. জমিদারী ও খাজনা প্রথা সংস্কার।

৩. পাট ব্যবসা জাতীয়করণ করা ও পাটের মূল্য নির্ধারণ করা এবং পাট কেলেঙ্কারির সাথে জড়িতদের শাস্তি প্রদান।

৪. সমবায় ব্যবস্থা প্রবর্তন ও হস্ত-কুটির শিল্পের উন্নতি সাধন।

৫. লবন শিল্পের স্বয়ংসম্পূর্ণতা আনয়ন ও লবন কেলেঙ্কারির সাথে জড়িতদের শাস্তি প্রদান।

৬. শিল্প ও কারিগরী শ্রেণীর গরীব মোহাজেরদের পুনর্বাসন ও কাজের আশু ব্যবস্থা।

৭. খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে বন্যা ও দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা।

৮. পূর্ববঙ্গকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করা। কৃষির আধুনিকায়নের মাধ্যমে খাদ্যে ও শিল্পে দেশকে স্বাবলম্বী করা। আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের সব ধরনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

৯. দেশের সর্বত্র প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন এবং শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করা।

১০. শিক্ষার আমূল পরিবর্তন করে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কেবল মাতৃভাষার মধ্যে দিয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। একই মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করা।

১১. উচ্চশিক্ষাকে সস্তা ও সহজলভ্য করা এবং শিক্ষার্জন ব্যয় কমানোর জন্যে 'ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন' ইত্যাদি প্রতিক্রিয়াশীল কানুন বাতিল করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

১২. শাসন ব্যয় হ্রাস করা।

১৩. দুর্নীতি, স্বজন-প্রীতি, ঘুষ, রিশওয়াত বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা।

১৪. জন নিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স ইত্যাদি কালাকানুন বাতিল করা।

১৫. বিচার বিভাগকে শাসনবিভাগ থেকে পৃথক করা।

১৬. যুক্তফ্রন্টে প্রধানমন্ত্রীর বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে স্বল্প ব্যয়ের বাড়িতে থাকা প্রসঙ্গে।

১৭. ভাষা শহীদদের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ শহীদ মিনার নির্মাণ এবং ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেয়া।

১৮. ২১ ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবস ঘোষণা করে সরকারী ছুটি দেওয়া।

১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন।

২০. আইন পরিষদের আয়ু কোন অজুহাতে বাড়ানো যাবে না এবং আয়ু শেষ হবার ৬ মাস আগে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন।

২১. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভায় কোন আসন শূণ্য হলে তিন মাসের মধ্যে তা পূরণের জন্য উপ-নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

২১ দফার ভিত্তিতে নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করলেও যে টিকতে পারলোনা তা এখন আর কারও কাছে বিস্ময়কর মনে হবে না। পাকিস্তানে নির্বাচিত সরকারের টিকে থাকার দৃষ্টান্ত খুব কম। এখনও এই অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। শুধু তাই নয়।

৬০ দশকে আন্দোলন সংগ্রামের শেষে অনুষ্ঠিত সার্বজনীন নির্বাচনে নির্বাচিতদের সরকার গঠন করতেও দেয়া হল না। পরিবর্তে শুরু করা হল গণহত্যা। যার ফলাফল হিসেবে পাকিস্তান রাষ্ট্রই ভেঙে গেল।

১৯৫৪ সালের মধ্যে পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ উচ্ছেদ হওযার পর ক্রমে তার ভেতর থেকেই গড়ে উঠা আওয়ামী লীগ প্রধান দলে পরিণত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ততদিনে পাকিস্তানের বন্ধন আরও দৃঢ় হয়েছে। বিভিন্ন সামরিক চুক্তিতে পাকিস্তান ততদিন আস্ট্রেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কণ্ঠও আস্তে আস্তে শোনা যেতে থাকে। আওয়ামী লীগের মধ্যে এর সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পাক-মার্কিন চুক্তির বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান গ্রহণ করলেও দলের অন্য দুই নেতা সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিব তাতে সম্মত হননি। এই বিতর্ক শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ভাঙন পর্যন্ত গড়ায়। আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে এসে মওলানা ভাসানী গঠন করেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি। তখন ১৯৫৭ সাল। ইতিমধ্যে অনেকবার সরকার পরিবর্তন হয়েছে। ক্ষমতা তখন কার্যত বেসামরিক আমলাতন্ত্রের হাতে। আর সামরিক বাহিনী বিভিন্ন অঞ্চলে সামরিক শাসনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে। রাষ্ট্রীয় নীতিতেও তাদের প্রভাব বাড়ছে। আর পাক সামরিক নীতি শুধু নয় পরিকল্পনা শিক্ষা সবকিছুতেই মার্কিনীরা ততদিনে সরাসরি যুক্ত।

সামরিক শাসন এবং 'বুনিয়াদী গণতন্ত্র'

এই অবস্থাতেই ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের রাজনীতিতে সরাসরি প্রবেশ করে সামরিক বাহিনী। ১৯৫৬ সালে প্রণীত সংবিধান বাতিল হয়ে গেল। মার্কিনপন্থী রাজনীতিবিদরাও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ধরে রাখতে পারলেন না। প্রথমে ৭ অক্টোবর ইস্কান্দর মির্জা দিয়ে শুরু হলেও ২৭ অক্টোবর সামরিক বাহিনী প্রধান জেনারেল আইয়ুব খান প্রধান সামরিক শাসক হিসেবে পূর্ণ ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এর মধ্য দিয়ে পাকিস্তান আনুষ্ঠানিক ভাবে সামরিক শাসনের অধীনে প্রবেশ করে। পাকিস্তানের ইতিহাসের বড় অংশ আসলে সামরিক বাহিনীর গোপন ও প্রকাশ্য তৎপরতার ইতিহাস। মাঝখানে কিছু বিরতি দিয়ে সামরিক শাসন কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। আইয়ুব খান তাঁর গ্রন্থে ক্ষমতাগ্রহণের পর্বের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে বোঝা যায় তাঁরা আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা গ্রহণের অনেক আগে থেকেই প্রকৃত ক্ষমতার অংশীদার ছিলেন। পাকিস্তান প্রায় পুরো ৬০ দশক আইয়ুব খান নেতৃত্বাধীন এই সামরিক শাসনের অধীনেই ছিল এবং বাংলাদেশের রাজনীতির একটি বড় অধ্যায় রচিত হল এই প্রেক্ষাপটেই।

ক্ষমতা গ্রহণের পরই জেনারেল আইয়ুব খান পুরো শাসনব্যবস্থা স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতার ছাঁচে ঢেলে সাজাতে চেষ্টা করেন এবং রাজনৈতিক ভাবে পোক্ত অবস্থান

নেবার জন্য সুদূরপ্রসারী কর্মসূচি নেন। এটা যে আইয়ুব খানের নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল না, তা বলাই বাহুল্য। সামরিক বেসামরিক আমলাতন্ত্র এবং বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠী তাঁর মাধ্যমেই নিজেদের একচ্ছত্র ক্ষমতার স্থিতি দেখতে পেয়েছিল। তাছাড়া পুরো অঞ্চলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন বিরোধী যে সামরিক ও রাজনৈতিক বলয় তৈরি করতে যুক্তরাষ্ট্র সর্বাত্মক উদ্যোগ নিয়েছিল সেক্ষেত্রে পাকিস্তানে একটি স্থিতিশীল ও স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা খুব দরকার ছিল। আইয়ুব খান তাদের সেই চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শিক্ষা সংস্কার ও ভূমি সংস্কার এর উদ্যোগ নেবার পাশাপাশি আইয়ুব খান একটি শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরি করতে উদ্যোগ নেন যা তার ক্ষমতা কাঠামোকে বৈধতা দান করতে পারে। এই জন্য সূচনা করা হয় গণতন্ত্রের এক নতুন মডেল। তার নাম বেসিক ডেমোক্রেসি, বাংলায় বলা হতো বুনিয়াদী গণতন্ত্র বা মৌলিক গণতন্ত্র। ১৯৫৯ সালেই আইয়ুব খান চার স্তরের মৌলিক গণতন্ত্রের কাঠামো ঘোষণা করেন এবং এর পক্ষে ব্যাপক রাষ্ট্রীয় প্রচার চালানো হয়। কিছুদিনের মধ্যেই রেডিও তে নিয়মিত অনুষ্ঠান চালু হয়েছিলো, 'বুনিয়াদী গণতন্ত্রের আসর'।

১৯৫৬ সালে প্রণীত সংবিধানে পাকিস্তানে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সরকার গঠন করা হয়েছিল। সামরিক শাসনের মধ্য দিয়ে তা বাতিল করে 'পাকিস্ত ানের জন্য উপযোগী' মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায় পরোক্ষ ভোটাধিকারের ব্যবস্থা চালু হল। বলা হলো, এই ব্যবস্থার অধীনে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য ও চেয়ারম্যান। সারাদেশের এই চেয়ারম্যানদের ভোটেই নির্বাচিত হবেন রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান তখন দুই্ ইউনিট। সমানসংখ্যক ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সারাদেশে এই নির্বাচনে অংশ নেবেন বলে ঠিক হয। 'গণতন্ত্র রক্ষার ভিত্তি' হিসেবে বর্ণনা করে ইউনিয়ন কাউন্সিলের এই চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের নাম দেয়া হয় 'বেসিক ডেমোক্রেট' বা 'মৌলিক গণতন্ত্রী'। গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত আইয়ুবী শাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এই ব্যবস্থা বেশ কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠার উপযোগিতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লর্ড কর্ণওয়ালিস বলেছিলেন, 'আমাদের এমন এক শ্রেণী সৃষ্টি করিতে হইবে যাহারা নিজেদের স্বার্থেই আমাদের টিকাইয়া রাখিবে।' পাকিস্তানের স্বৈরশাসন পাকাপোক্ত করবার জন্য সেরকম এক শ্রেণী হিসেবেই মৌলিক গণতন্ত্রীদের গড়ে তোলা হয়েছিলো। গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত উন্নয়ন বরাদ্দ এদের মাধ্যমেই খরচ হতো। এই বরাদ্দ নিয়ে দুর্নীতি সেসময়ই বিস্তার লাভ করে। এই বরাদ্দ দেখা হয়েছে মৌলিক গণতন্ত্রীদের সমর্থন নিশ্চিত রাখবার জন্য একধরনের প্রণোদনা হিসেবে। যেকারণে এই উন্নয়ন বরাদ্দ নিয়ে অডিট ব্যবস্থাও শিথিল রাখা হয়। খুবই ক্ষুদ্র ব্যতিক্রম বাদে গ্রামাঞ্চলে উদ্ভূত

এই গোষ্ঠী আইয়ুব খানের অন্যতম প্রধান সমর্থন ভিত্তি হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। অন্যদিকে একই কারণে এই 'মৌলিক গণতন্ত্রী'রা বা চেয়ারম্যান মেম্বররাই গ্রামাঞ্চলে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়।

সারা পাকিস্তানে এদের ভোটে প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয় ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারী। আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন মুহম্মদ আলী জিন্নাহ-র ছোট বোন ফাতেমা জিন্নাহ। সেসময়ে ফাতেমার জনসমর্থন থেকে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন হলে ফাতেমা জিন্নাহই বিজয়ী হতেন। ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে শুধু আওয়ামী লীগ সমর্থন দেয়নি, জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন ইসলামপন্থী দলও তাঁকে সমর্থন দেয়। আরও উল্লেখ করবার মতো বিষয় হচ্ছে যে, 'ইসলামে নারী নেতৃত্ব হারাম' এই আইয়ুবী প্রচারণার জবাবে মাওলানা থানভী, মাওলানা মওদুদী এবং শর্ষিণার পীর তখন নারী নেতৃত্বের পক্ষে বিবৃতি দেন।

আইয়ুব দশকের সংস্কার

জেনারেল আইয়ুব খান সামন্ত পরিবার থেকে আসেননি, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে তাদের প্রতিনিধিত্বও করেননি। তিনি সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের দক্ষ এবং টেকসই প্রতিনিধি ছিলেন এবং তাঁর ভূমিকা বরাবর পশ্চিম পাকিস্তান কেন্দ্রিক বৃহৎ পুঁজির পক্ষেই ছিল। ১৯৬১ সালের 'পারিবারিক আইন' অধ্যাদেশ এবং ১৯৬১-৬২ সালে ভূমি সংস্কার সামন্তপ্রভুদের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যকে আঘাত করে। ভূমি সংস্কার যেভাবে করা হয় তার প্রভাব পুরো পাকিস্তানের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল সুদূরপ্রসারী। যেভাবে পূর্ব ও পশ্চিম অংশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কাঠামোতে এই ভূমি সংস্কার করা হয় সেটাও বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। বদরুদ্দীন উমর তাঁর 'আইয়ুব খান আমলে বাংলাদেশের কৃষক' শিরোনামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ভূমি সংস্কারে দুই অঞ্চলে ফলাফল হয় ভিন্ন ভিন্ন। ১৯৫০ সালে পূর্ব বাংলায় জমিদারী প্রথা বিলোপ করে যে ভূমি সংস্কার হয় তাতে ভূমি মালিকানার সিলিং ধরা হয়েছিল ১০০ বিঘা। আইয়ুব খান ভূমি সংস্কারে এই অঞ্চলের সিলিং নির্ধারণ করেন ১২৫ একর বা মোটামুটি ৩৭৫ বিঘা। ভূমি মালিকানার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি, কিংবা বেআইনী ভূমিদখল বৈধ করবার এই কর্মসূচি কৃষি থেকে শিল্পে পুঁজি প্রবাহ উৎসাহিত করবার বদলে উল্টোটাই করে।

অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে ঘটনা ঘটে বিপরীত। এর আগে সেখানে কোন ভূমি সংস্কারই করা হয়নি। আগে পাঞ্জাবে একবার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল বটে, তবে তা পরে বাতিল করা হয়। ১৯৬১ সালের সংস্কারে এই অঞ্চলে ভুমির সিলিং

ধরা হয় ৫০০ একর। কিন্তু ঐ অঞ্চলে বড় বড় জোতে ছিল হাজার হাজার একর জমি। আইয়ুব খান তাঁর *প্রভু নয় বন্ধু* গ্রন্থে বলছেন, 'পাঞ্জাবে ব্যবহারযোগ্য জমির শতকরা ৫০ ভাগ, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশে শতকরা ৫০ ভাগের কিছু কম এবং সিন্ধুতে শতকরা ৮০ ভাগেরও উপর জমি কয়েক সহস্র অনুপস্থিত জমিদারদের দখলে ছিল।' এবং এই বৃহৎ জোতদার ভূস্বামীরাই পাকিস্তানের অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতো। ভূমি সংস্কারের ফলে এদের এই আধিপত্য আঘাতপ্রাপ্ত হয়। তা হলেও এই ভূমি সংস্কার যে পুরোপুরি কার্যকর হয়নি তা এখনও সেখানে হাজার হাজার একর জমির মালিকানা দেখে বোঝা যায়। ভুট্টো পরিবার, নওয়াজ শরীফ কিংবা লেঘারী পরিবার এখনও এরকম বিশাল জোতদার।

তবে যতটুকু বাস্তবায়ন হয়, তাতেই এই সংস্কার পশ্চিম পাকিস্তান বিশেষত পাঞ্জাব অঞ্চলে শিল্পপুঁজি গঠন এবং শিল্পখাতে পুঁজি প্রবাহে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এই ভূমি সংস্কারের শর্তাবলী যা ছিল তাতে বলা হল, ৫০০ একর রেখে আর হাজার হাজার একর জমি সরকার বাজেয়াফত করে ক্ষতিপূরণ দেবে, তবে তা সর্বাধিক হবে যদি তা শিল্পখাতে বিনিয়োজিত হয়। এইভাবে কৃষি থেকে শিল্পের দিকে পুঁজি প্রবাহের একটা ক্ষেত্র তৈরি হল, তাকে উৎসাহিত করবার জন্য রাষ্ট্র নানাবিধ প্রণোদনার ব্যবস্থা করলো। আর পূর্ব বাংলায় প্রথম থেকেই বিপরীত গতি উৎসাহিত করা হয়েছে। এখানে উৎসাহ দেয়া হল উদীয়মান শিল্প ব্যবসা থেকে আইনীভাবেই কৃষিতে পুঁজি প্রবাহকে। ৬০ দশক পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বাঙালী পাওয়া যায় হাতে গোণা। শিল্প প্রতিষ্ঠানের বেশিরভাগ মালিকানা ছিল পাকিস্তানী বৃহৎ পুঁজিপতিদের। বাংলাদেশ আমলে সেগুলোই পরিত্যক্ত হিসেবে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব হল।

৬০ দশকে পাকিস্তান উন্নয়ন নিয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড গ্রুপ এবং বিশ্বব্যাংক। শুধু সামরিক খাতেই যে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের বশ্যরাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল তাই নয়, উন্নয়ন ক্ষেত্রেও পাকিস্তান হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই অঞ্চলে তাদের টেস্টকেস। সবুজ বিপ্লবের নামে উফশী, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, যান্ত্রিক সেচ এর উপর নির্ভরশীল আমদানিকৃত কৃষির পত্তন হয়, যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের কৃষির উপর বহুজাতিক সংস্থাগুলোর ভূমিকা সম্প্রসারিত হয়। অবকাঠামো উন্নয়ন হিসেবে এবং ইউনিয়ন কাউন্সিলগুলোর উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জেলা সদর ও আরও কিছু ভেতরে এবং বেশকিছু থানা পর্যন্ত রাস্তাঘাটের উন্নয়ন হয়। 'সবুজ বিপ্লব' ও অবকাঠামো উন্নয়নের মধ্য দিয়ে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণও ত্বরান্বিত হয়।

৬০ দশকে পশ্চিম পাকিস্তান বিশেষত পাঞ্জাব কেন্দ্রিক কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য অবকাঠামো উন্নয়ন ক্ষেত্রে ব্যাপক কর্মসূচি নেয়া হয়। সারা পাকিস্তানের

তুলনায় পাঞ্জাবে রাষ্ট্রীয় ব্যয় ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। আর পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় সামগ্রিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয়বরাদ্দ অনুপাত অনেক বেশি ছিল। পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রধান রফতানি পণ্য ছিল পাট। পাট থেকেই পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার বড় অংশ আসতো। কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ ব্যয় হতো পশ্চিম পাকিস্তান বা পাঞ্জাব কেন্দ্রিক উন্নয়ন তৎপরতায়। এছাড়াও পূর্ব পাকিস্তান থেকে সরকার যে রাজস্ব আয় করতো তার তুলনায় অনেক কম ব্যয় হতো এখানকার উন্নয়ন কর্মসূচিতে। আর অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের আয়ের তুলনায় ব্যয় হতো অনেক বেশি। সরকারি ব্যয়ের প্রধান ভাগীদার ছিল সামরিক বেসামরিক প্রশাসন সেখানে আবার ছিল অবাঙালী, বিশেষত পাঞ্জাবীদের আধিক্য।

আইয়ুব খান তাঁর আমলের শুরুতেই 'ব্যুরো অব রিকন্সট্রাকশন' (বিএনআর) গঠন করে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানমুখী সাংস্কৃতিক 'পুনর্গঠন'-এর উদ্যোগ নিতে থাকেন। এর রেকর্ড দেখলে বোঝা যায় যে, এই অঞ্চলের বুদ্ধিজীবীদের মধ্য থেকে দালাল সংগ্রহ করা অন্তত দশকের প্রথম দিকে বেশ সহজই ছিল।

রাজনীতির ভাষা: বৈষম্যের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি

পাকিস্তানের ভেতর এরকম অসম উন্নয়ন গতি এবং বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি ও কর্মসূচিই ৬০ দশকে বাংলাদেশের রাজনীতির ভাব ও ভাষা নির্ধারণে মূল ভূমিকা পালন করে। ৬০ দশকের প্রথমদিকেই রেহমান সোবহান দুই্ অর্থনীতির তত্ত্ব দেন, পরে আখলাকুর রহমান এমনকি এম এন হুদাও এবিষয়ে বক্তব্য রাখেন যা থেকে ক্রমে এই আঞ্চলিক বৈষম্য সম্পর্কিত ধারণা একটি স্পষ্ট রূপ নেয়। তবে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বঞ্চনাকে কেন্দ্র করে হলেও দেশজুড়ে প্রতিবাদী চেতনা যে একটা জাতীয়তাবাদী রূপ নিতে থাকে তার কারণ শুধু এতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আরও অন্তত দুটি বিষয় এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

প্রথমত, বৈষম্য ও বঞ্চনা শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। সাংস্কৃতিক অবজ্ঞা, বৈষম্যও প্রকট হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে। বাঙালীদের নীচু চোখে দেখা এবং বাঙালী মুসলমানদের মুসলমান হিসেবেই স্বীকৃতি দানে কার্পণ্য বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। যা বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে আত্ম পরিচয়ের নতুন উপলব্ধি সৃষ্টি করে কিংবা পাকিস্তান জাতির ভঙ্গুর ভিত্তি সম্পর্কে সজাগ করে। বাঙালী মুসলমান তার বাঙালী পরিচয় এবং তার শেকড় নিয়ে মনোযোগী হয়ে উঠে।

দ্বিতীয়ত, ৫০ ও ৬০ দশকে বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এখানে একটি উল্লেখযোগ্য আকারের মধ্যবিত্ত বিশেষত শিক্ষক, উকিল, পেশাজীবী, শিক্ষার্থী

গোষ্ঠী যেমন গড়ে উঠেছিল তেমনি কিছু শিল্পায়নের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল একটি শিল্প শ্রমিক শ্রেণী। এই মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণীই ৬০ দশকে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান দুটি ভিত্তি ছিল।

তবে জাতিগত নিপীড়ন ও বৈষম্য উপলব্ধি এবং সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা বিষয়ে নতুন মনোযোগে মধ্যবিত্তের মধ্যে সবচাইতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন বিদ্বৎসমাজ। এই ক্ষেত্রে বদরুদ্দীন উমরের সংস্কৃতির সংকট, সাম্প্রদায়িকতা ও সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে লেখালেখির প্রভাব ছিল উল্লেখযোগ্য। ১লা বৈশাখ, রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন প্রতিবাদী কর্মসূচি হিসেবেই শুরু হয় এবং ক্রমে তা ব্যাপকতা লাভ করে। বাঙালী জাতীয়তাবাদী ধারা শেকড় গাড়ে এই মধ্যবিত্তের মধ্যেই এবং তার প্রকাশ বিদ্বৎসমাজ থেকেই ঘটে। বিপ্লবী রাজনীতির বিশাল অর্জনও এক পর্যায়ে গিয়ে জাতীয়তাবাদী ধারাকে পুষ্ট করে।

আন্দোলনের নানা স্রোত

৮০ দশকে বাংলাদেশে যেভাবে ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়েই সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয় ৬০ দশকেও তাই হয়েছিল। ১৯৬২ সালে নতুন শাসনতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। একই বছর সোহরাওয়ার্দীসহ অনেক প্রবীণ নেতাকেও গ্রেফতার করা হয়। ঘোষণা করা হয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট।

এই শিক্ষা কমিশন রিপোর্টকে কেন্দ্র করেই ছাত্র বিক্ষোভের সূচনা। সামরিক শাসন বিরোধী চাপা বিক্ষোভকে মূর্তরূপ দেবার ক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করে অবিভক্ত এবং বেআইনী ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্কিত ছাত্র ইউনিয়ন। ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগেই এই বছর ১ ফেব্রুয়ারি সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয় এবং তা সফলও হয়। এই শুরু। ১৭ সেপ্টেম্বর সারা দেশে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়।

৬০ দশকে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে কয়েকটি প্রধান প্রবণতা চিহ্নিত করা সম্ভব। প্রথমত, আওয়ামী লীগ যা আঞ্চলিক বৈষম্য ও জাতিগত স্বত্তাধিকারকে কেন্দ্র করেই আন্দোলন পরিচালনা করছিল। এই দলই জনসমর্থন ও সাংগঠনিক ভিত্তির দিক থেকে ছিল সবচাইতে শক্তিশালী। তবে একক বৃহত্তম দল হিসেবে তার আবির্ভাব ঘটে ৬০ দশকের শেষে। শেখ মুজিবুর রহমান একটানা এই আন্দোলনের মধ্যে থেকে দলের অবিংসবাদিত নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন দশকের শেষভাগে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার হয়ে পরে তিনি যখন আন্দোলনের মুখে মুক্তি পান তখন তিনি বাঙালী জনগণের মধ্যে সবচাইতে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। সেই সময়েই তিনি ছাত্র জনতার এক বিশাল সমাবেশে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিতে ভূষিত হন। এই দলের মধ্যেই জাতীয়তাবাদী

দর্শন ক্রমে দানা বাঁধে এবং সেটাই রাজনীতির প্রধান স্রোতে পরিণত হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে এই দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এই দলই নেতৃত্ব প্রদান করে।

দ্বিতীয়ত, কমিউনিস্ট ও বামপন্থী দল এবং গ্রুপসমূহ। কমিউনিস্ট পার্টি অবিভক্ত ছিল ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত। তারপরই প্রথমে এটি দুই ভাগ ও পরে বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়ে পার্টি। এগুলো ছিল নিষিদ্ধ পার্টি। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অবস্থান নিয়ে আওয়ামী লীগ থেকে আলাদা হয়ে যে ন্যাপ গঠিত হয় সেখানেই তখন কাজ করতেন বিপ্লবীরা। ন্যাপের মধ্যে কাজ করেছেন, আবার পার্টির দায়িত্ব নিয়ে তাঁরা কৃষক শ্রমিকদের সংগঠন করেছেন। এই ন্যাপও ভেঙে যায়। কৃষক সংগঠনের ক্ষেত্রে মওলানা ভাসানী নিজেই নেতৃত্ব দিয়ে কৃষক আন্দোলনের এক নতুন ভাষা তৈরি করেছেন। এছাড়া কৃষক শ্রমিক আন্দোলন সংগঠনে পার্টি নেতা হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন আবদুল হক ও মোহাম্মদ তোয়াহা।

টঙ্গী, আদমজী, খুলনা ও চট্টগ্রাম শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে ব্যাপ্তি, সাংগঠনিক শক্তির জন্ম দিয়েছিল তা আর পরবর্তী সময়ে কখনো দেখা যায়নি। আবুল বাশার, দেবেন শিকদার অবিস্মরণীয় শ্রমিক সমাবেশ ও আন্দোলনের জন্ম দিযেছিলেন। টঙ্গী ও আদমজী শ্রমিক আন্দোলন ঢাকা মহানগরীতে গণঅভ্যুত্থানের জোয়ার তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। ৬০ দশকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছাত্র আন্দোলন ছিল প্রায় নির্ধারক অবস্থানে। সেক্ষেত্রেও ছাত্র ইউনিয়নসহ বাম সংগঠনগুলোর ভূমিকা ছিল প্রধান।

তৃতীয়ত, ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ও ধারা। মুসলিম লীগ ততদিনে খন্ডবিখন্ড। বাংলাদেশে ১৯৫৪ র পর আর এই সংগঠন কখনও দাঁড়াতে পারেনি। নানারকম ঠেকা দিয়ে এর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার চেষ্টা চললেও কোন লাভ হয়নি। এর নানা খন্ড নিয়ে নানা গ্রুপ প্রাসাদ চক্রান্তের প্রয়োজনে কাজে লাগছিল বিভিন্নভাবে। আইয়ুব খান যখন রাজনীতির মাঠে স্থায়ী হবার চেষ্টা করছিলেন তখন এরকম একটি গ্রুপের উপরই ভর করেছিলেন, তার নাম কনভেনশন মুসলিম লীগ। আইয়ুব খানের রাজনীতির বিরুদ্ধে মুহম্মদ আলী জিন্নাহর বোন ফাতেমা জিন্নাহকে সামনে রেখে গঠিত হয়েছিল জিন্নাহ মুসলিম লীগ। এছাড়া ছিল নেজামে ইসলামী আর জামাতে ইসলামী। ১৯৬১ সালে আইয়ুব খান পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ জারি করবার পর এই দলগুলোর সাথে আইয়ুব খানের সম্পর্কের বৈরীতা তৈরি হয়। এই দলগুলো বিভিন্ন সময়ে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনেও অংশ নেয়। কখনও কখনও আওয়ামী লীগের সাথেও তাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন দেখা যায়।

৬ দফাঃ আন্দোলনের গতিমুখ

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় এটা স্পষ্ট হয় যে, পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তার ব্যাপারে পশ্চিম কেন্দ্রিক নেতৃত্বের কোন মাথাব্যথা নেই। সামরিক বাহিনীর বাঙালী সৈনিক ও অফিসাররাও পশ্চিম ফ্রন্টেই নিয়োজিত হন। পূর্ব পাকিস্তানে এই বিষযটি জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। ১৯৬৫ সালের ৫ জুন ন্যাপ তার ১৪ দফা প্রকাশ করে। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা উত্থাপন করেন। এই ৬ দফায় আঞ্চলিক বৈষম্য নিরসন ও স্বায়ত্তশাসনসহ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য একটি সামগ্রিক কর্মসূচি উপস্থাপিত হয়। যে কর্মসূচি নিয়ে সরকার ও রাজনৈতিক মহলসহ সমাজের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ৭ জুন সারা দেশে ব্যাপক বিক্ষোভ ও আদমজী, সিদ্ধিরগঞ্জ ও ডেমরায় ১৪৪ ধারা ভেঙে শ্রমিক সমাবেশ হয়। পুলিশের গুলিতে সেদিন নিহত হন ১০ জন।

৬ দফার কর্মসূচির সারকথা ছিল নিম্নরূপঃ

- **প্রস্তাব নং ১** - শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতিঃ দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো - পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশনভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং এর ভিত্তি হবে লাহোর প্রস্তাব। সরকার হবে পার্লামেন্টারী ধরনের। আইন পরিষদের (Legislature) ক্ষমতা হবে সার্বভৌম এবং এই পরিষদও নির্বাচিত হবে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনসাধারণের সরাসরি ভোটে।
- **প্রস্তাব নং ২** - কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাঃ কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) সরকারের ক্ষমতা কেবলমাত্র দুটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে-যথা, দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অংগ-রাষ্টগুলির ক্ষমতা থাকবে নিরংকুশ।
- **প্রস্তাব নং ৩** - মুদ্রা বা আর্থ-সম্বন্ধীয় ক্ষমতাঃ মুদ্রার ব্যাপারে নিম্নলিখিত দুটির যে কোন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা চলতে পারে - (ক) সমগ্র দেশের জন্যে দুটি পৃথক, অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে, (খ) বর্তমান নিয়মে সমগ্র দেশের জন্যে কেবলমাত্র একটি মুদ্রাই চালু থাকতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে এমন ফলপ্রসু ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে করে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচারের পথ বন্ধ হয়। এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভের পত্তন ও অর্থবিষয়ক নীতি প্রবর্তন করতে হবে।
- **প্রস্তাব নং ৪** - রাজস্ব, কর বা শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতাঃ ফেডারেশনের অংগ-রাষ্ট্রগুলির কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনরূপ কর ধার্যের ক্ষমতা থাকবে না। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অংগ-রাষ্ট্রীয় রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে। অংগ-রাষ্ট্রগুলির সব রকমের করের শতকরা একই হারে আদায়কৃত অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে।

- **প্রস্তাব নং ৫** - বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা :

(ক) ফেডারেশনভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করতে হবে।

(খ) বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অংগ-রাষ্ট্রগুলির এক্তিয়ারধীন থাকবে।

(গ) কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত কোন হারে অংগ-রাষ্ট্রগুলিই মিটাবে।

(ঘ) অংগ-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদি চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা কর জাতীয় কোন বাধা নিষেধ থাকবে না।

(ঙ) শাসনতন্ত্রে অংগ-রাষ্ট্রগুলিকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্বস্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে।

- **প্রস্তাব নং ৬** - আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা - আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অংগ-রাষ্ট্রগুলিকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।

পাকিস্তান সরকার ও ডানপন্থীরা ৬ দফা কর্মসূচীকে দেখেন পাকিস্তান ভাঙার দলিল হিসেবে আর বামপন্থীদের একটি অংশ এই কর্মসূচিকে দেখেন কৃষক শ্রমিক আন্দোলন বিকাশের মুখে ভীত সাম্রাজ্যবাদের কূটকৌশল হিসেবে। তবে এসব মতামত জনগণকে প্রভাবিত করতে পেরেছে খুব কমই। অল্পদিনেই এই ৬ দফাই পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির কেন্দ্রীয় বিষয়ে পরিণত হয়। সেসময় প্রচারিত 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?' পোস্টার এবং 'বাঙালীর বাঁচার দাবি ৬ দফা' শীর্ষক শেখ মুজিবুর রহমানের পুস্তিকা বাংলাদেশের শহর বন্দর গ্রামগঞ্জ সর্বত্র ব্যাপক ভাবে প্রচারিত এবং সমর্থিত হয়। এসব বিষয় পরিণত হয় জনগণের মুখের বুলিতে।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য, শেখ মুজিবসহ বিভিন্ন নেতা সংগঠক বাঙালী সামরিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, বেতার-টিভিতে রবীন্দ্র সংগীত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা, হত্যা দমন পীড়ন নির্যাতন সহ আইয়ুব খানের দশ বছরের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণজাগরণের সৃষ্টি হতে থাকে ১৯৬৮ সালের শেষ দিক থেকে। শেখ মুজিব জেলে থাকা অবস্থায় এই আন্দোলনকে তীব্র পর্যায়ে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন মওলানা ভাসানী। ৮ ডিসেম্বর তাঁর ডাকা হরতালের মধ্য দিয়ে, বলা যায়, গণঅভ্যুত্থান পর্বের সূচনা হয়। শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ পুরো আন্দোলনকে দ্রুত জঙ্গী করে তোলে। গ্রামাঞ্চলে মৌলিক গণতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে, গরুচোর ও থানা প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বিক্ষোভ দ্রুত ছড়াতে থাকে। বিভিন্ন স্থানে গণআদালত গঠন করে গণশত্রুদের শায়েস্তা শুরু হয়। শ্রমিক এবং কৃষকদের সংগঠিত করায় বিপ্লবী সংগঠন ও কর্মীদের ভূমিকা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা বলাই বাহুল্য।

১১ দফা ও ১৯৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান

এই আন্দোলনমুখর পরিস্থিতিতেই ছাত্রলীগ এবং ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া ও মেনন গ্রুপ নিয়ে গঠিত হয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। তাদের পক্ষ থেকে ১৪ জানুয়ারী ১১ দফা কর্মসূচী ঘোষিত হয়। এই ১১ দফায় ৬ দফার সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং কৃষক শ্রমিক ও শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচীও যুক্ত হয়।

১১ দফা কর্মসূচীর কথাগুলো ছিলো নিম্নরূপঃ

১. (ক) স্বচ্ছল কলেজগুলিকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি বাদ দিতে হবে এবং এর মধ্যে যেসব কলেজ প্রাদেশিকীকরণ করা হয়েছে সেগুলিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। কারিগরি, প্রকৌশল, চিকিৎসা ও কৃষি ছাত্রদের দাবি মানতে হবে। ছাত্র বেতন কমাতে হবে। নারী শিক্ষার প্রসার করতে হবে এবং শিক্ষা সংকোচন নীতি পরিহার করে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করতে হবে।

(খ) কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় কালাকানুন সম্পূর্ণ বাতিল করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন প্রদান করতে হবে।

(গ) শাসক গোষ্ঠির শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রামাণ্য দলিল 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট' ও 'হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট' বাতিল করতে হবে এবং ছাত্রসমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে গণমুখী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে।

২. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হবে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার উপর হতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

৩. (ক) শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতিঃ দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশনভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং এর ভিত্তি হবে লাহোর প্রস্তাব। সরকার হবে পার্লামেন্টারী ধরনের। আইন পরিষদের(Legislature) ক্ষমতা হবে সার্বভৌম এবং এই পরিষদও নির্বাচিত হবে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনসাধারণের সরাসরি ভোটে।

(খ) কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাঃ কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) সরকারের ক্ষমতা কেবলমাত্র দুটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে - যথা, দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অংগ-রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা থাকবে নিরংকুশ।

(গ) মুদ্রা বা আর্থ-সম্বন্ধীয় ক্ষমতাঃ মুদ্রার ব্যাপারে নিম্নলিখিত দুটির যেকোন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা চলতে পারে - (ক) সমগ্র দেশের জন্যে দুটি পৃথক, অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে, (খ) বর্তমান নিয়মে সমগ্র দেশের জন্যে

কেবলমাত্র একটি মুদ্রাই চালু থাকতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে এমন ফলপ্রসু ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে করে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচারের পথ বন্ধ হয়। এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভের পত্তন ও অর্থবিষয়ক নীতি প্রবর্তন করতে হবে।

(ঘ) রাজস্ব, কর বা শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতাঃ ফেডারেশনের অংগ-রাষ্ট্রগুলির কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনরূপ কর ধার্যের ক্ষমতা থাকবে না। তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অংগ-রাষ্ট্রীয় রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে। অংগ-রাষ্ট্রগুলির সবরকমের করের শতকরা একই হারে আদায়কৃত অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে।

(ঙ) বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা ঃ

(ক) ফেডারেশনভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করতে হবে।

(খ) বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অংগ-রাষ্ট্রগুলির এক্তিয়ারাধীন থাকবে।

(গ) কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত কোন হারে অংগ-রাষ্ট্রগুলিই মিটাবে।

(ঘ) অংগ-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদি চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা কর জাতীয় কোন বাধা নিষেধ থাকবে না।

(ঙ) শাসনতন্ত্রে অংগ-রাষ্ট্রগুলিকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্বস্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে।

(চ) আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা - আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অংগ-রাষ্ট্রগুলিকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।

৪. পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে, সাব ফেডারেশন গঠন করতে হবে।

৫. ব্যাংক, বীমা, ইনসুরেন্স ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করতে হবে।

৬. কৃষকের উপর হতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করতে হবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করতে হবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহসীলদারদের অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণ প্রতি ৪০.০০ টাকা নির্ধারণ এবং আখের ন্যায্য মূল্য দিতে হবে।

৭. শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি ও বোনাস দিতে হবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করতে হবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করতে হবে।

৮. পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলসম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. জরুরী আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য আইন প্রত্যাহার করতে হবে।

১০. সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করে জোট বর্হিভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করতে হবে।

১১. দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেফতারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারীকৃত মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারী ছাত্রনেতা আসাদ পুলিশের গুলিতে শহীদ হন। এই ঘটনা পুরো আন্দোলন পরিস্থিতিকে প্রবলভাবে বেগবান করে। শামসুর রাহমান লেখেন 'আসাদের শার্ট'। ২৪ জানুয়ারী ঢাকায় একটি বিশাল মিছিল হয়। সচিবালয়ের সামনে মিছিলে গুলিবর্ষণ করে সেনাবাহিনী। শহীদ হন রুস্তম আলী ও স্কুলের ছাত্র মতিউর। গণজোয়ার অব্যাহত থাকে। একপর্যায়ে তা থামানোর জন্য ১৮ ফেব্রুয়ারী থেকে কার্ফু বা সান্ধ্য আইন জারী করা হয়। কিন্তু তাতে মানুষের জোয়ার থামেনি। কোন ঘোষণা ছাড়াই সারা ঢাকার বস্তি, শিল্পাঞ্চলসহ সকল এলাকা থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে মানুষ বেরিয়ে এসে সান্ধ্য আইন অস্বীকার করে। এই অবস্থার পর সরকারের আর টিকে থাকার অবস্থা ছিল না। এর মধ্যে জেলের মধ্যে নিহত হন আগরতলা মামলার আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হক। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শামসুজ্জোহা শহীদ হন ক্যাম্পাসেই। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে, গণঅভ্যুত্থানের মুখে জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে পদত্যাগ করেন। ২৫ মার্চ থেকে ইয়াহিয়া খান পুনরায় সামরিক আইন জারি করেন সারাদেশে। দুবছর পর এই দিনেই ইয়াহিয়া খান চক্র পূর্ব পাকিস্তানে শুরু করে গণহত্যা এবং নির্যাতনের বর্বর পর্ব যা পাকিস্তানের পতন না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে ।

বাম আন্দোলনের শক্তি ও ভাঙন

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ৬ দফার আন্দোলন যখন দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করছে তখনও এই কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনগুলো বামপন্থীদের নিযন্ত্রণে। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণ আর বেশিদিন থাকেনি। আগেই বলেছি, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে তখন মস্কো ও পিকিং ক্রমে দুটো কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশে তার প্রভাব বাড়ছে। ১৯৬৭ সালে প্রথম দফা পার্টি ভাগ হয়। মস্কোপন্থী বলে পরিচিত ধারায় মণি সিংহ সহ পুরনো পার্টির অধিকাংশ নেতা ছিলেন। তুলনামূলক ভাবে নবীনরা পিকিংপন্থী ধারার সূচনা করেন, এর প্রথম নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)। এই ধারা থেকেই পরে আরও বিভিন্ন বিভক্তি হয়। কোন বিভক্তির কারণ হিসেবে উৎপাদন পদ্ধতি বিতর্ক, কোন বিভক্তির কারণ হিসেবে কর্মসূচি, কোনটির কারণ হিসেবে বিপ্লবের স্তর ইত্যাদি জানানো হয়। এসব বিভিন্ন ধারা উপধারায় নেতৃত্ব দেনঃ সুখেন্দু দস্তিদার, আবদুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, দেবেন শিকদার, আলাউদ্দীন আহমদ, অমল সেন প্রমুখ।

মস্কো আর পিকিং এর অবস্থান কেন্দ্র করে বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট আন্দোলনে যে বিভক্তি দেখা দেয় পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র ইউনিয়নে ভাঙন দিয়েই তার শুরু। প্রকাশ্য রাজনৈতিক দল হিসেবে যেহেতু ন্যাপের মধ্যেই কমিউনিস্ট দল এর লোকজন কাজ করছিলেন সেহেতু তাদের বিভক্তির প্রতিফলন হিসেবে ন্যাপ দুভাগে বিভক্ত হয়। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী নেতৃত্বাধীন অংশে পিকিংপন্থীরা সমবেত হন আর মস্কোপন্থীরা মোজাফফর আহমদ নেতৃত্বাধীন অংশে।

পুরো ৬০ দশকে মওলানা ভাসানীর ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম ধর্মের নিপীড়ন ও বৈষম্য বিরোধী নতুন ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন তিনি, যাতে তাঁর সখ্য গড়ে উঠে বিপ্লবীদের সাথে। বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে তাঁর কণ্ঠ ছিল সবচাইতে সোচ্চার। তবে পিকিংপন্থী বামপন্থীদের সাথে তাঁর সম্পর্ক অনেকরকম টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে যায়। এক পর্যায়ে অনেকেই তাঁকে ত্যাগ করেন। পিকিংপন্থীদের মধ্যে কেউ কেউ চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে আইয়ুবপ্রীতি প্রকাশের যে প্রবণতা দেখান সেটা নিয়েও অনেক জটিলতা ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব তৈরি হয়। তার দায়ও মওলানা ভাসানীকে বহন করতে হয়।

এই দশকেই সইফ উদ দাহার গঠন করেন প্রথমে শ্রমিক কৃষক কর্মী সংঘ ও পরে কমিউনিস্ট কর্মী সংঘ। গঠিত হয় হাতিয়ার গ্রুপ। সিরাজ সিকদার গঠন করেন পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলন। তাঁর থিসিস প্রকাশিত হয় ১ ডিসেম্বর ১৯৬৮। এই সংগঠনই পরে পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি নাম ধারণ করে। এছাড়া গঠিত হয়েছিল কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি। এই দুইটি ধারা স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা-র কর্মসূচি গঠন করে যথাক্রমে ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ সালে।

পার্টি দ্বিধা ও বহুধাবিভক্তিতে গণসংগঠনগুলোও একের পর এক ভাঙন ও বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। গণ ও শ্রেণীসংগঠনের সবচাইতে বড় বিপর্যয় আসে এরপর। যখন চারু মজুমদারের শ্রেণীশত্রু খতমের লাইন গ্রহণ করে পিকিংপন্থীদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নেতা কর্মী সংগঠক বিপ্লবী উদ্দীপনা নিয়ে কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্র সংগঠন সহ বিভিন্ন প্রকাশ্য কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করেন। অন্যদিকে মস্কোপন্থী ধারা ততদিনে আওয়ামী লীগের সাথে অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী ধারার অনেক নিকটবর্তী।

ততদিনে ৬০ দশক শেষ। বিশাল গণঅভ্যুত্থান শেষে এই দেশ তখন জনগণের উপর বর্বরতম সামরিক আক্রমণ এবং স্মরণকালের বৃহত্তম গণযুদ্ধের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। ততদিনে বিপ্লবী স্বপ্ন ও অঙ্গীকার নিয়ে যেসব সংগঠন পুরো দশকের ঝড়ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে দাঁড়িয়েছিল এবং যে নেতৃবৃন্দ ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের মতো বড় নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের কেউ কেউ আত্মসমর্পণে সন্তুষ্ট আর বড় অংশ ছত্রভঙ্গ, অপ্রস্তুত এবং আত্মহনন আর আত্মকলহে লিপ্ত। এর ফলাফল - এখনও এমন বাংলাদেশ আমরা টেনে যাচ্ছি, যার কথা ৬০ দশকের উদ্দীপ্ত সংগ্রামী আর অসাধারণ মানুষেরা তাঁদের রক্ত শ্রম মেধা দিতে দিতে চিন্তাও করতে পারেননি।

১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ : পর্যালোচনা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ' বিষয়ক আজকের এই বক্তৃতা ঠিক ইতিহাস বর্ণনা নয়। ইতিহাসের উপাদান নিশ্চয়ই থাকবে। আমরা জানি, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ইতিহাস লেখার বিভিন্নরকম কার্যক্রম আছে, অনেকগুলো বড় বড় কাজ ইতিমধ্যে হয়েছে। যেমন 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের দলিলপত্র' দশ খন্ড বের হয়েছে। সেটা আবার পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে, কোন কোন সংস্করণ সম্ভবত উঠিয়েও নেয়া হয়েছে, আবার নতুন করে সংশোধন সংযোজন হয়েছে। আমার কাছে প্রথম সংস্করণটাই আছে। এছাড়া অসংখ্য বইও লেখা হয়েছে। অনেকে ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করেছেন সেগুলো ইতিহাসের উপাদান তৈরি করেছে। ধর্ষিতা নারীর উপর গবেষণা গত কয়েক বছরে কিছু হয়েছে। ব্যক্তির অভিজ্ঞতা, অঞ্চলের ঘটনাবলী, সাক্ষাৎকার, গবেষণা বেশকিছু হয়েছে; আরও অনেক হতে হবে।

এর বাইরে বেশ কয়েকজন ব্যক্তি নিজস্ব উদ্যোগে কিছু ইতিহাস লিখেছেন। আমার নিজের বিবেচনায় এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হল *মূলধারা ৭১*, লিখেছেন মঈদুল হাসান। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পরিচালনার ক্ষেত্রে কী কী অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, কী কী ঘটনার মধ্য দিয়ে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ গেছে, কত ধরনের অনিশ্চয়তা এবং সংকট ছিল, সেগুলোকে কীভাবে অতিক্রম করা হয়েছে, কতটা করা গেছে এসব বিষয়ে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এছাড়া সম্প্রতি প্রকাশিত *মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর* গ্রন্থটিও সেই সময় ও যুদ্ধ কেন্দ্র করে নানা সমীকরণ বুঝবার জন্য খুব দরকারী।

১৯৭১: মুক্তিযুদ্ধের শুরুও না শেষও না

প্রথম কথা হচ্ছে আমার আজকের এই বক্তৃতার প্রাসঙ্গিকতা। আমি মনে করি, ১৯৭১ সাল মুক্তিযুদ্ধের শুরুও না, ১৯৭১ সাল মুক্তিযুদ্ধের শেষও না। বাংলাদেশের কিংবা এই অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘ দিনের মুক্তির যুদ্ধের একটা গুরুত্বপূর্ণ, খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল ১৯৭১, স্বাধীনতা যুদ্ধ। আমরা এই পর্বের ইতিহাস বা সেই সময়কার ঘটনা যদি পর্যালোচনা করি, তাহলে একটা প্রশ্ন খুব জোর নিয়ে একজনের মাথায় আসতেই পারে যে- বাংলাদেশের মানুষ কী করে, কোন সাহসে, কোন বলে, কোন শক্তিতে এরকম একটা ভয়ংকর সেনাবাহিনী, যেটা পৃথিবীর

অন্যতম সংগঠিত এবং সুপ্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সংগঠিত সেনাবাহিনী, তাকে মোকাবেলা করলো? এত সাহস এবং শক্তি কোথায় পেলো এই অঞ্চলের মানুষ? 'ভেতো বাঙালী' হিসেবেই ছিল তার পরিচয়। সেই ভেতো বাঙালী, কৃষক শ্রমিক কী করে এরকম সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করতে সক্ষম হলো? এরকম বাহিনীর মোকাবিলা করাই একটা বড় পরীক্ষা।

খেয়াল করলে আমরা দেখব যে, একটি জনগোষ্ঠীর এই সাহস বা শক্তি একটা নির্দিষ্ট সময়ে তৈরি হয় না, তার একটা ধারাবাহিকতা থাকে। ১৯৭১ সালে যখন যুদ্ধ হচ্ছে আমরা তখন মানুষের মুখে ক্ষুদিরামের গান শুনি কিংবা সূর্যসেনের গল্প শুনি, ব্রিটিশ বিরোধী লড়াই, তেভাগা আন্দোলন তাকে শক্তি দেয়। শুধুমাত্র দেশের অতীত থেকে শুনি তা না, ভিয়েতনামের গল্প আসে, চীন বিপ্লবের গল্প আসে, ব্রিটিশ বিরোধী ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের যারা স্মরণীয় তাদের কথা আসে, গল্প আসে, উপন্যাস আসে, এমনকি প্রাচীনকালের দাসবিদ্রোহ থেকে শুরু করে ফরাসী বিপ্লব সবকিছুই আমাদের কোন না কোন ভাবে উৎসাহিত করে, শক্তি দান করে। এই যোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস *খোয়াবনামা* লেখার পরে, মৃত্যুর আগে, তাঁর পরিকল্পনা ছিল ১৯৭১ সালের ওপরে, ১৯৭১ সালকে কেন্দ্র করে একটা উপন্যাস দাঁড় করানোর। সেটা নিয়ে তিনি মহাস্থানগড়, বগুড়ার বিভিন্ন জায়গা ঘুরেছেন। সেখানে একটা পরিবার আছে, পীরদের একটা পরিবার, তাদের বাড়ী বগুড়া অঞ্চলে 'পীরদের বাড়ী' বলে পরিচিত । সেই পীরবাড়ির সাতজন ছেলেকে একরাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী খুন করেছে। সেটাকে ধরেই আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের পরিকল্পনা ছিল ঐ অঞ্চলের পুরো জগৎ, পুরো সমাজ, ইতিহাস, চৈতন্য এবং পরম্পরাকে আবিষ্কার করা। সেভাবেই তিনি কাজ করছিলেন। মহাশ্বেতা দেবীর কাছে সেইসময়ে তাঁর লেখা একটা চিঠি, তখন ক্যান্সারের জন্য পা অপারেশন করে বাদ দেয়া হয়েছে সেই সময়, সেখানে তিনি যা লিখছেন তা মোটামুটি এরকম, 'আমার তো পা নেই। তাও দেখি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কতটুকু পাহাড়ে উঠে সেই কাজ করতে পারি। যাতে পাহাড়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে উঠতে পারি সেজন্য নিজের কলেজের সিড়ি ভেঙ্গে তার প্র্যাক্টিস করছি।' আপনারা অনেকে হয়তো দেখেছেন, ঢাকা কলেজের বড় সিঁড়ি তো একেবারে খাড়া। সেটায় উঠে দোতলায় বাংলা বিভাগ, তার বিভাগীয় প্রধান ছিলেন তিনি। যাতে কাটা পা নিয়ে মহাস্থানগড়ের পাহাড়ে উঠতে এবং অনুসন্ধানগুলো চালাতে পারেন সেইজন্য এই অসহ্য কষ্ট করার কথা বলছিলেন তিনি।

এখানে বারবার যে জায়গাটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় সেটা হল, ৭১এর মুক্তিযুদ্ধের উপর উপন্যাস লিখতে গিয়ে তিনি চলে যাচ্ছেন পিছনে। যেতে

যেতে কৈবর্ত বিদ্রোহ পর্যন্ত গেলেন। মনে হতেই পারে, কৈবর্ত বিদ্রোহের সাথে মুক্তিযুদ্ধের কী সম্পর্ক? কৈবর্ত বিদ্রোহ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে কী ভাবে মানুষের সম্পৃক্ততা তৈরি করতে পারে? তৈরি করতে পারে আসলে। একটা অঞ্চলে, একটা এলাকায়, একটা ধারাবাহিকতায়, একটা পরম্পরায় যে লড়াইগুলো হয় সেই লড়াইগুলো অচেতনে থেকেই যায়, নি:শ্বেষ হয়ে যায় না। অনেক লড়াই আছে যা আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়। একটা কথা আছে, একটা শ্লোগান আছে, একটা সুর আছে যে, 'কোন আন্দোলনই বৃথা যায় না' বা 'কোন রক্ত বৃথা যায় না'। এই কথা আক্ষরিকভাবেই সত্য। অনেক ব্যর্থতার উপরেই আসলে সাফল্য দাঁড়ায়। রোজা লুক্সেমবুর্গের একটা কথা আছে যে, you lose, you lose, you lose, you win। হারতে হারতে হারতে তারপরে বিজয় অর্জন করা যায়।

সাইমন বলিভার ল্যাটিন আমেরিকান বিপ্লবী, যার নামে এখন বলিভারিয়ান রেভ্যুলিউশন বলা হয়, তিনি ভেনেজুয়েলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যখন মারা যান মৃত্যুর সময় বলছেন, 'কী করলাম আমি সারা জীবন'? ল্যাটিন আমেরিকা তখন কিন্তু মুক্ত হয়েছে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির হাত থেকে। সেই লড়াইয়ে তিনিই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তারপরও সাইমন বলিভার মৃত্যুর সময় এই কথা বলছেন। কারণ স্বাধীনতা লাভের পর পুরো ল্যাটিন আমেরিকা দ্বন্দ্ব সংঘাত, নিজেদের মধ্যে নানারকম জটিলতার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। স্বাধীনতার অর্থটা মানুষের কাছে পৌঁছায় নাই। সাইমন বলিভার বলছেন, 'একমাত্র স্বাধীনতাটাই আমরা পেলাম আর সব কিছুই হারালাম।' স্বাধীনতা পেয়েছি আর সব কিছুই হারিয়েছি- কী মর্মান্তিক উচ্চারণ! মৃত্যুর মুখে এসে তিনি গভীর বেদনায় বলছেন, 'আমি কি সারা জীবন সমুদ্রের পানিতে চাষ করলাম?'

সমুদ্রের পানিতে চাষ, সমুদ্রে চাষ মানে কী? অর্থহীন। সমুদ্রের পানিতে লাঙল দিয়ে চাষ করার কোন অর্থ নেই। বলছেন, 'আমি কি সেটা করলাম'? আপনারা চিন্তা করেন, সাইমন বলিভার এরকম একটা ব্যর্থতার যন্ত্রণা নিয়ে মারা যাচ্ছেন। মারা গেলেন। সেই সাইমন বলিভার এখনও পুরো ল্যাটিন আমেরিকায়, বিপ্লবী যত ধরনের তৎপরতা বা লড়াই হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদকে মোকাবেলার যতরকম যা কিছু লড়াই হচ্ছে সেখানে সাইমন বলিভার হচ্ছেন অন্যতম প্রধান ইন্সপিরেশন, প্রেরণার উৎস। কেন? যদি এরকম হতো, ক্ষমতায় এসে যদি তিনি সাফল্যে, সন্তুষ্টিতে ডুবে থাকতেন তাহলে হয়তো এরকম প্রেরণার উৎস হতে পারতেন না। কিন্তু তার সাফল্য, বিপ্লবী চেতনা এবং সেই সঙ্গে অসম্পূর্ণতার যে বেদনা সমস্ত কিছুই পরবর্তী আরো লড়াই বিকশিত করার তাগিদ ঐ সমাজেই তৈরি করেছে। সুতরাং প্রত্যেক পর্যায়, প্রতিটি লড়াই আসলে একেকটা সমাজে বা একেকটা জনপদে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের চেতনার ধারাবাহিকতা তৈরি করে, তার স্পিরিট তৈরি

করে, তার সাহস তৈরি করে, শক্তি তৈরি করে। সেই ধারাবাহিকতাতেই তৈরি হয় মানুষের পথ।

আমরা ফুলবাড়ী গণঅভ্যুত্থানের অঞ্চলে অনুসন্ধান করতে গিয়ে বা আলোচনা করতে গিয়ে সন্ধান পাই তেভাগা আন্দোলনের লড়াই সেখানে হয়েছিল। যে লড়াই তাদেরকে এখনও শক্তি দান করে। তো আজকে যে লড়াই হচ্ছে সেটা সামনে আরো অন্যান্য বহু অঞ্চলে শক্তি দান করে। করছে। করবে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ সে কারণেই যদি ঠিক মত পর্যালোচনা করতে হয় তো এই ক্যানভাসের মধ্য দিয়েই দেখতে হবে। বিষয়টা এরকম না যে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ৬ দফা আন্দোলন শুধুমাত্র এই কয়েকটা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে। এ অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘ সময়ের মুক্তির যে যুদ্ধ তার ধারাবাহিকতায় এই ১৯৭১ সাল। আবার ১৯৭১ সালেও শেষ হয় নাই। সেই ধারাবাহিকতাটা এখনও চলছে। সে কারণেই ১৯৭১ সাল বা মুক্তিযুদ্ধ এখনও একটা বর্তমান বিষয়। খুবই বর্তমানের বিষয় এবং ভবিষ্যতের বিষয়।

১৯৭১ এর সময়

তো ১৯৭১ সালের যে পর্ব, সেই পর্বের খুব কাছাকাছি সময়ের যে ঘটনাগুলো, যেভাবে পরিপ্রেক্ষিতটা তৈরি হয়েছে সেটা আপনারা সবাই জানেন। তার মধ্যে আমি খুব বেশি যাব না। ১৯৪৭ সালে কীভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রক্তের উপর ব্রিটিশ শাসনের অবসান, তার থেকে ভারত ভাগ হয়ে ভারত-পাকিস্তান হল; আবার ৫২-র ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলের মানুষের যে আত্মোপলব্ধি, স্বাতন্ত্র্যবোধ বা জাতিগত নিপীড়নবিরোধী যে লড়াই সে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের অগ্রসর হওয়া এগুলো আমরা সবাই জানি। ৬০ দশকের মধ্যে দিয়েই অনিবার্য হয়ে উঠলো এই ১৯৭১। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই ৬০ দশক খুব গুরুত্বপূর্ণ, বাঙালী এবং এই অঞ্চলে অন্যান্য যেসকল জাতিসত্ত্বা আছে তাদের ইতিহাসেও। ৬০ দশক পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের ইতিহাসেও অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তৈরি করেছে। একদিকে আমরা দেখি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সামরিক শাসন হচ্ছে, ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকায়। অন্যদিকে মুক্তির লড়াইও বেগবান হল এই দশকেই।

আপনারা খেয়াল করলে দেখবেন অনেকগুলো দেশ স্বাধীনতা লাভ করলো চল্লিশ দশক এবং পঞ্চাশ দশক জুড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে। ব্রিটিশ সহ ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের পর্বও এখানেই শেষ হল। পাকিস্তান-ভারতও এর অন্তর্ভূক্ত। আর এই গোটা পঞ্চাশ দশক জুড়ে নতুন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য, এবং ঐ দেশগুলোর দেশী যে শাসক শ্রেণী তাদের আধিপত্য তৈরি করার জন্য নতুন ধরনের বিন্যাস তৈরি হচ্ছিল। সেই বিন্যাসটাকে স্থায়ী করার জন্য বা দমন-পীড়ন অবাধ করার

জন্য একের পর এক দেশে জারী হচ্ছিল সামরিক শাসন। সেই সামরিক শাসন ষাট দশকে এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকার বহুদেশে দেখা গেল। পাকিস্তানও এর মধ্যেই পড়ে।

সামরিক শাসন আমরা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দেখেছি। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন শুরু হল। সেই সামরিক শাসন পুরো ষাট দশক জুড়ে শাসন করল। ঐ সময়টাতে একদিকে সামরিক শাসন, অন্যদিকে জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনও ব্যাপকতা লাভ করছে। ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ঘটনাবলী এদেশের মানুষদের কাছে একটু একটু পৌঁছাচ্ছে। সেসময় সবচাইতে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল ভিয়েতনাম।

ভিয়েতনামের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। এটা এমন একটা দেশ যেখানে গরীব মানুষই বেশি এবং নিরস্ত্র। সেখানকার মানুষ কী করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভয়ংকর সেনাবাহিনীকে একের পর এক নাকানি চুবানি খাওয়াচ্ছে তার কাহিনী, তখন তো ইন্টারনেট ছিলনা, স্যাটেলাইট ছিলনা, তবু আমরা কিছু কিছু পেতাম। কিছু কিছু পত্রিকায় দু'য়েকটা ছবি আসত এবং তার মধ্য দিয়ে কিছু ভাষ্য। একটা বিবরণ এখনো মনে আছে, কারণ এরকম পরে আরও অনেক ঘটনা ঘটেছে। ভিয়েতনামের কোন গ্রামে মার্কিন সেনাবাহিনী হেঁটে যাচ্ছে, আগুন ধরাতে যাচ্ছে কয়েকটা গ্রামে। হঠাৎ করে তারা একটা জায়গায় গিয়ে অনেক গভীরে হুড়মুড় করে পড়ে গেল। পুরো ফাঁদটাই তৈরি করা ছিল। তারপর সাথে সাথেই চারিদিক থেকে হঠাৎ করে শত শত হাজার হাজার মানুষ এসে ঘেরাও করে তাদেরকে পাকড়াও করল।

এই একই ষাট দশকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, টঙ্গীসহ সমস্ত জায়গায় পাকিস্তানি জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে, তারপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন এবং শ্রমিক আন্দোলন ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছিল, ব্যাপকতা লাভ করছিল। ষাট দশকের শেষে ঊনসত্তরের যে গণঅভ্যুত্থান হয় তা এক বিশাল ঘটনা। বামপন্থীদের যেখানে খুবই সক্রিয়, নেতৃস্থানীয় ভূমিকা ছিল। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত বাংলাদেশে বা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বামপন্থীদের ভূমিকার সর্বোচ্চ বিন্দু আমরা দেখি। ৬৯র পর বামপন্থীদের নেতৃস্থানীয় ভূমিকার ধারাবাহিকতা আর অব্যাহত থাকেনি। শুরু হয় ক্ষয়, ঊনসত্তরের আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং তার প্রভাবে অন্যান্য দেশের মত এই অঞ্চলেও কমিউনিস্ট পার্টি প্রথমে দ্বিধাবিভক্ত, তারপরে বহুধা বিভক্ত হয়। বহুধা বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন ধরনের লাইন তৈরি হয়। সেগুলির ডিটেইলে আমি যাব না এখন। কিন্তু তার ফলে বাম আন্দোলনের শক্তি অনেক ক্ষয় হয়।

ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক আন্দোলনে প্রধানত বামপন্থীদের প্রাধান্য ১৯৬৯-র পরে আস্তে আস্তে কমতে থাকে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারা ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হয়ে সেই জায়গাটা দখল করে। ৬৯-র গণঅভ্যুত্থানের আগে শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা আন্দোলনের কারণে ও পরে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার' আওতায় বন্দি ছিলেন। অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বিপুল জনপ্রিয় নেতা হিসেবে তিনি মুক্তি পেলেন। মুক্তির পর শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হয়, প্রভাব অভূতপূর্ব মাত্রায় বিস্তৃত হয়। অন্যদিকে বামপন্থীরা নিজস্ব দুর্বলতার কারণেই ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে। ১৯৭০ সালে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। একটা হচ্ছে ভয়ংকর জলোচ্ছ্বাস, অন্যটি হল সাধারণ নির্বাচন। ১২ই নভেম্বর একটা ভয়ংকর জলোচ্ছাস হয় পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় অঞ্চলে এবং সেই জলোচ্ছাসে কত লোক মারা গেছেন তা এখন পর্যন্ত জানা যায় নি। তবে দশ লাখের কম নয়। এরকম একটা ভয়ংকর জলোচ্ছাসের পরে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের কোন প্রতিনিধি পূর্ব পাকিস্তানে দেখতে আসেন নি। এই পর্বটি আমি বিশেষভাবে বলছি আমাদের তরুণদের জন্য, যাদের কাছে এ জিনিসগুলো কিছু কিছু জানা, কিছু কিছু শোনা, কিছু কিছু ভাসা ভাসা।

গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের পতন ঘটল। কিন্তু আইয়ুব খান পুরোপুরিভাবে একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে না গিয়ে সামরিক বাহিনীর হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন। যিনি আবার প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হলেন, তিনি জেনারেল ইয়াহিয়া খান। সেটা ঘটল ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে। সেই ইয়াহিয়া খান প্রথমে এসে নির্বাচন দেবেন, এই করবেন, সেই করবেন, ঢাকা শহরে এলেন, তার খুবই বাঙালী প্রেম আমরা শুনলাম। ১৯৬৯-৭০ সালের ১২ই নভেম্বরের মধ্যে এরকম অনেক ধরনের ঘটনা ঘটলো। পাকিস্তানি শাসকদের পরিকল্পনা ছিল, নির্বাচন হবে কিন্তু নিশ্চিত থাকতে হবে নির্বাচনে তাদের কর্তৃত্ব থাকে। নির্বাচনের পর যে সরকার হবে তাতে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী, পাকিস্তানের যে বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণী এবং পাকিস্তানের যে বাইশ পরিবার তাদের যেন কর্তৃত্ব থাকে সেটা নিশ্চিত করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। সুতরাং সেই ভাবেই তারা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বরের জলোচ্ছ্বাসের পরে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের আরও মোহমুক্তি ঘটল, স্বায়ত্তশাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আন্দোলনের তাগিদও অনেক বিস্তৃত হল। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর নির্বাচন হল, সাধারণ নির্বাচন। সামরিক শাসনের আইনগত কাঠামোর অধীনে সেই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও তাতে শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ, একক এবং বলা যেতে পারে সমগ্র রাজনীতির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মত ফলাফল

পেলেন। এই অঞ্চল থেকে উল্লেখযোগ্য অন্য কেউ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেননি। মওলানা ভাসানীর নির্বাচনে অংশগ্রহণের সম্ভাবনা ছিল কিন্তু তাঁর যারা মিত্র রাজনৈতিক দল, চীনপন্থীরা নির্বাচন বয়কট করায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি নির্বাচন থেকে দূরে থাকলেন। যাই হোক নির্বাচনের ফলাফলটাই ইতিহাসকে টেনে নিল ১৯৭১ এর দিকে।

কিশোরের ১৯৭১

এখন ধরেন ইতিহাস হিসেবে ঘটনাবলী একের পর এক আমি সাজাতে পারি, ব্যাখ্যা করতে পারি। কিন্তু আমি মনে করছি যে, এভাবে না বলে সেই সময়ে আমার নিজের যে অভিজ্ঞতা, আমি যা দেখেছি সেসময় তার সাথে আমি মিলিয়ে বলি। আমি সে সময় যে অবস্থায় যে বয়সে ছিলাম তাতে সবকিছু যথাযথভাবে দেখতে পেয়েছি, বুঝতে পেরেছি তা তো না। কিন্তু সেই বয়সের একজন কিভাবে দেখেছে, কতটুকু ধারণ করেছে, অংশগ্রহণ করবার তাড়না কতটুকু অনুভব করেছে, সেটাও ইতিহাসের অংশ। শুধু আমার হিসেবে নয়, আমি দেখতে চাচ্ছি ঐ সময়ে একজন যে বেড়ে উঠছে স্কুলে, সে কীভাবে দেখছে ঘটনাগুলো, কী তাগিদ নিয়ে অস্থিরভাবে ছোটাছুটি করছে সেটিও।

আমার মনে আছে আমি যখন ক্লাস সিক্স বা সেভেনে পড়ি, মানে ৬৭ বা ৬৮ সাল, সেই সময়ে প্রথম স্কুল থেকে মিছিলে যাই। তখন অনেক আন্দোলন হচ্ছে, ছাত্র আন্দোলন হচ্ছে, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নাম শুনছি তখন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে ছাত্রলীগ আছে, ছাত্র ইউনিয়ন আছে। সেই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সমাবেশ, তারা সারা ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে যাচ্ছে মিছিলে । সেই রকম কোন একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হবে, আমার ঠিক মনে নেই। সে সময় আমার স্কুল খিলগাঁও সরকারি হাইস্কুল। অনেকের সাথে আমিও গেলাম। কীভাবে গেলাম, কার সাথে গেলাম আমার মনে নাই। গিয়ে দেখি সেখানে বড় সমাবেশ হচ্ছে। সম্ভবত সমাবেশ হচ্ছিল বর্তমান ঈদগাহ ময়দানের জায়গাটায়।

তো ঢাকা শহরে তখন এগুলো একের পর এক হচ্ছে। সমাবেশ হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। মুল দাবী কি? মুল দাবী পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা ছাড়তে হবে। শ্লোগান শুনি, 'আইয়ুব মোনেম দুই ভাই, এক দড়িতে ফাঁসি চাই।' এই মোনেম খান বাঙালী, পূর্ব পাকিস্তানের গবর্ণর, এই অঞ্চলে আইয়ুব খানের প্রধান খুঁটি। ১৯৬৯-র গণঅভ্যুত্থানের সূচনা সময়ের একটা স্মৃতি আমার এখনও মনে আছে। তখন ক্লাস এইটে পড়ি, গভর্ণমেন্ট ল্যাবরেটরী স্কুলে। সেই সময় একদিন সেইসময়ের তুলনায় অনেক রাতে, এগারোটা বারোটা এরকম হবে, তখনকার কথা। তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী কী আইন করেছে, কার্ফু ইত্যাদি সেগুলো তো

আমার জানা ছিল না। কিন্তু সেই রাতে অনেক আওয়াজ শুনে আমরা বারান্দায় এলাম। আমরা ঢাকা শহরের খিলগাঁও চৌধুরীপাড়ায় থাকতাম। তখন শহরতো এতো জনবহুল না, চারিদিকে শব্দ অনেক কম, রাত বলে আরো নীরব। সেই নীরবতা ভেঙে চুড়ে প্রবল শক্তি নিয়ে শ্লোগান আসছে- 'তোমার আমার ঠিকানা: পদ্মা, মেঘনা, যমুনা,' 'শ্রমিক কৃষক জনতা, গড়ে তোল একতা', 'কার্ফু কার্ফু মানি না মানবো না'। সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে শ্লোগান হচ্ছে। পরে জেনেছি যে সামরিক বাহিনীর কারফিউ ভঙ্গ করে তখন এই এলাকা থেকেই প্রথম মিছিল যাচ্ছিল সামরিক বাহিনীর ক্যাম্পের দিকে। কারফিউ ভঙ্গ করে মিছিল হচ্ছে, সেই শ্লোগান একের পর এক বাজছে। চারিদিকে ধ্বনি প্রতিধ্বনিও শুনছি। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই, শ্লোগান শুনতে শুনতেই, গুলির আওয়াজ শোনা গেল।

ঠিক এরকম একটি ঘটনার বর্ণনা আপনারা পাবেন, যদি পড়ে না থাকেন অবশ্যই পাঠ্য, সেটা হচ্ছে *চিলেকোঠার সেপাই*, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের। সেখানে কারফিউ ভেঙে মিছিল যাচ্ছে, সেই মিছিলে আছেন হাড্ডি খিজির। কারফিউ ভেঙ্গে যখন মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে তখন গুলিবর্ষণ হল, মানুষ তবুও থামছে না, রক্তে ভেসে যাচ্ছে, মানুষকে হটানো যাচ্ছে না। অচেতনের মধ্যে হাড্ডি খিজির পেয়ে যাচ্ছে তেভাগাসহ ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সব শহীদদের। এই সময়ের এক অসাধারণ বর্ণনা পাই ইলিয়াসের হাত দিয়ে। এই বর্ণনাটা আমার অভিজ্ঞতার সাথে পরে মেলাতে পেরেছি। সুতরাং এটা এমন এক সময় যখন সামরিক বাহিনী দিয়ে, কারফিউ দিয়ে, গুলি করে আর কোনকিছু নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। সেই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে পূর্ব বাংলা, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান, নতুন একটা পর্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

১৯৭০ সালের আরেকটা স্মৃতি আমার মনে আছে। সেটাও জানি না, আমার মনে নাই, কাদের সাথে গিয়েছিলাম। সেটা হচ্ছে পল্টন ময়দানের একটা জনসভা। মওলানা ভাসানীর জনসভা। ১৯৭০ সালের শেষ দিকে কিংবা ১৯৭১ সালে জানুয়ারী ফেব্রুয়ারি মাসে হবে। সেখানে স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলার শ্লোগান হচ্ছিল এবং মাথায় লাল পট্টি দেয়া ছিল সবার। আমার মাথায়ও কেউ একজন লালপট্টি বেঁধে দিয়েছিল। মাথায় লালপট্টি নিয়েই ফিরেছিলাম সেই সময়। পথে, বাসে লোকজন অনেকে তাকাচ্ছিলো, কী ব্যাপার মাথায় লালপট্টি, এই ছেলে-পেলেরা কারা? স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাংলার শ্লোগানটা ছিল সে সময়, এটাই খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। তার মানে স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাংলা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা বা দাবি সমাজে আগে থেকেই তৈরি ছিল। এবং তা ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে জনসভার মধ্যেও উচ্চারিত হয়েছিল।

সেইসময় আমাদের পাড়াতেই ছিল গণশিল্পী গোষ্ঠী। গাজীউল হকের ভাই নিজামুল হক এর নেতৃত্বাধীন এ্ই দলের মুখেই আমার প্রথম গণসঙ্গীত শোনা। আমি কখনও তাদের সাথে গান গাইনি, তবে আমার বড়ভাই, পল্লীমা সংসদের প্রতিষ্ঠাতা, ময়না তখন এই দলের সাথে ঘুরতেন, গাইতেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবার পর শেখ মুজিবুর রহমান বা আওয়ামী লীগ সারা পাকিস্তান শাসন করবেন- এটাই ছিল শাসনতান্ত্রিক বিধান। ভোটের ফল অনুযায়ী, সারা পাকিস্তানের মধ্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনপ্রাপ্ত দল আওয়ামী লীগ, কাজেই এই দল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করবে এবং আওয়ামী লীগের প্রধান হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হবেন, এটাই যৌক্তিক প্রত্যাশা তখন। এটাও মনে আছে যে, সম্ভবত ২২ জানুয়ারি ১৯৭১ নির্বাচিত সকলকে নিয়ে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হল, শেখ মুজিব সকলকে শপথ করালেন। জাতীয় সংসদের অধিবেশন দেয়া হয়েছে, ২৫ মার্চ অধিবেশন বসবে। তার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ নতুন শাসনভার গ্রহণ করবে, ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্ত ান্তর করবে। ইয়াহিয়া খানও বারবার বলে যাচ্ছেন- হ্যাঁ, আমি নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করব। করতেই চাই।

কিন্তু পাকিস্তানের সংবিধানও তো হতে হবে। পাকিস্তানের কোন সংবিধান নাই, সামরিক শাসনের মধ্য দিয়ে আগের অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল হয়েছে। সংবিধান কী নীতিমালার ভিত্তিতে হবে, কী কাঠামো ধরে হবে সেটা নিয়ে বিতর্ক। আলোচনা বিতর্কে ৬ দফাই কেন্দ্রে, কী যোগ হবে, কী বিয়োগ হবে, সেগুলো নিয়ে কথা হচ্ছে। ওদিকে শুধু পশ্চিম পাকিস্তান বিবেচনা করলে, সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়েছে পাকিস্তান পিপলস পার্টি। তার নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো, বেনজির ভুট্টোর পিতা, তখন কার্যত পশ্চিম পাকিস্তানের মুখপাত্র। তাদের দাবী দাওয়ার মধ্যে উস্কানিমূলক ব্যাপার ছিল। তাঁদের দাবি ছিল- জাতীয় সংসদের অধিবেশন হতে হবে পশ্চিম পাকিস্তানে, ৬ দফার ভিত্তিতে করলে হবে না। নানাদিক থেকে অনেক ধরনের দাবী উঠছে, সেসবের ভিত্তিতে গোপন বৈঠক হচ্ছে এবং জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়েছে একাধিকবার। এই একাধিকবার স্থগিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত তারিখ নির্ধারিত হল ৩ মার্চ ১৯৭১। জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসবে ঢাকায়। নিয়মতান্ত্রিক ভাবে সবকিছু অগ্রসর হলে সেই অধিবেশনের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করবার কথা আওয়ামী লীগের।

১ মার্চ থেকে শুরু

এই পরিপ্রেক্ষিতেই শুরু হল ১৯৭১ সালের পর্ব। ১লা মার্চ। ১লা মার্চ যে জায়গা থেকে সারা ঢাকা শহর উত্তাল হল সেখানে আমার থাকার কোন কথা না। কিন্তু ঘটনাক্রমে আমি সে জায়গাটাতেই ছিলাম। আমি একাধিক স্কুলে পড়েছি।

ক্লাশ নাইনের শেষ দিকে, ১৯৭০ সালে, অনুপস্থিতির অপরাধে ল্যাবরেটরী স্কুলে আমার নাম কাটা গেল। তার ফলে আমার স্কুল আবার বদলালো। এরপর আমি যে স্কুলে পড়ি সেটা হচ্ছে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল। ক্লাস নাইনের পরীক্ষা শেষ, ক্লাস টেনের ক্লাস শুরু হয়েছে কেবল, এরকম একটা সময় ১ মার্চ। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে যাওয়ার জন্য, বাসা থেকে কিছুটা হেঁটে এসে, রামপুরা সদরঘাট রুটে একটা ভাঙাচোরা বাসে উঠতে হতো। সেদিনও সেই বাসে উঠেই আমি কলেজিয়েট স্কুলের দিকে যাচ্ছিলাম। খুব যে আগ্রহ নিয়ে যাচ্ছি তা না। যাচ্ছি স্কুল শুরু হয়েছে, প্রথম দিকের ক্লাস, যাই এরকম। যাত্রাপথেই ঢাকার একমাত্র স্টেডিয়াম। তখন খেলা হচ্ছে কোন ক্রিকেট খেলা। সেটা আমার জানা ছিলনা এবং খেলা দেখার আমার কোন পূর্ব পরিকল্পনাও ছিল না। স্টেডিয়ামের কাছে যখন বাস গেলো, তখন দেখলাম ক্রিকেট খেলা হচ্ছে পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড।

তখন যে আমি খুব ক্রিকেট ভক্ত ছিলাম এরকমও না, ক্রিকেট খেলা দেখার জন্য পাগল ছিলাম তাও না। কিন্তু মনে হয় স্কুলে যাবার চাইতে এটাই বেশি টানলো। আমি স্কুলে না গিয়ে বাস থেকে নেমে স্টেডিয়ামে ঢুকলাম খেলা দেখার জন্য। পাকিস্তান এবং নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেট খেলা, কিন্তু সেসময় ভীড় অত বেশি ছিল না। ঢুকতে পারলাম সহজেই। আমি যখন গ্যালারীতে বসলাম তখন খেলা চলছে, পাকিস্তানের হানিফ মোহাম্মদ নামে একজন খুবই নামী ক্রিকেটার ছিলেন, সিক্স চার পেটানোর জন্য তার খুব খ্যাতি ছিল, ছিলেন ইন্তেখাব আলম। হানিফ মোহাম্মদ বা ইন্তেখাব আলম তখন ব্যাটিং করছেন। ছয় হচ্ছে, চার হচ্ছে। সারা মাঠে উল্লাস, পাকিস্তান টীমের পক্ষে। খুবই উৎসব মুখর একটা পরিবেশ। আমার ঠিক পেছনে এক লোকের কাছে রেডিও, বাজছে। খেলা দেখার সাথে সাথে রেডিওতে খেলার ধারাবিবরণী শোনেন। খুবই সিরিয়াস দর্শক। সেই রেডিও ধারাবিবরণীতে ১২টার খবরের বিরতি।

সেই ১২টার খবরেই জানানো হল যে, ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেছেন। ১লা মার্চ ১২টার সময় এই খবর প্রচারিত হল। এই খবরের সময় ঢাকার সব চাইতে বড় সমাবেশ ঐ স্টেডিয়ামেই। এই খবরটা শুনলাম, প্রথমে অতো খেয়াল করিনি খবরটা। শুনলাম, কিন্তু এর কী পরিণতি, কী তার তাৎপর্য্য সেসব তখন আমার মাথায় নাই। ১০/১৫ মিনিটের মাথায় প্যান্ডেলের উল্টোদিকে দেখলাম আগুন। জিপিওর পাশে স্টেডিয়ামটাই, তখন আর কোন স্টেডিয়াম ছিল না। প্যান্ডেলে আগুন দেখা যাচ্ছে, কিছুক্ষণের মধ্যে আগুনটা আরো ছড়াল। সবার মধ্যে সাংঘাতিক অস্থিরতা। কিছুক্ষণ আগে যে টীমের জন্য স্টেডিয়ামের সারা মানুষ উল্লসিত ছিলেন কিংবা তাদের সমর্থনে শ্লোগান, হৈ চৈ নানান কিছু করছিলেন, সেই পাকিস্তানী খেলোয়াড়দের দেখলাম

তারা তাড়া করছেন। খেলোয়াড়রা দৌড়াচ্ছে, পেছনে দর্শকেরা দৌড়াচ্ছে, ভালবেসে নয় মার দেবার জন্য, মারবে। উইকেট কাদের হাতে এটাও বোঝা যাচ্ছে না। সাংঘাতিক রকম ছত্রভঙ্গ অবস্থা। তবে প্লেয়াররা কোন রকমে জান বাঁচাতে পারল।

কিন্তু পুরো মাঠ তখন অন্যরকম। কিসের খেলা, কিসের পাকিস্তান। তখন সরাসরি শ্লোগান হচ্ছে 'বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'বীর বাঙালী অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো'। প্যান্ডেল ছিঁড়ে, বাঁশ টাশ খুলে টুলে, আগুন টাগুন লাগিয়ে ঐখান থেকেই মিছিল শুরু হল। স্টেডিয়ামে যারা এতক্ষণ ছিলেন ক্রিকেট খেলার দর্শক, তারাই হয়ে গেলেন মিছিলের প্রধান শক্তি। যেহেতু এতলোক ঐখানেই ছিল সুতরাং প্রধান মিছিল শুরু হল ওখান থেকেই। জনতার মিছিল ঢাকা শহরে ঢুকল, ছুটতে থাকলো। তারপরে হয়তো যোগ হল বিশ্ববিদ্যালয়। আমিও যাচ্ছি মিছিলের সাথে সাথে। এখন বলতে পারবো না মিছিল কোথায় কোথায় গেলো। সারাদিন কাঁধে একটা বাঁশ নিয়ে কোথায় কোথায় গেলাম সেটা মনে নাই। যখন ফিরেছি বাসায় তখন সন্ধ্যা, কাঁধে সেই বাঁশ। বাসায় রাশভারী বাবার মুখেও দুশ্চিন্তার ছাপ। সারা ঢাকা শহর সেদিন ছিল মিছিলের শহর। প্রতিবাদের শহর। কারণ সংসদ অধিবেশনের তারিখ পেছাতে পেছাতে, সর্বশেষ এই পেছানোর মধ্য দিয়ে পাকিস্তান সরকার একটা অবস্থান পরিষ্কার করেছে যে আর জাতীয় সংসদের অধিবেশন হবে না।

এই ১লা মার্চের ঘটনার মধ্য দিয়েই কিন্তু নতুন পর্বের শুরু হল। আপনারা জানেন ১লা মার্চ, ২রা মার্চ এবং তার পর ক্রমান্বয়ে পরিস্থিতিটা এমন হল যে আওয়ামী লীগ এবং শেখ মুজিবুর রহমান তখন সকল তৎপরতার কেন্দ্রে। শেখ মুজিবুর রহমান তখন একক নেতা হিসেবে আবির্ভূত। নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধান হিসেবে এটা তার সাংবিধানিক এখতিয়ারও বটে। পাশাপাশি অন্যান্য নেতা ও দলও স্বাধীনতার সমর্থনে দাঁড়ালেন। যেমন মওলানা ভাসানী, মণিসিংহ। সেই সময় সিরাজ সিকদারও পরিচিত হচ্ছেন বিশেষতঃ বামপন্থীদের মধ্যে । তাঁরাও সে সময় ১লা মার্চের পর সমর্থন দিয়েছেন শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগকে। সিরাজ সিকদার সেসময় লিফলেট দিয়ে আহবান জানিয়েছেন, সর্বদলীয় কমিটি গঠন করেন এবং এখন স্বাধীনতা সংগ্রামই হচ্ছে প্রধান।

৭ই মার্চ রেসকোর্সে শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন এরকমই আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম। সেই ঘোষণার জন্য ৭ই মার্চের জনসভার দিকে সবাই তাকিয়ে আছে। আমিও তখন ৭ই মার্চের জনসভায় যাবো সেরকম একটা ইচ্ছা করছি। কিন্তু ঐ বয়সে ৭ই মার্চের জনসভায় একা একা যাওয়া কঠিন ছিল, আব্বাসহ বড় যারা ছিলেন তাঁরা মোটেই যেতে দিতে রাজি হলেন না এবং যেতে যাতে না পারি সেটা

নিশ্চিত করলেন। যেতে পারলাম না। কথা ছিলো রেডিওতে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ। শেষ মুহূর্তে রেডিও ঘোষণা করল যে, এটা সম্প্রচার করা হবে না। তারপর রেডিওতে বা অন্যান্য জায়গায় সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া হয়েছে, আমরা পরে জেনেছি। রেডিও পরে রেকর্ডকৃত ভাষণ প্রচার করেছে সম্ভবত ৭ই মার্চ রাতে বা ৮ই মার্চ সকালে। আমাদের একটা ফিতা ঘুরানো টেপ রেকর্ডার ছিল, মনে আছে যে আমি এবং আমার ভাইয়েরা মিলে ঐ টেপ রেকর্ডারে বক্তৃতাটা রেকর্ড করেছিলাম। রেকর্ডটা এখনও থাকলে ভালো ছিল কিন্তু রেকর্ডটা রাখা যায় নি পরে। সেপ্টেম্বরের দিকে সামরিক বাহিনী যখন পাড়ায় বিভিন্ন বাসায় হামলা করছে সেসময় আমার বড়বোন ঐ ফিতা নষ্ট করে ফেলেন। সেই পর্যন্তও ছিল পুরো ভাষণটি।

মার্চের প্রথম থেকেই পাড়ায় পাড়ায় লড়াইএর নানারকম প্রস্তুতি চলছিল। আমাদের বয়সী ছেলেদের মধ্যে কিংবা বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে কীভাবে নতুন চিন্তা তৈরি হচ্ছে, দল বা মেইনস্ট্রিমের বাইরে কী কী ধরনের প্রক্রিয়া ঘটছে সেটা বোঝার জন্যই এগুলো বলছি। আমাদের পাড়ায় পল্লীমা সংসদ তখন দুই বছর বয়সী ছোট সংগঠন, সেখানেই আমাদের সকল তৎপরতার কেন্দ্র। সেখানেও এগুলো নিয়ে কথাবার্তাই তখন প্রধান। শেখ মুজিবুর রহমান বারবার বলেছেন অহিংস পথে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। তর্ক-বিতর্ক ছিল অহিংস পথে স্বাধীনতা আদৌ সম্ভব কি না। সশস্ত্র পথে হবে কী না, সশস্ত্র পথে হলে কীভাবে লড়াই হবে, আওয়ামী লীগ আদৌ প্রস্তুত কী না। এসব নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে, আমার বা আমার মতো আরও অনেকের এগুলো নিয়ে জানাবোঝা খুবই কম। তা সত্ত্বেও, পরিস্থিতির কারণেই আগ্রহ ক্রমাগত বাড়ছে, জানাবোঝার চেষ্টাও।

২৫শে মার্চ ও তারপর

২৫শে মার্চ পর্যন্ত অনেক ধরনের ঘটনা ঘটল, দিনের তুলনায় ঘটনার সংখ্যা এবং বহুমাত্রিকতা অনেক বেশি। সেই সময় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বা নেতৃত্ব পর্যায়ে কী কী হয়েছে সেগুলোর ইতিহাস আমরা এখন অনেকখানি জানি। সর্বশেষ একটা বই প্রকাশিত হয়েছে *মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর*। এটা হচ্ছে কথোপকথন। এতে আছেন মঈদুল হাসান, এ কে খন্দকার এবং আরো দুজন। তাদের মধ্যে কথোপকথনে তারা সে সময়ের গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো ঘটনার বর্ণনা করেছেন।

যে বাঙালী আর্মি অফিসাররা তখন বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে আছেন তারা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন, পাকিস্তান আর্মি ক্রমান্বয়ে তার শক্তি বাড়াচ্ছে। আর্মস, অ্যামুনিশন নিয়ে আসছে এবং ফোর্সসংখ্যাও বাড়ছে, পাকিস্তান আর্মি ক্রমাগত আসছে একের পর এক। বড় বড় বাহিনী। বোঝা যাচ্ছে যে তাদের একটা এগ্রেসিভ মিলিটারি প্ল্যান তৈরি হয়ে আছে। বাঙালী অফিসারদের মধ্যে যারা

এদেশে আত্মসমর্পণ করছেন বা এটাকে মেনে নিচ্ছেন তারা তো আছে, কিন্তু যারা মেনে নেন নি তাঁরা আতংকিত বোধ করছেন। মেনে নিলেও কিন্তু নিরাপত্তা নাই। একজন বাঙালী অফিসার বাঙালী হওয়ার কারণেই নিরাপত্তাহীন, পরিস্থিতিটাই এরকম। সে কারণেই বাঙালী সামরিক কর্মকর্তারা আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের কাছে বারবার খবর দেয়ার চেষ্টা করছেন যে, এরকম প্রস্তুতি চলছে, আপনারা রাজনৈতিক ভাবে এর বিরুদ্ধে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। কিংবা আমাদেরকে বলেন আমরা কী করতে পারি, মিলিটারি একটা প্রস্তুতি দরকার। কিন্তু শেখ মুজিব সহ রাজনৈতিক নেতৃত্ব কোনভাবেই প্রয়োজনীয় সাড়া দিচ্ছেন না। স্বাধীনতার ঘোষণা দেবার জন্য তাজুদ্দীন আহমদের চেষ্টাতেও তিনি নির্লিপ্ত থাকছেন, এগুলোর বিস্তৃত বর্ণনা এই গ্রন্থের মধ্যে আছে।

এগুলো ঘটতে ঘটতেই ২৩ মার্চ বাংলাদেশ দিবস হল। ২৫ মার্চ রাতে এই অঞ্চলের মানুষের উপর যে ভয়ংকর পর্ব শুরু হল তার কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা এই অঞ্চলের মানুষের ছিল না। সেদিন থেকে শুরু করে পরবর্তী কয়েক মাস ধরে গণহত্যাসহ নির্যাতনের বিস্তৃতি দেখলো বাংলাদেশের মানুষ। প্রতিরোধও তৈরি হল প্রথম থেকেই। আমরা যারা সেই সময় কিশোর বয়সী তাদের জন্য এসব ঘটনা আরও অভাবিত। ২৫ মার্চ সন্ধ্যার সময়ই আমরা হামলার কথা শুনতে পাচ্ছিলাম, সন্ধ্যা থেকেই গুজবটা ছিল। আমার মনে আছে সন্ধ্যা থেকেই আমাদের পাড়ায় আমাদের বয়সীদের মধ্যে কিংবা আমাদের সিনিয়রদের মধ্যে রাতের সম্ভাব্য হামলা নিয়ে উত্তেজনা ছিল। এবং আমাদের সিদ্ধান্ত, এই হামলা মোকাবেলা করতে হবে। সুতরাং প্রস্তুতি নিতে হবে। প্রস্তুতিতো শত্রু সম্পর্কে ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়। শত্রুপক্ষ কোন মাত্রায় আক্রমণ করবে সে সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না আমাদের।

আমাদের যারা সিনিয়র ভাই আছেন, যারা আমাদের গাইড করছেন, তারা বলছেন যে ব্যারিকেড করতে হবে, যার যা অস্ত্র আছে তা নিয়েই রেডি থাকতে হবে। মনে আছে সন্ধ্যা ৬/৭টার সময় আমাদের ব্যারিকেড করা শুরু হল। ব্যারিকেড মানে- আমাদের দৌড় আর কতদূর তখন? বাঁশ টাশ আমাদের যা আছে তার সঙ্গে ইট, পাইপ, রাস্তার মধ্যে জড়ো করে রাস্তার মধ্যে দাঁড় করানো হল। যে রাস্তায় আমরা ব্যারিকেড দিচ্ছিলাম, সেই রাস্তার নাম এখন শহীদ বাকী সড়ক। এই বাকী আমাদের পাড়ারই বড়ভাই, ১৯৭১ সালের শহীদ। তাঁর কথা আরেকটু পরে আমাকে বলতে হবে। এই রাস্তাটার ওপরেই আমরা ব্যারিকেড দিলাম। যে ব্যারিকেড, তা এখন বুঝি যে এটা কোন ব্যারিকেড হয়নি। সেই ব্যারিকেড দিলাম এবং বস্তা টস্তা যা আছে তা দিয়ে আমরা মনে করলাম যে, এটা দিয়েই আমাদের পাকিস্তানের আর্মি ঠেকাতে হবে, এবং তা পারবো।

দশটা সাড়ে দশটার মধ্যে আওয়াজ আসতে শুরু করল, নানারকম গুলির আওয়াজ। রাতে যদি এ্যাটাক হয় কে কী করবে সে নিয়েও আমাদের আগাম চিন্তা ও সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ছিল। কার কী ভূমিকা থাকবে সেটাও ঠিক করা ছিল। কেউ ছাদ থেকে ঢিল মারবে, কেউ গরম পানি ফেলবে, কেউ এদিক থেকে হুইসেল দেবে। আমার ও আমার বড় ভাইয়ের উপর প্রথম দায়িত্ব ছিল, আনসার হেড কোয়ার্টার থেকে যোগাড় করা ছোট সাইরেন মেশিন দিয়ে ঘুরে ঘুরে সবাইকে জানাতে হবে যে আক্রমণ শুরু হয়েছে। সাড়ে ১০টা ১১টার পরে যখন গোলাগুলি বেড়ে গেল তখন বোঝাই যাচ্ছিল সামরিক বাহিনী আক্রমণ করছে। কাজেই সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাইরেন মেশিন নিয়ে আমরা দুজনে বের হলাম সবাইকে জানানোর জন্য যে, আক্রমণ শুরু হয়েছে।

আসলে সাইরেন দেওয়াটা অর্থহীন ছিল, কারণ ততক্ষণে প্রচন্ড আওয়াজ শুরু হয়েছে। সাইরেন দিয়ে কাউকে জানানোর দরকার ছিল না যে, আক্রমণ হচ্ছে। এই মাত্রার আক্রমণ আসলে আমাদের হিসাবের মধ্যে ছিল না। কিছুক্ষণ সাইরেন দেওয়ার পর আমরা বুঝলাম আমাদের যেদিকে অগ্রসর হওয়া দরকার সেদিকে আমরা আর অগ্রসর হতে পারছি না। ফিরে আসার চেষ্টা করছি, ফিরেও আসা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছিল, পাশেই যেন ভয়ংকর মাত্রায় গুলি হচ্ছে বা বোমা ফুটছে। আমরা কেউই জীবনে কোনদিন এরকম আওয়াজ শুনি নাই। রাস্তার মধ্যেই আমরা দেখলাম দেলোয়ার হোসেন পারভেজ, ছাত্রনেতা, মারা গিয়েছিলেন স্বাধীনতার পরে, অন্ধকারে ফেরত আসছেন, তাঁর হাতে একটা রাইফেল । তিনি রাইফেল নিয়ে যাচ্ছিলেন প্রতিরোধ করবার চেষ্টায়। এসবই অসম্ভব একটা ব্যাপার, তবুও এসব চিন্তা ও চেষ্টার গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়, এগুলোই পুরো দেশকে লড়াইএ দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত করেছিল।

দেয়াল টপকে, বিভিন্ন বাড়ীর ভেতর দিয়ে ঘরে ফিরলাম। আতঙ্কিত সবাই। অস্থির হয়ে বাসার সামনে নানা হাঁটছেন। বাসার একমাত্র মুরুব্বী। ২৫ মার্চ সেইরাতে ঢাকা শহরে কেউ ঘুমাতে পারেনি। সবার মতো আমরাও একটা ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে সেইরাত পার করলাম। ২৬ মার্চও তাই, দিবারাত্রি কারফিউ চলছিল। ২৭ মার্চ সকাল বেলা যখন কারফিউ একটু শিথিল হচ্ছে সেই সময় আমরা দেখলাম ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ ঢাকার বাইরের দিকে যাচ্ছে। শুনলাম রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পিলখানা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন বস্তি এইসব স্থানে গণহত্যা হয়েছে। সেইদিন ২৭ মার্চ একটা সময়ে, আমরা রাস্তায় দেখছি মানুষ যাচ্ছে স্রোতের মত, তখনই মানুষ জনের মুখে শুনলাম যে, খবর আসছে আর কোন অসুবিধা নাই বাঙালী আর্মিরাও মুক্তিযুদ্ধে জয়েন করছে। কাজেই এখন যুদ্ধ শুরু হয়েছে। তারা আর কয়দিনের মধ্যেই ঢাকা শহর চারিদিক থেকে

আক্রমণ করবে। আর কয়েক দিন আমাদের ধৈর্য্য ধরে রাখতে হবে। পরে বুঝেছি এর উৎস রেডিওতে মেজর জিয়ার ভাষণ।

ঢাকা থেকে বাইরেঃ মানুষের স্রোত

সেই সময়ে ঢাকা শহরে থাকার মত অবস্থা ছিলনা। আমাদের অবস্থা ছিল আরও সঙ্গীন। আমাদের বাসায় তখন আমরা ৭ ভাইবোন এবং নানা। সবার বড় বোন, ওর বয়স ১৭, ভাই ১৬। এরপর আমি, সবার ছোট বোনের বয়স ৪। তিন বছর আগে আমাদের মা মারা গেছেন। আব্বা তখন গ্রামের বাড়ী গেছেন কাজে। নানা সেকারণে আমাদের সঙ্গে। কঠিন অবস্থা। খাবার টাকা কিছুই নেই। পাড়ার একজন মুরুব্বীর কাছ থেকে কিছু ধারকর্জ করার চেষ্টা হল, পাওয়া গেল না। সামনে পুরোটাই অনিশ্চিত। কয়েকদিনের মধ্যেই আরও অনেকের মত আমরাও ঢাকা শহর ত্যাগ করলাম। প্রথম দফায় আমরা শহরের প্রান্তে একটা স্কুলে গিয়ে থাকলাম, আমাদের এলাকার পিছনে। স্কুলের মেঝে, বেঞ্চিতেই দল বেঁধে থাকার ব্যবস্থা। গণখাওয়া। কিন্তু একটু রাত হতেই সেখানেও শুনলাম গোলাগুলির আওয়াজ, শুনলাম আশে পাশে হামলার সম্ভাবনা। দুদিন পর আবার সেই জায়গা থেকে ফেরত আসলাম। আবার রওনা হলাম সম্ভবত ৩১ মার্চ বা এপ্রিলের ১ তারিখে। চারিদিকে পরিস্থিতি তখন ক্রমেই আরও বিপজ্জনক হচ্ছে। এবার দীর্ঘ যাত্রার প্রস্তুতি নিয়ে বেশ কয়েকটি পরিবার প্রায় ১৫/২০ মাইল পায়ে হেঁটে কালিগঞ্জ এলাকায় গিয়ে থাকলাম একরাত। মনে আছে আশ্রয় পেলাম কাজীবাড়ীতে। রাতে খেলাম লাউসহ ডাল ভাত। সারাদিন না খাওয়া হাঁটার পর খুবই ভালো লেগেছিল সেই খাওয়া।

আমাদের মধ্যে যারা বড় তাঁরা সামনের যাত্রা পরিকল্পনা করলেন, ছোটাছুটি করে ঠিকঠাক করলেন। পরদিন সকালে কাজীবাড়ী থেকে হেঁটে ঘাটে গেলাম, সেখান থেকে বড় দুটো নৌকায় রওনা হলাম ময়মনসিংহের উদ্দেশ্যে। তখন তো মেশিন নৌকা ছিল না। গুণ টেনে, পাল দিয়ে নৌকা যাচ্ছে। আমরা কয়েকটি পরিবার, সবমিলিয়ে ২০ জনের মতো। নারী পুরুষ শিশু বৃদ্ধ সবাই। বড়রা যাদের কাছে পরিস্থিতির ভয়াবহতা জানা, তাদের নিশ্চয়ই এই অনিশ্চিত অজানা পথে যাত্রায় অনেক উদ্বেগ আতঙ্ক ছিল। অনেককিছু ভীতিকর খবর তাঁরা আমাদের কাছ থেকে আড়াল করেছেন। নৌকার মধ্যেই রান্নাবান্না। সবজি ডাল ভাত। এটাই চলছে। মাঝে মধ্যে বাজারে বা লোকালয়ে বিরতি, কেনাকাটা। নৌকায় থাকলাম প্রায় ৭দিন। সেই দিনগুলোর অভিজ্ঞতা কোনভাবেই ভুলবার নয়।

পথে পথে নানারকম কখনো পরস্পর বিরোধী অভিজ্ঞতা হয়েছে। মাঝে মাঝে কোন কোন নৌকা আগেই দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে, কখনো পার হচ্ছে স্পীড বোট।

যে কোন সময় আসতে পারে আর্মি। আমরা যে পাশ দিয়ে যাচ্ছি সেখানে তীর বা লোকালয়ের কাছে থেকেই মানুষ ছুটে এসে জিজ্ঞেস করছেন, 'ঢাকার খবর কী?' কোথাও কোথাও আমরা কিছু কেনা কাটা করি। কোথাও কোথাও গ্রামের লোকজন ছুটে এসে বলছেন, 'এখানে একটু দাঁড়ান।' কিছুক্ষণ পরই তাঁরা আলু বেগুন চাল চিড়া গুড় এগুলো এনে দিচ্ছেন। বলছেন, 'আপনারা এগুলা নিয়া যান, আপনাদের খাওয়া দাওয়া হয় নাই।'

একদিক থেকে আর্মির হামলা কিংবা হামলার সার্বক্ষণিক আতংক, অন্যদিকে জনগণের সমর্থন এই দুটোর মধ্যে দিয়েই কিন্তু ঢাকা শহরের মানুষজন ঢাকা শহরের বাইরে বের হয়েছেন তখন। যাবার পথে মানুষের এই সমর্থন ও সংহতির কারণেই এতটা অনিশ্চয়তার মধ্যেও চলতে পারলাম। ময়মনসিংহ শহরে আমরা পৌঁছাই ৬ দিন পরে। মাঝখানে এক সন্ধ্যায় প্রচন্ড ঝড়ের মধ্যে পড়লাম। সেদিনও অনেক বড় বিপর্যয় ঘটতে পারতো। কিনারে দুর্বল গাছের আড়ালে দড়ি দিয়ে বেঁধে মাঝি কীভাবে আমাদের নৌকা বাঁচালেন তা এখনও আমার মনে বিস্ময়। প্রবল ঝড়ের উপর্যুপরি ধাক্কায় উড়ে যেতে যেতেও আমরা বেঁচে গেলাম। নৌকার ছই টেনে ধরে রেখেছিলাম আমরা অনেকেই। আর দোয়া দরূদ তো হচ্ছিলই। অনেক দুর্যোগ পার হয়ে আমরা ময়মনসিংহ শহরে যখন পৌঁছালাম তখন পর্যন্ত পাক আর্মি ময়মনসিংহ শহরে পৌঁছায়নি। এটা হবে ৭ বা ৮ এপ্রিল। ময়মনসিংহ তখনও মুক্ত এলাকা, কারণ পাকিস্তান আর্মি তখনও সেখানে পৌঁছায় নি। পাকবাহিনীর যে সমস্ত গ্রুপ তখনও সেখানে ছিল তারা তখন চাপের মুখে, তাদের কয়েকজন নিহত হয়েছে সরাসরি আক্রমণে। যেদিন ময়মনসিংহ শহর পার হলাম, তার পরের দিনই ময়মনসিংহ শহরের পতন হলো।

আমরা গেলাম জামালপুরের গ্রামের দিকে। কোন গাড়ী নেই। রিকশা নিতে হল। তার ভাড়ার টাকাও ধার করতে হলে সহযাত্রী 'মোটা নানী' বলে পরিচিত এক স্নেহময়ী প্রবীণ মহিলার কাছ থেকে। প্রায় সারাদিন রিকশায় করে অনেক রাতে নানাবাড়ীতে পৌঁছলাম। সেই গ্রামে যাওয়ার ১৫/২০ দিনের মাথায় আমরা দেখলাম, দিগন্ত জোড়া আগুন। পাকিস্তান আর্মি টাঙ্গাইল থেকে জামালপুরের দিকে দুইদিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে অগ্রসর হচ্ছে। একদিকে প্লেন থেকে বোমাবর্ষণ করা হচ্ছে, অন্যদিকে রাস্তা দিয়ে যাবার সময় দু-পাশে গুলি আর আগুন। তখনও শান্তি কমিটি বা রাজাকার বাহিনী প্রস্তুতি মূলক পর্যায়ে, সকল অঞ্চলে তখনও গঠিত হয় নাই। এবং মুক্তিবাহিনীও তখনও সব অঞ্চলে সংগঠিত হয় নাই। গ্রামে আমাদের প্রধান কাজ তখন 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' শোনা এবং তা প্রচার করা।

যুদ্ধের নানা স্রোত

এরমধ্যেই মুজিবনগর সরকার গঠিত হল। এর আগে আওয়ামী লীগের প্রধান নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন পথে ভারতে চলে গেছেন। শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেপ্তার হলেন ২৫শে মার্চ রাতেই। তা আমরা তখন যথারীতি বিশ্বাস করি নাই। আমরা বলেছি, বিশ্বাসও করেছি, পাকিস্তানিদের এটা একটা অপপ্রচার। এই বিশ্বাস নিয়ে আমরা পরবর্তী ১৫/২০দিন কিংবা একমাসের মত ছিলাম। জিয়াউর রহমানের ঘোষণা ২৭ শে মার্চের পর থেকে রেডিওতে নিয়মিত শোনা যাচ্ছিল। 'অন বিহাফ অব প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান' মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে তা বারবার প্রচার হচ্ছে তখন। আমরা বহুদিন এই বিশ্বাস নিয়েই ছিলাম যে, শেখ মুজিব ঠিকই কোথাও নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাঁর পক্ষে জিয়াউর রহমান ঘোষণা করেছেন। সরকার আছে সরকার যুদ্ধ পরিচালনা করছে, কোন অসুবিধা নাই। এক মাসের মাথায় আমরা নিশ্চিত বুঝলাম যে শেখ সাহেবের গ্রেপ্তার খবরই ঠিক। এই খবরে অন্য অনেকের মতো আমাদেরও উদ্বেগ তাঁর জন্য, মুক্তিযুদ্ধের পরিচালনা নিয়ে। আর কেউ তো সর্বজনস্বীকৃত নেতা হিসেবে দাঁড়াননি। যাইহোক, প্রবাসী সরকার গঠিত হল। নজরুল ইসলাম তাজউদ্দিন আহমদ এরা নেতৃত্বে আছেন।

অন্য দিকে দেশের মধ্যে যে প্রতিরোধ শুরু হয়েছে, দেশের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে যে সশস্ত্র লড়াই হচ্ছে সেগুলোর খবর টবরও আমরা পাচ্ছি বিভিন্নভাবে। অনেকেই নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করছেন প্রতিরোধের ঘাঁটি গড়ে তোলার। আলাদা আলাদা বাহিনী গঠনের খবরও পাওয়া যাচ্ছে। পাবনায় সশস্ত্র লড়াই প্রতিরোধ গড়ে উঠছে, টিপু বিশ্বাসের নেতৃত্বে বেশ কয়েকটি বড় আক্রমণ পরিচালিত হয়েছে, বরিশালে পেয়ারা বাগানে সিরাজ শিকদার মুক্ত এলাকা গড়ে তুলছেন, কাদের সিদ্দিকী টাঙ্গাইলে মধুপুর এলাকায় ঘাঁটি তৈরি করার চেষ্টা করছেন, মান্নান ভূইয়া শিবপুরে বিশাল এলাকা নিয়ে মুক্ত এলাকা গড়ে তুলছেন। আর সীমান্তের ওপারে প্রবাসী সরকারের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে মুক্তিবাহিনী। সামরিক বাহিনী বাঙালী সদস্য, বিডিআর, পুলিশ এরা তখন আমাদের ভরসার প্রধান জায়গা। সশস্ত্র প্রশিক্ষণ থাকবার কারণে যুদ্ধে তাঁদের উপস্থিতি সবার কাছেই তখন খুব গুরুত্বপূর্ণ।

মুক্তিবাহিনীর কাজ বিন্যাসের জন্য ১১টা সেক্টরে পুরো দেশকে ভাগ করা হয়। ৩টা ফোর্সে মুক্তিবাহিনীকে বিন্যস্ত করা হয়। জেড ফোর্স, এস ফোর্স, কে ফোর্স এই ৩ ভাগে পুরো বাহিনীকে ভাগ করা হয়। এস ফোর্স সফিউল্লাহ, জেড ফোর্স জিয়াউর রহমান এবং কে ফোর্সে খালেদ মোশাররফ নেতৃত্বে ছিলেন। এরা সবাই মেজর রাঙ্কে তখন। মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর

সফিউল্লাহ। তিন জনের নেতৃত্বে ৩টা ফোর্স, তার অধীনে আবার বিভিন্ন সেক্টর। সেই সেক্টরে সেক্টর কমান্ডারদের অধীনে যুদ্ধ পরিচালনা করা হয়েছে। এভাবে ছক তৈরি করা হয়েছিল। আমরা তখন এভাবেই জেনেছি। এখন ক্রমে তথ্য প্রকাশিত হচ্ছে যে, এগুলোর পরিচালনায় অনেক জটিলতা তৈরি হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে আর একটা ধারা হচ্ছেন মওলানা ভাসানী। মওলানা ভাসানী টাঙ্গাইল থেকে সীমান্ত অতিক্রম করে গেছেন, তিনি আগেই শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি সমর্থন দিয়েছেন। মওলানা ভাসানীকে সভাপতি করে একটা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। অবশ্য এই উপদেষ্টা পরিষদ পরবর্তী কালে আর কোন কাজ করেনি।

'ব্যর্থ' যুদ্ধযাত্রা

মুক্তিযুদ্ধের সব খবরাখবরের জন্য স্বাধীন বেতার বাংলা কেন্দ্র ছিল আমাদের প্রধান উৎস। আমরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে যা কিছু প্রচারিত হচ্ছে তা বিশ্বাস করতে চাইতাম, বিশ্বাস করতাম। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের যে বক্তব্য বা খবর সবাই শুনছে, সারা দেশে তার মধ্যে দিয়ে একটা জনমত তৈরি হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার প্রেরণাও তৈরি হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে কীভাবে যোগদান করা যায় এই চিন্তা আমার মধ্যে ক্রমেই সক্রিয় হচ্ছিল। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ভাষ্য শুনতে শুনতে আমি ভাবছি যে, আমি কোনরকম ভাবে কোথাও হয়তো মাথাইল পরা কিংবা, ছদ্মবেশী কাউকে পেয়ে যাব, যে মুক্তিযুদ্ধের খবর দিতে পারবে। যার সাথে আমি মুক্তিযুদ্ধে যেতে পারব। রেডিও শুনি আর নানা কল্পনা করি।

কিন্তু এটা ঘটছে না, কারো সাথে দেখা হচ্ছে না। ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠছিলাম। ঐ অঞ্চলে কোন মুক্তিযোদ্ধা দেখতে পাচ্ছি না, কোন রাজাকারও নাই। এরমধ্যে কাছাকাছি কয়েকটি গ্রাম আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে পাকবাহিনী, আমার নানার বন্ধুকে গুলি করে হত্যা করেছে তারা। কিন্তু বড় কোন ধরনের অভিযান আশেপাশে হচ্ছে না, যার মধ্যে দিয়ে কোন মুক্তিযোদ্ধার সাথে যোগাযোগের সম্ভাবনা তৈরি হয়। সেরকম অবস্থায় নির্দিষ্ট মাস তারিখ আমার মনে নেই, হয়ত মে জুনের দিকে হবে। নিরুপায় হয়ে একজন ক্ষেতমজুর আমাদের খেলার সঙ্গী, সমবয়সী, বন্ধু তার সাথে খোলাখুলি আলাপ করলাম মুক্তিযুদ্ধে যাবার জন্য। দেখলাম ওরও আগ্রহ আছে।

ওর নাম কোবাদ, কয়দিন আগেও দেখা হয়েছিল। বেঁচে আছে এখনো, এবং স্বাধীনতার ৪০ বছর পর, এখনো খুব গরীব, ক্ষেতমজুর হিসেবে কাজ করে, সবসময় তাও পারে না। কোবাদ এবং আমি রওনা হলাম, কোথায় যাব আমরা জানি না। ম্যাপ নাই, সব পথঘাট ও আমাদের গন্তব্যের কোন দিকনির্দেশনাও নাই আমাদের কাছে। এমন কোন জানাবোঝা লোক জানা নাই যার সাথে আমরা কথা

বলতে পারি। ভারতের সীমান্তের দিকে যাওয়ার যে প্রধান সড়ক, জামালপুর-শেরপুর সেই পথেই আমরা রওনা হলাম। আমাদের সম্বল আমার পকেটের পাঁচ টাকা, কীভাবে সংগ্রহ করেছিলাম মনে নেই। ভোরে ঘুম থেকে উঠে রওনা হলাম খালি পায়ে লুঙ্গি পরে। এই পোশাকে হেঁটে যাচ্ছি, নানাবাড়ী বা গ্রামের কারও কোন সন্দেহ করবার কিছু নেই। যাত্রাপথে যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে আমি শহরের ছেলে, এটা বোঝানোর জন্যও এই পোশাক। এখন তো বুঝি, লুঙ্গি পরলেই যে একজনকে সবার কাছে গ্রামের ছেলে মনে হবে তা তো নয়। চশমা তখনও ছিল, চশমাটা পকেটে রাখলাম। প্রথমে হাঁটা, তারপর বাস, তারপর আবার অনির্দিষ্ট গন্তব্যে হাঁটা - সীমান্ত লক্ষ্য করে। একটা সম্ভাবনাই আমাদের সাহস যোগাচ্ছে, আমাদের বদ্ধমূল বিশ্বাস - বেশিদূর যেতে হবে না, পথেই দেখা হবে কোন ছদ্মবেশি মুক্তিযোদ্ধার সাথে। সময় যাচ্ছে, পথও পার হচ্ছে, কিন্তু কেউ এসে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছে না!

পথে পথে সেই সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বাধা। মুসলমান কিনা তার শারীরিক পরীক্ষা, জেরা। কোথাও হালকা কোথাও কড়া। জামালপুরে নদী পার হবার ঘাটে আমাদের লাইন ধরতে হল। আমরা মুসলমান কিনা, কলেমা জানি কিনা তার পরীক্ষা এখানেও। এখানেই ঝুঁকি ছিল বেশি। জবাবদিহি করে করে পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে পার হতে থাকলাম। কিছুটা বাসে জামালপুর পার হয়ে, তারপর শেরপুর হয়ে হেঁটে যেতে যেতে তখন সন্ধ্যা হয় হয়। ক্রমেই সীমান্ত কাছাকাছি আসছে। কোন কিছু চিনি না। সীমান্তের খুব কাছাকাছি শেরপুর পার হয়ে আরও সামনে বর্ডার এর কাছাকাছি কিন্তু এখন কী করে কী করা যাবে, পকেটে পয়সাও নাই যে বাসে উঠে আর কিছু দূর যাব। কী করবো এখন? সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে।

এর আগে দুপুরে কড়ারোদে হাঁটতে হাঁটতে মাঝখানে দুএকটা বাড়িতে খাতির জমানোর চেষ্টা করেছি, লোকজনের সাথে আলাপ জমানোর চেষ্টা করেছি। বলেছি আমরা একটু পানি খেতে চাই কিংবা একটু বসি। কিন্তু তাদের মধ্যে আমাদের প্রতি আগ্রহ বা সমবেদনার চাইতে বেশি ছিল আতংক এবং সংশয়। তাদের সবারই কথার সুর ছিল একইরকম, 'আপনারা এখানে থেকে চলে যান, যে কোন সময় বিপদ হইতে পারে।' আমাদের মাথায় স্বাভাবিক সময়ের গ্রামীণ সমাজের চর্চার চিত্রটিই গেঁথে ছিল। গ্রামের বাড়িতে যদি অপরিচিত কেউ যায়, যদি কেউ গিয়ে বলে যে পানি খেতে চাই, তাহলে পানির সাথে তারা আরো কিছু দেয়। যদি দূর পথের লোক হয়, তাহলে হয়তো বলবেন, 'আজকের মত রাতটা এখানেই থাকেন'। কোথাও না কোথাও এধরনের আহবান বা একটা আমন্ত্রণ পাব এটাও একটা প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু তার কোন লক্ষণ পেলাম না কোথাও।

যখন সন্ধ্যা নেমে যাচ্ছে তখন রাস্তার ধারে নেমে গিয়ে একটা ছোট মত বাড়ি দেখে সেদিকে গেলাম। একটা লোক বেড়া ঠিক করা এই ধরনের কোন কাজ করছিলেন। সেই লোককে গিয়ে বললাম যে আমাদের একটু পানি খাওয়ানো যাবে? অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা কোথা থেকে আসছেন'? 'জামালপুর থেকে, মামাবাড়ি যাব' বললাম। মামা বাড়ি কোথায় বলবো তা তো জানি না, এই এলাকার কোন কিছু চিনি না, কারও সাথে এই এলাকা নিয়ে কোন কথাও হয়নি কখনো। তখন লোকটি বললেন, 'আপনেরা বসেন আমি পানি আনতেছি', বসলাম। পানি আনতে ধরেন দুই তিন মিনিট লাগার কথা; পাঁচ মিনিট দশ মিনিট গেল আধা ঘন্টা গেল নাই। বাড়ির দিক থেকে আর কেউ আসলোই না। শব্দ শোরগোল শুনে উল্টো দিকে তাকিয়ে দেখি, রাস্তার সামনের দিক থেকে ১৫/২০ জনের মত লোক আসছে হাতে লাঠিসোটা। এসে তারা আমাদের ঘেরাও করে বসল। বুঝলাম আমরা রাজাকারদের হাতে এখন বন্দী।

ঐ অঞ্চলে ততোদিনে শান্তি কমিটি রাজাকার বাহিনী হয়েছে বুঝলাম। সবাই রাজাকার বাহিনীর বেশ ষন্ডাপান্ডা সদস্য । এরা সবাই ঘেরাও করে বসলো, পানি টানি আর আসলো না, উল্টো আমাদের প্রথম একদফা মারপিট করলো। তার পর জেরা জেরাতে আমরা সহজেই ধরা পড়লাম। পরিচয় জিজ্ঞেস করলো। বললো, পাকিস্তানে এই ধরনের কুলাঙ্গার না থাকলে পাকিস্তানের কিছু আসে যায় না। এই ধরনের ইন্ডিয়ান দালাল বা ইন্ডিয়ান চর পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় শত্রু। এরা না থাকলে পাকিস্তানের কিছু আসে যায় না। বারবার জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় যাবি বল', 'কোথায় যাবি বল'। আমি বললাম, যা বলে আসছি সারাপথ, 'মামা বাড়ি যাব।' 'কোথায় তোর মামাবাড়ী?' উত্তর আমার জানা নাই। এলাকার কোন গ্রামের নাম জানা থাকলে হত। উপায়ান্তর না পেয়ে মামা বাড়ি বলে আমি যে দিক নির্দেশ করলাম এবং যে দুরত্ব বললাম সম্ভবত আধামাইল, তাতে তা নাকি ভারতের সীমান্ত পার হয়ে যায়। 'তোরা মামা বাড়ি যাবি', 'তোদের মামা বাড়িই পাঠানো হবে' বলে আরোও কিছু মারপিট হলো। আমার হাতে কনুইতে একটু দাগটাগ আছে। ঐগুলি দেখলো নানাভাবে। ততক্ষণে শরীর সার্চ করতে গিয়ে পকেটের মধ্যে রাখা চশমাটাই পাওয়া গেল।

তাদের ততক্ষণে দৃঢ়বিশ্বাস যে, আমরা ট্রেণিং নিয়ে আসছি, এখানে আমাদের আসা কোন অপারেশন চালানোর জন্য কিংবা মুক্তিবাহিনীর জন্য কোন খবর টবর দিতে। তাদের নির্দেশ হলো এখানে ঘরে আটকে রাখার। যে বাড়িতে আমরা গিয়েছিলাম, সেই বাড়িরই একটি ঘর বন্দিশালা হিসাবে নির্দিষ্ট হল। ছোট্ট ঘর। একটা চৌকির পরে আর তেমন জায়গা নেই। দাঁড়ানোর একটু জায়গা শুধু। আটকানোর পরে ওই রাত গেল পরদিন গেল তারা আমাদের নিয়ে কী করবে এসব

চিন্তা চলছে, বুঝতে পারছি। এরমধ্যে একবেলা ভাত এল, কাঠালের বিচি ভর্তা দিয়ে। রাজাকার যারা তাদের আবার গুডউইল তৈরির জন্য মুক্তিযোদ্ধা ধরার ব্যাপার আছে। মুক্তিযোদ্ধা ধরে তারা যদি আর্মির কাছে দিতে পারে তাদের একটা গুরুত্ব তৈরি হয়।

দ্বিতীয় দিন রাত্রে তখন ঘোরের মধ্যে আছি, খাওয়া দাওয়া নাই। ভবিষ্যৎ কী সেটাও সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, গভীর রাতে একটি বড় ধরনের বিস্ফোরণের শব্দে তন্দ্রার মধ্যে থেকে চমকে উঠলাম। মুক্তিযোদ্ধাদের বড় একটা অপারেশন হয়েছিল, ব্রিজ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সেসময়, পরে শুনেছি। কিছুক্ষণের মধ্যে পরপর অনেক লোকজন ছুটে এসে ঘরের সামনে জটলা। কেউ কেউ হারিকেন উঁচিয়ে আমাদের আবার দেখে নিল। বেড়ার ছোট্ট ঘর। দরজার সামনেই তাদের জটলা। তাদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে, সব বোঝা যাচ্ছে না। আমার কোন চেষ্টাও নেই বোঝার। মুক্তিযোদ্ধাদের এরকম একটি বড় অপারেশনের পর ধরার মতো হাতের কাছে দুজন থাকায় তাদের জন্য খুবই সুবিধা হল। অপারেশন এর পরে তো পাকিস্তানি আর্মি চাইবে রাজাকাররা মুক্তিযোদ্ধা ধরুক। এখন তাদের কাছে দুজন আছে। দুজনকে সকালবেলা দিয়ে দিলেই তো হয়ে যায়, তাদের স্বার্থ উদ্ধার হয়। তারাও নিশ্চিত যে আমরা মুক্তিবাহিনীর সাথে যুক্ত। যতটুকু শুনলাম তাতে পরিস্কার বোঝা গেল যে, তারা সকাল বেলা আমাদেরকে আর্মি ক্যাম্পে দিয়ে দেবে। এই সিদ্ধান্ত শুনলাম। কিন্তু আঁতকে উঠা, আতঙ্কিত হওয়া, অস্থির হওয়া এরকম কোন প্রতিক্রিয়া হলনা। বোধহয় একটা পর্যায়ে আসে যখন মানুষের কোন বোধশক্তি থাকে না। সারা পৃথিবীর বহু দেশে এরকম অনেকের গল্প আছে, আরও অনেক কাহিনী আছে। একটা পর্যায়ে যাওয়ার পর মৃত্যুমুখে পড়লেও কোন বোধ কাজ করে না।

সৈয়দ শামসুল হকের একটা গল্প আছে। গল্পের নাম মনে নাই, কিন্তু কাহিনীটা ভোলার উপায় নাই। একজনের নাম নজরুল ইসলাম, 'মুক্তি' সন্দেহে পাকিস্তান আর্মি তাকে ধরলো। ধরার পরে তাকে অত্যাচার করছে। জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার নাম কী'? উত্তরে বললো, 'আমার নাম নজরুল ইসলাম'। আর্মি অফিসার 'শিক্ষিত' লোক, জানা আছে কাজী নজরুল ইসলাম নামে একজন কবি আছে, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। বলল, 'ও তুমি সেই কবি কাজী নজরুল ইসলাম, যে বিদ্রোহী কবিতা লিখেছে আল্লাহর বিরুদ্ধে।' উত্তর- 'না, আমি তো কাজী নজরুল ইসলাম না, আমি নজরুল ইসলাম।' পাকসেনা বিশ্বাস করে না, আবার অত্যাচার করে। নানারকম নির্যাতনের এক পর্যায়ে এমন অবস্থা হল যে, নজরুল ইসলামের কোন বোধশক্তি আর অবশিষ্ট নাই। পাকসেনার কথা হল, 'তুমি বিদ্রোহী কবিতা লিখছো আল্লাহ বিরোধী, এখন পাকিস্তানের পক্ষে একটা কবিতা লিখ।' ৬০ দশকে আইয়ুব খানের শাসনামলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মোনেম খান নিয়ে

একটি গল্প প্রচলিত ছিল। সেসময় পাকিস্তানে রবীন্দ্রনাথের গান নিষিদ্ধ করা হলে চারদিক থেকে এর প্রতিবাদ শুরু হয়। মোনেম খান বিরক্ত হয়ে পাকিস্তান পন্থী লেখকদের উদ্দেশ্য করে বলেন যে, 'আপনারা এতকিছু লেখেন, রবীন্দ্রনাথের গান, রবীন্দ্রনাথের কবিতা এসব লিখতে পারেন না?'

এরকমই অবস্থা। 'কাজী নজরুল ইসলামকে' এখন পাকিস্তানের পক্ষে একটি কবিতা লিখতেই হবে। অত্যাচারে, নির্যাতনে তার মধ্যে যখন আর স্বাভাবিক বোধশক্তি কাজ করছে না, তখন এক পর্যায়ে নজরুল ইসলাম নিজেই বিশ্বাস করতে শুরু করল যে, সে কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুল ইসলাম এখন কাজী নজরুল ইসলাম হিসাবে উত্তর দিচ্ছে। শরীরের ক্ষতবিক্ষত অবস্থা নিয়ে, এক অজানা জগতের মধ্যে গিয়ে নজরুল ইসলাম কাজী নজরুল ইসলাম হিসাবে বলছে, 'না আমি লিখবোনা। আমি বিদ্রোহী কবিতা লিখেছি ওইটাই আমার কবিতা। আমি তোমার পাকিস্তানের পক্ষে কোন কবিতা লিখতে পারি না, আমি লিখবো না।' সে তখন সম্পূর্ণ নতুন মানুষ। আসলে একটা পর্যায়ে মৃত্যুর ভয় বা যাতনা ওই সমস্ত জিনিষগুলি কাজ করেনা। আত্মমর্যাদা বোধ মৃত্যুভয় থেকে অনেক উপরে চলে যায়।

যাইহোক, তারা আমাদের নিয়ে যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল তাতে তো মৃত্যু অবধারিত ছিল। কিন্তু তখন আমারও মৃত্যু নিয়ে আতংকিত হবার মতো কোন বোধশক্তি ছিল না। যেন এটাই হবার কথা। এখন শুধু অপেক্ষা। কিন্তু এই সময়েই একটা অভাবিত ঘটনা ঘটলো। যুদ্ধের মধ্যে এই ধরনের ঘটনা ঘটে বলে, ভয়ংকর শত্রু বাহিনীর মধ্যে এরকম ভাঙন আসে বলেই মানুষের লড়াইয়ে নতুন নতুন মাত্রা তৈরি হয়। এরকম অনেক সমর্থনের হাত এগিয়ে আসে বলে যুদ্ধের মধ্যেই জনগনের পক্ষে শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। সেরকম একটি ঘটনাই আমার জীবনে ঘটলো, যে কারণে আজ এখানে কথা বলতে পারছি।

আমাদের আর্মি ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হবে ফজরের নামাজের পরে। কিন্তু আযান হওয়ার ঠিক পর পর, তখনও অন্ধকার, ওই বাড়ির মালিক দরিদ্র হাজী সাহেব যার কাছে আমরা পানি চেয়েছিলাম এবং তার স্ত্রী ঘরে এলেন। আমার ধারণা এই ঘটনায় তাঁর স্ত্রীর ভূমিকাই ছিল মুখ্য। কারণ ঐ মহিলা এরমধ্যে একবার উদ্বিগ্নমুখে ঘরে এসে তিরস্কার করেছিলেন, যাকিছূ বলেছিলেন তার সারকথা এরকম, 'এত কম বয়স তোমাদের, কেন তোমরা এইসব করতে গেছো? তোমাদের মায়েরা না জানি কত কান্নাকাটি করছে।' তিনি তখন মা, অন্যকিছু তাঁর বিবেচনায় তুচ্ছ। আমার মার কথা তখন মনে হয়েছিল, কয়েকবছর আগেই তিনি মারা গেছেন, তা নিয়ে আর কথা বলা হয়নি, বেঁচে থাকলে আমি দুর্বল হয়ে পড়তাম কিনা বলতে পারি না।

তো সেই মা মহিলা ফজরের নামাজের আগেই হাজী সাহেবসহ আমাদের আটকে রাখা ঘরে এলেন। আমাদের ঘর থেকে বের হতে বললেন। বাড়ীর পিছনে নিয়ে গিয়ে একটি বিলের পাশ দিয়ে পথ দেখিয়ে আমাদের বললেন, 'এদিক দিয়ে তোমরা চলে যাও, যদি এই এলাকায় তোমাদের আর দেখি তাহলে আর রক্ষা করতে পারবো না। এই এলাকায় যদি তোমাদের আবার দেখা যায় তাহলে তোমাদের বাঁচানোর ক্ষমতা আমাদের নাই।' তখন মাত্র ভোর হচ্ছে। আমাদের এভাবে বের করে দিয়ে আমি জানি না তাদের জন্য কী ঝুঁকি তৈরি হয়েছিল। নিশ্চয়ই খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হয়েছিল এটা। তাদেরকে নিশ্চয়ই জবাবদিহি করতে হয়েছে। আমরা তো তাদের জন্য বড় ধরনের সম্পদ ছিলাম। হাঁটতে থাকলাম। বিল, ধানক্ষেত ইত্যাদি অনেকদূর হেঁটে রাস্তায় উঠলাম। ফেরার সময়ও মনে আগের আকাঙ্খা নিয়েই হেঁটেছি। মনে হয়েছে পকেটে টাকা থাকলে বাসে উঠে ঐ জায়গাটা পার হয়ে গেলেই তো হলো। জামালপুর গিয়ে কোন আত্নীয় বাড়ী গিয়ে টাকা সংগ্রহ করবো এরকম একটা চিন্তাও মাথায় ছিল। না খেয়ে সেই ভোর থেকে হেঁটে দুপুরের পর যখন জামালপুর শহরে ঢুকেছি, তখন হঠাৎ কোথা থেকে এসে আমার হাত সজোরে যিনি আঁকড়ে ধরলেন তিনি আমার নানা। আমাদের খুঁজতে খুঁজতে শহরে এসেছেন।

এধরনের অনেক ঘটনা আছে ১৯৭১ সালে। রাজাকার শান্তি কমিটি তো বটেই, পাকিস্তান আর্মির মধ্যেও পাঞ্জাব, বেলুচপ্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশের সেনাসদস্যদের ভূমিকা একইরকম ছিল না। আফসান চৌধুরী স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র নিয়ে কাজ করতে গিয়ে এরকম অনেক তথ্য পেয়েছিলেন। সেনাবাহিনীকে মানুষ হত্যায় উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে বলা হয়েছিল, এখানে সব কাফের, ভারতের চর, ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংস করবার জন্য কাফেররা যুদ্ধ করছে, তাদের মারতে হবে। কিন্তু যখন তারা 'কাফেরদের' মারতে যাচ্ছে তখন দেখছে এরা অনেকেই নামাজ পড়ে, কোরান তেলাওয়াত করে এবং মরার আগে কলেমা পড়ে। এসব দেখে অনেক সেনাসদস্য তার নিজের বাহিনীর ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন করে, কেউ কেউ যন্ত্রণাদগ্ধ হয়। অবশ্য বর্বর হত্যা ও নির্যাতন ঠিকই অব্যাহত থাকে।

ততদিনে বাংলাদেশের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বাহিনী তৈরি হয়েছে- রাজাকার বাহিনী আলবদর বাহিনী। জামায়াতী ইসলাম সরাসরি এগুলো সংগঠিত করায় নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করছে। গোলাম আজম আর টিক্কা খানের মধ্যে মিটিংএর খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। ব্যর্থ যুদ্ধযাত্রা থেকে ফেরত আসবার পর গ্রামে আমার অবস্থান নিয়ে আর ভরসা করতে পারছিলেন না আমার আত্নীয় স্বজনেরা। আমার বাবা তাই গ্রাম থেকে আমাকে ঢাকায় নিয়ে আসলেন। ছোটভাইসহ যখন ঢাকা শহরে আসি তখন পুরো পথই শত্রুর দখলে। পথে পথে বাস থেকে নামতে হল, লাইন ধরে সবাইকে দাঁড় করিয়ে পরীক্ষা জেরা চললো। কাউকে কাউকে

আলাদা করে রেখে অন্যদের ছাড়া হল। কোন পর্যায়েই নিশ্চিন্ত বা নিরাপদ বোধ করা যায় না। একটার পর আরেকটা। এমনকি বাসায় পৌঁছেও না।

ভারতের সহযোগিতা

আন্তর্জাতিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ বিপক্ষ অবস্থান ততদিনে আরও স্পষ্ট রূপ নিয়েছে। ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে প্রথম থেকে অবস্থান নিলেও রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ডিসেম্বরে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই অঞ্চলকে 'পূর্ব পাকিস্তান' বলেই অভিহিত করেছে। এই মাসে ২৫ বছর ব্যাপী ভারত সোভিয়েত চুক্তির পরই সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। এতদিন সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সম্পর্কিত দলগুলো খুবই অসুবিধার মধ্যে ছিল, কারণ তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন দীর্ঘদিন পর্যন্ত পাচ্ছিল না। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে বিরোধিতার সূত্রে চীন পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে। তারা সামরিক অভিযান বন্ধে ইয়াহিয়া খানকে অনুরোধ করলেও তার জন্য কোন সক্রিয় ভূমিকা নেয়নি, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে কোন অবস্থান গ্রহণ করেনি। বরং পাকিস্তান তার সামরিক অভিযানে অনেকখানি নির্ভর করেছে চীনের উপর। যুক্তরাষ্ট্র ছিল সবদিক থেকে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের উপর ভরসা করেই পাকিস্তান তার অপারেশন চালাচ্ছিল। ভারত যদি পাকিস্তান আক্রমণ করে তাহলে চীন তাকে সহযোগিতা করবে এটাই ছিল পাকিস্তান সরকারের প্রত্যাশা।

এখানে আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল নকশালবাড়ীর আন্দোলন, এর নেতা চারু মজুমদার তখন ভারতের শাসক শ্রেণীর জন্য একটা আতঙ্ক। নকশালবাড়ীর আন্দোলন দমন করতে গিয়ে ১৯৭০-১ সালে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার ভয়াবহ দমননীতির আশ্রয় নিয়েছিল। জেলজুলুম তো ছিলই বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম ইত্যাদি ভয়ংকর মাত্রা নিয়েছিল। কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গ তখন যুদ্ধক্ষেত্র, ভারতের সরকার বনাম জনপ্রিয় সশস্ত্র অভ্যুত্থান। সুতরাং আরেকটি বাঙালীপ্রধান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ইন্দিরা গান্ধী ও ভারতীয় শাসকদের জন্য খুব ভাল একটা অবলম্বন ছিল। আবার যারা নকশালবাড়ী আন্দোলন করছিলেন তাদের জন্য মুক্তিযুদ্ধের তৎপরতা অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যে কারণে এরপ্রতি তাদের বৈরীতাও তৈরি হয়েছিল। এই বিষয়ে খুব আলোচনা বা লেখালেখি এখনও হয়নি।

ভারত সম্পর্কে অনেক সময় বলা হয় যে, ভারত হচ্ছে বন্ধু রাষ্ট্র, তারা মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, সুতরাং তারা কখনও বাংলাদেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে পারে না। কোন রাষ্ট্রের বন্ধুত্ব বা কোন রাষ্ট্রের শত্রুতা কোন ভাবেই ব্যক্তি মহানুভবতা বা ব্যক্তি বিদ্বেষের বিষয় নয়। ব্যক্তি

ব্যক্তির প্রতি মহানুভব হতে পারে, ব্যক্তি উদার হতে পারে, ব্যক্তি বিদ্বেষমূলক অবস্থান নিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের ভূমিকা শেষ বিচারে নৈর্ব্যক্তিক। রাষ্ট্র হচ্ছে একটা নৈর্ব্যক্তিক প্রতিষ্ঠান, যা বিভিন্ন নীতি ও চুক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়, পরিচালিত হয় নির্দিষ্ট শ্রেণী ও গোষ্ঠীর প্রভাবের মধ্য দিয়ে। সুতরাং মহানুভবতার কারণে একটি রাষ্ট্র আরেকটি দেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থন করে না। একটি রাষ্ট্র চলে তার শাসক শ্রেণীর হিসাব নিকাশ অনুযায়ী, তার স্বার্থ সর্বোচ্চকরণের জটিল গণিত অনুযায়ী। আজকের দিনে ভারতের সাথে কোন জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তির প্রসঙ্গে কেউ যদি বলে ভারত আমাদের সহযোগিতা করেছিল ১৯৭১ সালে, সুতরাং ভারতের বিরুদ্ধে কথা বলা ঠিক নয়, তাহলে তা হবে ১৯৭১ নিয়ে জনগণের সাথে ব্ল্যাকমেলিং করবার শামিল। রাষ্ট্র সম্পর্কে আমাদের যদি ধারণা থাকে তাহলে এরকম যুক্তিদ্বারা আমরা কখনো প্রতারিত হব না।

সেই সময় বাংলাদেশ থেকে প্রায় ১ কোটির মত শরণার্থী ভারতে গেছেন পশ্চিমবঙ্গ শুধু না - আসাম, মেঘালয় ত্রিপুরায়। বাংলাদেশ থেকে যারা গেছেন তাদের প্রতি এসব অঞ্চলের মানুষের ব্যাপক সমর্থন সহানুভূতি সহযোগিতা আমরা পেয়েছি শুরু থেকেই। ভারতের মানুষ সহযোগিতা করেছেন প্রাণ থেকে, আর ভারত রাষ্ট্রের দিক থেকে হিসাব নিকাশ হচ্ছে তার রাষ্ট্রীয় স্বার্থ বিচার করে ভূমিকা গ্রহণ।

চীনের সাথে ভারতের বিবাদ ১৯৬২ থেকেই। যদি পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ হয় তাহলে চীন পাকিস্তানের পক্ষে সক্রিয় সমর্থন দিতে পারে, এই সম্ভাবনা মাথায় রেখেই ভারত যুদ্ধের সময় ঠিক করেছে। সেজন্য ভারতের বিবেচনায় একমাত্র এমন একটা সময় যুদ্ধে জড়ানো যাবে যখন চীন আসার পথ দুর্গম থাকবে। যে সীমান্ত দিয়ে চীন প্রবেশ করবার কথা, সেখানে শীতকালে বরফ পড়ে সুতরাং সেসময় সেইখান দিয়ে চীন অতিক্রম করতে পারবে না। সুতরাং যুদ্ধে জড়ানোর জন্য সেই সময়টাই যথার্থ। ডিসেম্বরই ছিল সেই সময়। তার আগেও নয়, খুব পরেও নয়।

যুদ্ধের নানা ফ্রন্ট: ঢাকার গেরিলা তৎপরতা

মে মাসের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যেও অনেক বিকাশ ঘটেছে, অনেক পরিবর্তন হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার এর নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী কাজ করছে, সামরিক বাহিনী ও বেসামরিক লোকজনদের সম্মিলিত যুদ্ধ। এর বাইরেও অনেক উদ্যোগ চলছে। অন্যদিকে মুজিব বাহিনী করা হয়েছে। সেই মুজিব বাহিনীর উপর প্রবাসী সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নাই, এদের নিয়ন্ত্রণ সরাসরি ইন্ডিয়ান আর্মি বিশেষত তাদের গোয়েন্দা সংস্থা র'এর হাতে। এই সংস্থার

দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা আবার সিআইএর সাথে যুক্ত বলে ওয়াকিফহাল ব্যক্তিরা জানান। *মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর* বইয়ে এসম্পর্কে আরও বিবরণ পাওয়া যায়। এই বাহিনী শুধু যে প্রবাসী সরকারের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেছে তাই নয়, তার প্রভাব নষ্ট করে নিজেদের আধিপত্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। তা সত্ত্বেও তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনীর কার্যক্রম বিস্তৃতির চেষ্টা যে অব্যাহত ছিল তা আমরা দেশের ভেতরেই বুঝতে পারছিলাম।

অন্য দিকে দেশীয় বিভিন্ন বাহিনীর কার্যক্রম আরও ছড়িয়েছে। যেমন কাদের সিদ্দিকীর বড় বড় অপারেশনের কথা শুনছি তখন। গ্রামে থাকতে আরও বেশি শুনেছি। মধুপুর জুড়ে তাঁর বাহিনী ও প্রতিরোধ তখন অনেক গল্প। তাঁর নাম তখন বাঘা সিদ্দিকী। সেই গল্প শোনা কাদের সিদ্দিকীর সাথে তাঁর পরবর্তী পরিণতি মেলানো যায় না। এইকথা অনেক মুক্তিযোদ্ধার ক্ষেত্রেই সত্য, কিন্তু এসব পরিণতি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এটা দেখায় যে, যুদ্ধের সাথে মুক্তিযুদ্ধের রাজনীতি মুক্তিযুদ্ধের দর্শন না থাকলে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মুক্তিযোদ্ধা পরবর্তী কালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী অর্থাৎ গণবিরোধী অবস্থানে চলে যেতে পারেন।

সেপ্টেম্বরের মধ্যে আরবান গেরিলা গ্রুপ ঢাকায় আসতে শুরু করে। জাহানারা ইমামের *৭১এর দিনগুলি* বইতে শহরের তরুণদের উদ্দীপ্ত ভূমিকার কথা আছে, আছে আরবান গেরিলা তাঁর নিজের ছেলে রুমির কথা, রুমির বন্ধুদের কথা। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে *বিচিত্রার* সম্পাদক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন শাহাদৎ চৌধুরী। তিনি সহ একটা বড় গ্রুপ ছিল যারা এসব গেরিলা অপারেশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিচিত্রায় লেখালেখিতে যুক্ত থাকার সময় এঁদের অনেকের সঙ্গে দেখা হয়েছে, বহুবার কথা হয়েছে। তাঁদের প্রধান অংশ ছিলেন ২নং সেক্টরে, তৎকালীন মেজর খালেদ মোশাররফের ভক্ত। কারণ এই সেক্টরে খালেদ তাঁদেরকে কাজের সুযোগ দিয়েছিলেন, যা অন্য অনেক সেক্টরে সম্ভব ছিল না। এই তরুণদের অনেকের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, তাঁরা ভিয়েতনামের গেরিলা যুদ্ধ অধ্যয়ন করেছেন। সেই যুদ্ধ তখন চলমান, তা তাঁদের প্রতিনিয়ত উৎসাহিত করছে। তাঁরা অধ্যয়ন করেছেন চীনের জনযুদ্ধ। এসবের উপর ভিত্তি করে তাঁরা নিজেদের দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধ দাঁড় করার চেষ্টা করছেন। এদের কাছ থেকে আরও শুনেছি যে যুদ্ধ পরিচালনা, সেক্টরে বিপ্লবী বইপত্র পড়াশোনা ইত্যাদি নিয়ে খালেদ মোশাররফের সাথে অনেকবার ভারতীয় অফিসারদের সংঘাত তৈরি হয়েছিল। খালেদ কখনও ভারতীয় অফিসারদের কাছে নত হননি। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ৬-৭ নভেম্বর এই খালেদ মোশাররফকেই হত্যা করা হয় 'প্রো-ইন্ডিয়ান' অপবাদ দিয়ে।

গেরিলারা যখন অপারেশন শুরু করেন সেপ্টেম্বরে অক্টোবরের দিকে, তখন আমি ঢাকায়। স্কুল থেকে বারবার নোটিশ আসছে গার্জিয়ানদের কাছে। সন্তান স্কুলে না গেলে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ রকম চিঠিপত্রের কারণে সে সময় একদিন দুইদিন স্কুলে যাই। সেই সময়ে আরবান গেরিলাদের মধ্যে যারা আমাদের পাড়ার পরিচিত বড়ভাই, তাদের সাথে দেখা হয়, কথা হয়। যত কথা বলতে চাই তত বলতে পারি না। তাঁরাও সতর্কভাবে চলাফেরা করেন। তাদের মধ্যে একজন শহীদ আবদুল্লা হেল বাকী। মনে আছে, হঠাৎ একদিন পাড়ার মধ্যে কারফিউ জারি করা হল। সারা পাড়ায় আতংক। পুরো পাড়ার মধ্যে কারফিউ জারি করে কয়েকটি বাড়ি ঘেরাও করা হল। আমাদের বাসার সামনের বাসায় শফিক নামে একজন ছিলেন এই গেরিলাদের সদস্য, তাঁর বাড়ি ঘেরাও করার ৫ মিনিট আগে বাড়ি ত্যাগ করেছিলেন বলে বেঁচে গেলেন। আমার সেই কিশোর বয়সে কিছু লেখালেখি ছিল। এছাড়া টেপ ছিল ৭ই মার্চের বক্তৃতা, গণসঙ্গীত, কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি। আর্মি অপারেশন যখন চলছে তখন সেগুলি আমার বড় যারা ছিলেন বিশেষত আমার বড় বোন তাড়াতাড়ি বাড়ির পেছনে নালার মধ্যে নষ্ট করে ফেলেন। আর্মি তখন বিভিন্ন বাড়িতে যাচ্ছে, তল্লাশি করছে।

তখন এই আরবান গেরিলাদের সাথে যোগাযোগ রাখতে চাই, তাঁদের সম্পর্কে কিছু কিছু আমরা শুনি, কিছু কিছু কাজ করি, দুএকটা চিঠি পত্র লেখা এ সমস্ত ইত্যাদি। সেই সময়ে শহীদ আবদুল্লাহ হেল বাকী ইউনিট কমান্ডার। ঢাকা শহরে তখন মাঝে মাঝে অপারেশন হচ্ছে। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (বর্তমান হোটেল শেরাটন) সেসময় খুবই কার্যকরী আলোড়ন সৃষ্টিকারী অপারেশন হয়েছিল। বিদেশী সাংবাদিকরা ছিলেন সেখানে, সুতরাং এখানকার অপারেশন ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। পাওয়ার ষ্টেশনে হামলা হল মনে হয় সেপ্টেম্বরেই। রমজান মাসে বাংলাদেশের মানুষ অনেক বেশী রোজা রেখেছেন, আগের বছরগুলোর তুলনায় অনেক বেশী নামাজ পড়েছেন, জুম্মার নামাজে মানুষ ছিল আরও অনেক বেশী। আমিও নামাজ পড়তাম, মসজিদে প্রায় নিয়মিতই যেতাম। সে সময় অনেক জায়গায় ঈমাম সাহেব যে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন করছেন তা বোঝা যেতো। আবার কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করছেন, প্রকাশ্যে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে বলছেন, সেরকমও পেয়েছি। যদিও ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রায় সবগুলোই পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেছে, কিন্তু যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সিংহভাগই ধর্মবিশ্বাসী মুসলিম।

সেই বছর রোজার সময়ও আমরা অপেক্ষায় থাকতাম। যখন রাতে বা কোন সময় শব্দ শুনতাম, বোমার আওয়াজ বা গুলির আওয়াজ, বুঝতাম মুক্তিযোদ্ধাদের কোন অপারেশন হচ্ছে। এটা আমাদের খুবই ভরসা যোগাতো, হ্যাঁ একটা

অপারেশন হচ্ছে, মুক্তিযোদ্ধাদের অস্তিত্ব আছে। সাহস হতো, আরো প্রত্যাশা তৈরি হতো। একেকটা অপারেশন শুধু একটা অপারেশন না, তা মানুষকে সাহস দিচ্ছে, মানুষকে নতুন করে শক্তিশালী করছে, অনেক বেশী প্রভাব পড়ছে মানুষের মনে। এর মধ্যেই ঈদও এল। আমরা তখন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে গান শুনি, 'চাঁদ তুমি ফিরে যাও'। কাউকে কারও বলতে হল না। সেসময় সাধারণভাবে সবার মধ্যে নীরবে একটা বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছিল যে, এই সময়ে ঈদ উদযাপন করা যায় না।

সেই ঈদের পরেই কাছাকাছি কোন এক সময় বাকী ভাই বা ইউনিট কমান্ডার আবদুল্লাহ হেল বাকীর সাথে কথা হল। বাকী ভাইকে আমি বললাম যে, 'আপনার যে বাহিনী আছে তাতে আমি জয়েন করতে চাই। এর আগে চেষ্টা করে পারি নাই, এবার আপনাদের সাথে যাবো।' বাকী ভাই বললেন, 'তোমাদের এই বয়সে যাওয়ার দরকার নাই, তুমি বরং এদিকে কাজ করো।' পীড়াপীড়ি করতে থাকলে একটা পর্যায়ে বললেন, 'দুই কপি ছবি দাও।' আমাকে ভোলানোর জন্য কিনা বা সান্তনা দেওয়ার জন্য কিনা তা আমি বলতে পারবো না। তবে বেশ ভরসা পেলাম। ছবি দিলাম। বললেন, 'আমি ৪ঠা ডিসেম্বর যাচ্ছি সীমান্তের ওপারে, তখন আমার সাথে তুমি যেতে পারবা।' আমি সেইদিনের জন্য অপেক্ষা করি।

ডিসেম্বর ১৯৭১

আমার অপেক্ষা শেষ হবার আগেই ৩ ডিসেম্বর যুদ্ধ শুরু হল পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে। শব্দ শুনলেই আমরা দৌড়ে ছাদে উঠি, আক্রমণ দেখি। তখন ঢাকা শহরের উপর বোমা পড়লে মানুষ খুশি হয়, কোথায় পড়লো তা নিয়ে হিসাবনিকাশ করে, দলবেঁধে বোমাবর্ষণ দেখে, বঙ্গভবনে পড়বার সম্ভাবনা দেখলে আরও খুশি হয়। বঙ্গভবনের উপর পড়ছিল কিনা আমরাও দেখছিলাম। বঙ্গভবনে তখন অবস্থান করছে মালেক। গভর্নর মালেক। *চরমপত্র* নামে একটা অনুষ্ঠান হতো তখন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে। খুবই জনপ্রিয় ছিল। সেই চরমপত্রের ভাষায় মালেকের নাম ছিল 'ঠ্যাটা মালেইক্যা'। খুবই মেরুদন্ডহীন প্রকৃতির লোক। ৩ ডিসেম্বর সারাদিন বোমা আর যুদ্ধ উত্তেজনায় গেল।

৪ ডিসেম্বর সকালবেলা থেকেই অস্থির লাগছিল। যুদ্ধ শুরু হলেও যাবার প্রোগ্রাম ঠিক আছে কিনা তা বুঝতে পারছিলাম না। কাজেই আমি অপেক্ষা করছিই। সেই ৪ ডিসেম্বরই বেলা ১০টার দিকে খবর পেলাম কাছেই রেললাইনের ধারে আবদুল্লাহ হেল বাকীর লাশ পড়ে আছে। বাকীভাই আরও দুএকজনের সঙ্গে একটা অপারেশন করে রেললাইনের ধার দিয়ে ফিরছিলেন। বাকীভাই কমান্ডার ও তার ডেপুটি কমান্ডার ছিলেন বাবুল দু-জনেই ওই এলাকার রাজাকার বাহিনীর হাতে শহীদ হয়েছেন। আমার যুদ্ধে যাবার সব চেষ্টা আর কল্পনার সেখানেই সমাপ্তি। শহীদ বাকী নামে আমাদের পাড়ায় এখন একটা পাঠাগার আছে। শহীদ বাবুল শিশু

একাডেমী আছে। সড়কটা শহীদ বাকীর নামে। এগুলো সবই তাঁদের বন্ধুরা করেছেন। আমার বড় ভাই এসব উদ্যোগে মূল ভূমিকায় ছিলেন। আছেন এখনও।

যাইহোক, প্রতিদিন বোমা পড়ছে, সবকিছু অনিশ্চিত। প্রথম থেকেই শুনছিলাম যে, বাংলাদেশের পাইলটরাই বিমান আক্রমণগুলি পরিচালনা করছে। মানুষের তখন কেবল অপেক্ষা, আর প্রার্থনা। মসজিদে দোয়া দরুদ চলছে। আমাদের বাসায় তখন অনেক তেতুলের বিচি সংগ্রহ করা হয়েছে। কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল তা মনে নাই, তবে সেই তেতুলের বিচি দিয়ে বাড়ির সব লোকজন নিয়ে আব্বা প্রতিদিন আয়াতুল কুরসীসহ অবিরাম নানা দোয়া পড়ছিলেন। কোন দোয়া ১ লাখ, কোন দোয়া দেড় লাখ, কোনটা ৩ লাখ। কোরান খতমও চলছে পাশাপাশি। আমিও একইসাথে নামাজ কোরানসহ দোয়া পড়েছি দিনের পর দিন। আর মাঝে মাঝে যখনই শব্দ হতো তখনই ছাদে গিয়ে আক্রমণ দেখতাম, যুদ্ধই তখন একমাত্র কৌতুহল, একমাত্র আলোচনা। আর ছিল নানা গুজব।

এখানে যারা সেসময়ে বোঝার বয়সে ছিলেন তাঁদের হয়তো মনে আছে, ১৬ ডিসেম্বরের কদিন আগে থেকেই পাকবাহিনীর জারি করা কারফিউ ছিল, দিনের পর দিন। আমরা পরে জেনেছি, এই কারফিউ এর মধ্যে গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল বলে পরিচিত অনেক বুদ্ধিজীবী শিক্ষক ডাক্তার চিকিৎসক হত্যা করা হয়েছে। ক্রমে ক্রমে অনেকগুলো ঘটনা প্রকাশিত হয়, শহীদুল্লাহ কায়সার, ড. মুনীর চৌধুরী, ডা. আলীম চৌধুরী, ড. মোর্তুজাসহ এঁদের সবাইকে বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে হত্যা করা হয়। করে জামায়াতের সঙ্গে যুক্ত আলবদর বাহিনী। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর এই সারা বছরই সারাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ধরে নিয়ে শিক্ষিত জ্ঞানীগুণী, জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গকে টার্গেট করে খুন করা হয়েছে। ২৫শে মার্চ রাত্রে এবং ১৬ই ডিসেম্বরের আগে আগে সেটা করা হয়েছে আরও ব্যাপকভাবে। একটা ভয়ঙ্কর পরিকল্পনার অংশ হিসাবে তারা এটা করেছিল। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ডা. আলীম চৌধুরীর স্মৃতি আমার মনে পড়ে। তিনি চক্ষু চিকিৎসক ছিলেন। ক্লাশ এইটে পড়বার সময় চোখের সমস্যা প্রকট হওয়ায় আব্বা আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি দেখেটেখে বকা দিয়েছিলেন এতো দেরীতে গেছি বলে। তাঁর প্রেসক্রিপশনেই আমার চশমা ব্যবহার শুরু।

যতদূর মনে পড়ে ১৪ ডিসেম্বর থেকে আমরা, পাকিস্তান বাহিনীর উদ্দেশ্যে ফেলা ভারত কমান্ড-এর, লিফলেট পাওয়া শুরু করেছি। লিফলেটে পাকবাহিনীকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানানো হচ্ছে। ১৬ ডিসেম্বর সকালে দোয়াদরূদের মধ্যেই আমরা শুনতে থাকলাম তখনকার রেসকোর্স ময়দানে পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে। অনুষ্ঠান হবে বেলা ৪টার সময়। খবর জেনে চারদিক থেকে মানুষ ছুটে আসছে, সারা ঢাকা শহরে মাসের পর মাস বন্দীদশা থেকে মানুষ তখন মুক্তি চায়।

কিন্তু বিভিন্ন পয়েন্টে তখনও গোপনে আর্মি আছে, কিন্তু আত্মসমর্পন করে নাই, বা যাওয়ার পথ পাচ্ছে না, প্রাণভয়ে আক্রমণ করার চেষ্টা করছে। কিংবা রাজাকার আলবদর লোকজন আছে যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে চোরাগুপ্তা হামলা করছে।

এই উত্তেজনার মধ্যে আমরা কয়েকজন বাসার দেওয়াল টপকে দৌড়াতে দৌড়াতে বর্তমান হোটেল শেরাটন পর্যন্ত এলাম। বেশ কয়েক জায়গায় লুকিয়ে থাকা সেনা বা রাজাকার নিয়ে বিক্ষুব্ধ মানুষজনের জটলা দেখলাম। মৌচাক পার হয়ে একজায়গায় গুলির মধ্যে পড়লাম। এসবের মধ্যেই মানুষ তখন রাস্তায়, দৌড়াচ্ছে, চিৎকার করছে, কী ভয়ংকর পাথর চেপে বসেছিল এতদিন। তখন গুলি কাউকে ঠেকাতে পারছে না। অস্ত্রহাতে মুক্তিযোদ্ধারাও তখন রাস্তায়। মিন্টো রোডের মাথায় পুরনো গণভবন পর্যন্ত প্রায় এক দৌড়েই গেলাম। এর সামনে পাক আর্মির একটা লাশ পড়ে থাকতে দেখেছি। এরপর আর এগুতে পারি নাই।

একটা বিষয় এখন পর্যন্ত আমার কাছে পরিষ্কার হয় নাই। ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ হলো, পাকিস্তান পরাজিত হলো। বাংলাদেশ একটা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আবির্ভূত হল। কিন্তু যে প্রবাসী সরকার অনেক ধরনের টানাপোড়েনের মধ্যে ছিল, মুক্তিবাহিনী, মুজিব বাহিনী, ইন্ডিয়ান আর্মি ইত্যাদির মধ্যে অনেক জটিলতার মধ্যে কাজ করেছে, সেই প্রবাসী সরকার কিন্তু ১৬ ই ডিসেম্বর আসে নাই, ১৭ই ডিসেম্বর আসে নাই, ১৮ তারিখ আসে নাই, এসেছে ২২ ডিসেম্বর। কী কারণে নিজ দেশে আসতে তাঁদের এত দেরী হল তা আমার কাছে এখন পর্যন্ত পরিস্কার নয়, এর লিখিত বা মৌখিক কোন ব্যাখ্যাও কোথাও পাই নাই।

মুক্তিযুদ্ধ আর তার চেতনা

১৯৭১ সালে মার্চ মাসে প্রস্তুতির অভাব এবং সিদ্ধান্তহীনতা দিয়ে যার শুরু, সেই মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় পুরোটা জুড়েই ছিল সমন্বিত দিকনির্দেশনার অভাব। শুধু অভাব নয়, সংঘাতই ছিল। সেনাবাহিনী ও রাজনীতিবিদদের মধ্যেও বিরোধ, অনাস্থা ও টেনশন ক্রমশ বাড়তে থাকে। এসবের অনেককিছুর ধারাবাহিকতা স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত নানাভাবে অব্যাহত আছে।

মুক্তিযুদ্ধের বিষয় আলোচনায় সাধারণভাবে প্রধান দুটি প্রবণতা দেখা যায়। একটি হল, মুক্তিযুদ্ধ মানে আওয়ামী লীগ, মানে আওয়ামী লীগ যেটা নির্ধারণ করবে সেটাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, আওয়ামী লীগের অন্ধ সমর্থনই হল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ। আরেকটা প্রবণতা হল, এর মধ্যে নানা বহিঃস্থ চক্রান্তকে প্রধান করে তোলা। এই ধারার বক্তব্য, ভারত কিংবা সোভিয়েত ইউনিয়নের ষড়যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হয়েছে; এটা কোন মুক্তিযুদ্ধ না। আমি এই দুটো প্রধান ধারার সাথে কোনভাবেই একমত নই।

এটা ঠিক যে, এখানে ভারতের নানারকম হিসাব নিকাশ ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়নেরও নানা বিবেচনা ছিল। এটাও ঠিক যে, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের বলে যুদ্ধে যারা রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের যুদ্ধ কিংবা স্বাধীন বাংলাদেশ সম্পর্কে কোন সমন্বিত দিকনির্দেশনা ছিল না, সেকারণে তাঁদের মধ্যে অনেক রকম দ্বন্দ্ব সংঘাতও ছিল। ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, কী রকম একটা খুবই সূক্ষ্ম তারের উপর পুরো যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছে। যে কোন সময় আরও বড় ধরনের বিপদ হতে পারতো। তাজউদ্দীন আহমেদকে খুন করার জন্য লোক এসেছিল এটাও আমরা এখন শুনি। তাজউদ্দিন আহমেদকে পাই এমন একটি চরিত্র হিসেবে যিনি স্বাধীনতা যুদ্ধকে সফল করবার জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করেছেন। কিন্তু অনেক ধরনের চাপ ও বৈরীতা তাঁকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। স্বাধীনতার পরও তাঁকে সেসবের চাপ বহন করতে হযেছে। সেগুলো খুবই তিক্ত, সেগুলি নিয়ে যত বেশী আলোচনা হবে তত বেশী পরিষ্কারভাবে জানা যাবে।

কিন্তু নেতৃত্বের এই অবস্থা ও অবস্থানের জন্য, আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহের নিজস্ব সমীকরণের জন্য, একটা বর্বর সেনাবাহিনীর আক্রমণ মোকাবেলা করতে গিয়ে বাংলাদেশের জনগণের যে শক্তি, সাহস, তার চেতনা, প্রত্যাশা ও স্বপ্ন তা ছোট হয় না, এগুলোর গুরুত্ব কোনভাবেই খর্ব হয় না। সেজন্য আমি যেটা প্রথমে বলেছি যে, ৭১ সালের যুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের ধারাবাহিকতার একটি অংশ। ৭১ এর যুদ্ধের মধ্যে সমাজের বিভিন্ন অংশ বিভিন্নভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। একটি চেতনাই তখন প্রাধান্যে ছিল যে, এমন একটি দেশ হবে যা পাকিস্তানের মত হবেনা। নতুন কোন পাকিস্তান আর হবে না। একটা নতুন ধরনের দেশ হবে। মানুষের মধ্যে, ভূমিহীন, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত কিংবা শিক্ষার্থীদের মধ্যে কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে নতুন আশা আকাঙ্খা তৈরি হয়েছিল সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। আমার ওই সময়ের পর্যবেক্ষণ যদি আমি নতুন ভাবে পরীক্ষা করি, যদি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পরীক্ষা করি তাতে যা পাই তা হল মানুষের মনে তখন একটা আকাংখা তৈরি হয়েছিল - রাষ্ট্র চাই নতুন রাষ্ট্র, মানে নতুন ব্যবস্থা চাই। এই নতুন সমাজে পাকিস্তানের মত জাতি বর্ণ ধর্ম শ্রেণী বৈষম্য মূলক যে ব্যবস্থা তার অবসান ঘটবে। সেটা একটা সমৃদ্ধ সমাজ হবে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যদি আমরা বলি, তাহলে চেতনার একটা দিক তো ছিল বটেই একটা নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। চেতনার মধ্যে অনেকগুলি ধারা, অনেক ধরনের আকাঙ্খা ছিল। তার মধ্যে অভিন্ন ন্যূনতম জায়গাটা বা বটম লাইন কোনটা ছিল? পাকবাহিনীর কতিপয় সহযোগী বাদে কোথায় এসে সবাই একমত ছিল? কোন রেখায় সবাই একমত? সবাই একমত ছিলেন যে, বাংলাদেশ হবে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখন রাষ্ট্র প্রতিষ্টা হয়েছে। এই এতটুকুই প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কিন্তু অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হয়েছে সেটা আমরা বলতে পারিনা। শ্রেণী বর্ণ, ধর্ম, জাতিবৈষম্য থেকে মুক্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে সেটাও তো বলতে পারি না। যে রাষ্ট্র এখন দেখছি এর জন্য বাংলাদেশের মানুষ লড়াই করে নাই।

এগুলো হয়নি বলে যদি কেউ আবার এরকম সিদ্ধান্ত টানেন যে, তাহলে মুক্তিযুদ্ধ বা লড়াই করে কী লাভ হলো? এটার সাথে আমি একমত নই। আমাদের বলতে হবে মুক্তিযুদ্ধের ধারাবাহিকতা এখন পর্যন্ত চলছে। আমরা মুক্তির যুদ্ধের মধ্যেই আছি। এখন যত ধরনের লড়াই হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির লড়াই, সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য কিংবা লুণ্ঠন পাচার বিরোধী লড়াই কিংবা মানুষের নতুন সমাজের জন্য লড়াই, নিপীড়ন বৈষম্য বিরোধী যত ভাবেই লড়াই হচ্ছে সবগুলো লড়াই কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের ধাবাবাহিকতার অংশ। বাংলাদেশের ভবিষ্যতে কোন বড় ধরনের লড়াই অগ্রসর হবে না ১৯৭১ কে হিসাবের মধ্যে না নিয়ে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের যে স্পিরিট সাহস বা চেতনা তাকে স্পর্শ না করে বাংলাদেশের ভবিষ্যতে বড় ধরনের কোন লড়াই দাঁড় করানো যাবে না। আবার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মধ্যে গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক কিংবা সমাজতান্ত্রিক যে চেতনাগুলি তৈরি হয়েছিল সে বিষয়ে পরিষ্কার অবস্থান না গ্রহণ করলে এই মুক্তিযুদ্ধটাকে ১৯৭১ সালের মধ্যেই আটকে রাখা হবে।

আজকে যুদ্ধাপরাধীদের যে বিচার হচ্ছে তা ১৯৭২-৭৩ সালেই শুরু হওয়া উচিত ছিল। এতদিন এটা ঢেকে রাখা হয়েছে। খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে যুদ্ধাপরাধীদের এসময় পর্যন্ত টিকে থাকা এবং বাংলাদেশ শাসক শ্রেণীর বর্তমান রূপলাভের পরস্পর সম্পর্ক আছে। যে প্রক্রিয়ায় এইদেশ লুটেরাদের করতলগত হয়েছে, সেই প্রক্রিয়াতেই যুদ্ধাপরাধীদের দাপট ও প্রভাব তৈরি হয়েছে। এই যুদ্ধাপরাধীদের জন্য জনগণকেই জোরদার আন্দোলন করতে হয় ১৯৯২ সালে। এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জাহানারা ইমাম, তাঁর নাম বাংলাদেশের মানুষকে মনে রাখতে হবে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারও তাঁর নাম মুখে আনতে চায় না। অথচ বিএনপি সরকারের দায়ের করা রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা ঘাড়ে নিয়েই তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আওয়ামী লীগ জামায়াতের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকারবিরোধী আন্দোলনে নামার কারণে যুদ্ধাপরাধী বিরোধী আন্দোলন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আন্দোলনে কোণঠাসা হয়ে পড়া জামায়াত পুনর্বাসিত হয়। পরে ২০০১ সালে বিএনপির সাথে সরকার গঠন করে। যুদ্ধাপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত দুজন বাংলাদেশের মন্ত্রী হয়।

স্বাধীনতার পর বিচারের পরিবর্তে বিভিন্ন সরকারের ও বৃহৎ দলগুলির আশ্রয় প্রশ্রয়ের কারণেই যুদ্ধাপরাধীদের রাজনীতি আবারো বিকশিত হয়েছিল। জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে আন্দোলন সেই ধারায় ছেদ টেনেছিল। এই গণআন্দোলনের মাধ্যমেই তরুণ প্রজন্মের কাছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বিষয়টা আবারো সজীব হয়েছিল। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অতীতের বিষয়, কিন্তু এখন পর্যন্ত তা ঝুলে থাকবার কারণে আমাদের তার জের টানতে হচ্ছে। ১৯৪৭ সালে যেভাবে ভারত বিভক্ত হয় তার মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছিল সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প, সেই বিষবাষ্প

এখনও জনগণের রাজনীতিকে বিষগ্রস্ত করছে। এখন পর্যন্ত ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশে তার জের টানতে হচ্ছে। তাই অবিলম্বে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সমাপ্ত করে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হতে হবে। আওয়ামী লীগ সরকার ভোটসহ তার নানা হিসাব নিকাশে এই বিচারকাজ ঝুলিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু জনগণের দিক থেকে এর দ্রুত নিস্পত্তি হওয়া দরকার। এখানে আজকের মতো শেষ করি। একটু বেশী সময় হয়ে গেল বোধ হয়।

প্রশ্নোত্তর

* ৭১ সালে প্রথম বিবেচ্য ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্বরতা, গণহত্যা নির্যাতন থেকে মুক্তি লাভ করা, স্বাধীন বা বাংলাদেশ একটা আলাদা রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে ওঠা। এই লক্ষ্যে ঐকমত্য থাকলেও যুদ্ধের মধ্য দিয়েই আকাঙ্খার পার্থক্যগুলো তৈরি হয়েছে। *৭১ এর দিনগুলি* পড়লেও আপনারা এর কিছু দিক দেখতে পারবেন। যারা তখন যুদ্ধ করতে যাচ্ছে তারা সবাই যে একই রকম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছে তা নয়। অনেক সময় আন্দোলন সংগ্রামে বিভিন্ন জনের অংশগ্রহণ আমরা দেখি, যাদের অনেকের কথা হয়তো চিন্তাও করা যেতো না। অনেক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে, কেউ হয়ত কোনদিন রাজনীতির ধারে কাছে ছিল না, কিংবা উল্টো দিকে ছিল, এরকম লোকজনও মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করে। পরিস্থিতিই তার একটা পরিবর্তন করে । এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলতে চলতে তার আরো বড় ধরনের পরিবর্তন হয়। নতুন চেতনাও তৈরি হয়। শুধু একটি দেশ নয়, ভিন্ন একটি দেশ। এর চেতনা কোথা থেকে আসছে? তারা তো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা দেখছেও। যখন আমাদের মুক্তির লড়াই চলছে, তখন ভিয়েতনামে বিশাল লড়াই চলছে। সেই গেরিলা যুদ্ধে মার্কিন সেনাবাহিনী পরাজিত হচ্ছে। তার আগে কিউবার বিপ্লব হয়েছে, বহু দেশে বিপ্লবী লড়াই চলছে। সুতরাং সামগ্রিক মুক্তি কিংবা মুক্তির চেতনা কিংবা একটা ভিন্ন সমাজ গঠনের আকাংঙ্খা, কিংবা প্রত্যাশার নানা ছবি তৈরি হচ্ছে সে সময় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এবং মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত মানুষের মধ্যে।

* এখানে আরেকটা প্রশ্ন এসেছে ১৯৭০ এর নির্বাচনে মওলানা ভাসানীর অংশগ্রহণ না করা প্রসঙ্গে। এর সঙ্গে তৎকালীন রাজনীতির অনেক দিক সম্পর্কিত। বলতে গেলে উত্তর অনেক লম্বা হয়ে যায়। সংক্ষেপে বললে, মওলানা ভাসানী নির্বাচনে আগ্রহী ছিলেন। মওলানা ভাসানীর সাথে যে বামপন্থী শক্তিগুলো ছিল তাদের একটা বড় অংশ নকশালবাড়ী আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। সেই প্রভাবে তাদের রাজনৈতিক লাইনের মূল শ্লোগান ছিল: 'ব্যালটে না বুলেটে: বুলেটে বুলেটে', সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনৈতিক লাইন। ন্যাপ একটি প্রকাশ্য দল

হলেও দলের উপর এই লাইনের আধিপত্যের কারণে মওলানা ভাসানী নির্বাচনে যেতে পারেননি।

* প্রশ্ন এসেছে- হঠাৎ কেন ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ হল, যুদ্ধ শুরুর মাত্র ১৩ দিনের মাথায়? কারণ ৩রা ডিসেম্বর যুদ্ধ শুরু হলেও বিভিন্ন ধরনের গেরিলা তৎপরতার মধ্য দিয়ে পাকবাহিনী আগে থেকেই বিপর্যস্ত অবস্থায় ছিল। আর তাদের তো কোন জনসমর্থন ছিল না। একটা সেনাবাহিনী যতই শক্তিশালী হউক, জনসমর্থন না থাকলে তার পক্ষে টেকা সম্ভব নয়। ফলে এমনিতেই তারা যখন জনগণের সমর্থন হারিয়ে জনগণের প্রতিরোধে বিপর্যস্ত তখনই এই যুদ্ধ শুরু হয়। যে অবস্থা ছিল তাতে তাদের সামনে বা পিছনে কোনদিকেই যাওয়ার উপায় ছিল না। একদিকে ইন্ডিয়ান আর্মি আক্রমণ করছে, অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধারা তো সব জায়গাতেই। কোন জায়গাতে একজন পাকিস্তানি সেনা আশ্রয় প্রার্থনা করলেও তাকে আশ্রয় দেওয়ার মত কেউ ছিল না। তাও অনেকে মানবিক কারণে কাউকে কাউকে প্রাণে বাঁচিয়েছে। প্রাণে বেঁচে কেউ কেউ আবার ফিরে গিয়ে অপারেশন চালিয়েছে এমন ঘটনাও আছে। যাঃহোক, পরাজয় অনিবার্য ছিল পাকিস্তানি আর্মির জন্য।

* দলীয় ভাবে কমিউনিষ্ট পার্টি ছাত্র ইউনিয়নসহ বামপন্থী অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য গেছেন। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে তাদেরকে সুযোগ দেওয়ার ব্যাপারে বরঞ্চ দ্বিধা ছিল। আমরা অনেকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এগুলো পরে জেনেছি। মুশতারী শফির বইতেও তার কিছু বর্ণনা আছে, তাদের কর্মীরা মুক্তি বাহিনীতে যোগ দিতে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের করতে দেওয়া হচ্ছে না। কারণ সেখানে বামপন্থী বিরোধী শক্তিশালী প্রতিরোধ তৈরি হয়েছে। বিশেষত যারা নিয়ন্ত্রণ করছে সেই ইন্ডিয়ান আর্মি চাচ্ছে না বামপন্থীদের কোন যুক্ততা ঘটুক। কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীদের সাথেও তারা সহযোগিতামূলক আচরণ করছেনা। এসব নিয়ে অনেক চাপা ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। অনেকে তাই নিজেরা আলাদাভাবে যুদ্ধ সংগঠিত করতে চেষ্টা করেছিলেন।

* মুজিব বাহিনী গঠনের ঘটনাবলী এখনও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটা বড় প্রশ্ন হয়ে আছে। এখন পর্যন্ত সেই প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই যে, মুজিব বাহিনী কেন গঠন করা হলো। আগেই বলেছি, বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার বা বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ বাইরে এটা দাঁড় করানো হয়েছিল। *মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর* গ্রন্থে একে খন্দকার, মইদুল হাসান সহ তারা তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন যে, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার মধ্যে যারা সিআই এর সঙ্গে যুক্ত তাদেরকেই দায়িত্ব দেওয়া হয় মুজিববাহিনী গঠনের জন্য । পরবর্তীকালে স্বাধীনতার পর রক্ষীবাহিনী গঠনসহ যেসব ঘটনাবলী ঘটলো সেগুলোর সাথে এর সম্পর্ক প্রত্যক্ষ।

* মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা আমরা ৩০ লক্ষ বলে জানি। শেখ মুজিবের বক্তব্য থেকে এই সংখ্যা বলা হয়। কিন্তু বিস্তৃত কোন জরীপ এখন পর্যন্ত হয়নি। কখনও কখনও অনেকে এই সংখ্যা ৩ লাখ বলে থাকেন। যারা গণহত্যার ভয়াবহতা আড়াল করতে চান বা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে চান তারা সংখ্যার এই বিভ্রান্তির সুযোগ নিতে খুবই চেষ্টা করেন। এটা বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, কোন সরকারের পক্ষ থেকেই এই হিসাব পরিষ্কার করা হয় নি। স্বাধীনতার পর পরই হিসাব করা দরকার ছিল, সহজও ছিল, করা হয় নাই। এই ব্যর্থতার সুযোগ অনেকে নিচ্ছে, আর তাছাড়া এতবছরে কেন সকল শহীদের তালিকা থাকবে না? এটা কোন কঠিন কাজ? প্রত্যেকটা জেলাতেই বহু সংখ্যক মানুষ সরাসরি নিহত হয়েছেন পাকবাহিনী বা রাজাকার আলবদরদের হাতে। কেউ যুদ্ধ করতে গিয়ে, কোথাও পাইকারি হত্যাকান্ডের শিকার হয়ে। তাদের সংখ্যা বিপুল। এটা ৩০ লাখ নাকি ২৯ লাখ না ১০ লাখ না ৩ লাখ তার হিসাব এখনও চূড়ান্ত হয়নি। আমি মনে করি এটা বিতর্কের বিষয় হতে পারে না। ৩ লাখ কি কম সংখ্যা? পাকিস্তান আর্মি এখানে গণহত্যা করেছে, গণহত্যা হয়েছে এইটাই মুখ্য। এছাড়া নির্যাতন, ধর্ষণও বিস্তৃত ভয়ংকর অধ্যায়। এতবছর পরেও এসবের পূর্ণাঙ্গ চিত্র আসেনি। এখনও যোগ হচ্ছে।

* ২৫শে মার্চ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হল, ভারত কেন ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল? ভারতের যুদ্ধ ঘোষণার পেছনে কী কী কৌশলগত বিবেচনা কাজ করেছিল এটা আমি আগে কিছুটা বলেছি। তাদের বিচার বিবেচনার একটা বিশেষ দিক ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সমর্থনে আন্তর্জাতিক কী কী উদ্যোগ হতে পারে? পাকিস্তানের তখন একঘরে অবস্থা হলেও যুক্তরাষ্ট্র তার পেছনে প্রধান শক্তি, যুক্তরাষ্ট্র থেকে তার জন্য সহায়তা আসতে পারে। আর একটা হচ্ছে চীন। যুদ্ধ শুরু হলে চীন আসতে পারে স্থলপথে, চীনের আসাটাই ভারতের জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠার বিষয় ছিল। সুতরাং চীনের আক্রমণ ঠেকানোর জন্য ডিসেম্বর মাস নির্বাচন করা যথাযথ ছিল। চীন পরে আর আসেনি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এসেছিল সপ্তম নৌবহর নিয়ে বঙ্গোপসাগরে। আমরা সে সময় ঢাকায় শুনতে পাচ্ছি সপ্তম নৌবহর আসছে, এবং যে কোন সময় সপ্তম নৌবহর থেকে আক্রমণ শুরু হতে পারে। সেই সপ্তম নৌবহর পরে আর অগ্রসর হতে পারে নাই। পাকিস্তানের বর্বরতা গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রবল আন্তর্জাতিক জনমত, সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেটো, ভারতের স্বীকৃতি, সমস্ত কিছু মিলে পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর কোন উপায় ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এরপর পাকিস্তানকে ছেড়ে দিয়ে নতুন রাষ্ট্রের সাথে আবার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ দিল। ৪০ বছর পর আবার বঙ্গোপসাগরে আমরা মার্কিন নৌবহরের আগমনধ্বনি শুনতে

পাচ্ছি। বঙ্গোপসাগরের তেলগ্যাস ব্লকগুলো মার্কিন কোম্পানি নেবার অপেক্ষা করছে, প্রতিরোধের কারণে তার বিলম্ব হচ্ছে। নিরাপত্তার যুক্তি দিয়ে মার্কিন নৌবহর বারবার দখল নিতে চাচ্ছে সেই বঙ্গোপসাগর যেখান থেকে তারা ১৯৭১ সালে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ফেরত গিয়েছিল।

* ৭১এর মুক্তিযুদ্ধে মাওলানা ভাসানীর অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন এসেছে। টাঙ্গাইল আক্রমণের শুরুতেই পাকিস্তানের আর্মি মওলানা ভাসানীর বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দেয়। ভাসানী খাল পাড়ি দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে যান। পরে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে তার সভাপতি করা হয় মওলানা ভাসানী কে। কিন্তু এই পরিষদের একটাই সভা হয়েছিল। পরিষদে আরও ছিলেন মণিসিংহ, মোজাফফর আহমদ প্রমুখ। একটার পর এই পরিষদের আর কোন সভা হয় নাই। মওলানা ভাসানী কার্যত গৃহবন্দী ছিলেন।

* প্রশ্ন এসেছে অত্যাচার শুরু হয় ২৫ শে মার্চ, ভারত কেন এতো দেরীতে সাড়া দিল? দেরীতে সাড়া মানে কি, ভারতের দিক থেকে তো অনেক রকম হিসাব নিকাশ ছিল এবং রাষ্ট্র হিসেবে তার হিসাব নিকাশ থাকারই কথা। ব্যাপকভাবে শরনার্থী মানুষেরা গেছে ভারতে, এই সমস্যা নিয়ে ভারত প্রথম থেকেই আন্তর্জাতিক যোগাযোগ শুরু করে। তাজউদ্দিন আর ইন্দিরা গান্ধী সভা করলেন, আলোচনা হলো। প্রথম দিকে ভারতীয় সরকার তার ভূমিকার ধরন নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই দ্বিধান্বিত ছিলো। আন্তর্জাতিক কোন ঝুঁকি তৈরি করবে কি না তা নিয়ে ভারতের দিক থেকে নানাকিছু বিবেচনা করতে হয়েছে। আবার ভারতের মধ্যে যারা সরকারের আশে পাশে ছিলেন তারা অনেকে বলেছেন যে এই স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ভারত বিপদে পড়বে। কারণ এখন পাকিস্তান একটা, তখন পাকিস্তান হবে দুইটা । আবার অনেকে বলেছেন এটা ভারতের জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ। নকশাল আন্দোলন দমনেও এটা ভাল সুযোগ ছিল।

* বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হওয়ার কথা থাকলেও সাম্প্রদায়িক কেন বলছি তার ব্যাখ্যা চেয়েছেন একজন। ভারতের সংবিধান অনুযায়ী সেটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, কিন্তু ভারতকে আমি কোনভাবেই অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র বলবো না। সামাজিক বিধি ব্যবস্থার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ভারতে খুব জোরদারভাবেই আছে। বাংলাদেশে সেটাও আছে, সংবিধানেও সাম্প্রদায়িকতা আছে। বাংলাদেশে অনেকে বিশেষত বাঙালীরা প্রায়শই বলেন অন্য যারা জাতি আছে তারা খুব ভালো আছে। কিংবা মুসলমান সমাজের মধ্য থেকে অনেক সময় বলা হয় বাংলাদেশে কোন সাম্প্রদায়িকতা নাই। আমি মনে করি যে একটা সমাজে জাতিগতভাবে যারা সংখ্যালঘু, তারা যদি বলে যে এখানে জাতিগত বিদ্বেষ নাই তখন আমরা জাতিগত বৈষম্য নিপীড়ন নাই বলে নিশ্চিত হতে পারি। ধর্মের ক্ষেত্রেও তাই, ধর্মীয় সংখ্যালঘু

যারা, তারা যদি বলে এই দেশে বসবাসে ধর্মীয় কারণে আমি কোন অসম্মান বা নিরাপত্তাহীনতা বোধ করি না, তাহলে আমরা বলতে পারবো যে আমরা অসাম্প্রদায়িক সমাজে বাস করছি। সেই হিসাবে পৃথিবীর খুব কম দেশ পাওয়া যাবে অসাম্প্রদায়িক হিসেবে। কিন্তু সেই আকাঙ্খাটা জারি রাখতে হবে। বাংলাদেশে এই পরিস্থিতি তৈরি করা ভারতের চাইতেও সহজ। এখানে অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা মোটেও কঠিন নয়। এখনও ভারতের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে এখানকার পরিস্থিতি ভাল। এটা বলতে পারি কারণ গুজরাট এর মতো পরিস্থিতি এখানে নাই, হবে না। কিন্তু তার উপাদানগুলো নানাভাবে আছে। ২০০১ এর বর্বরতাও আমাদের মনে রাখতে হবে। তাই সজাগ থাকতে হবে। সাম্প্রদায়িক শক্তি ও রাজনীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকতে হবে।

* নকশালবাড়ি আন্দোলন দক্ষিণ এশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলনের একটা নির্দিষ্ট ধারা। ভারতের দিককার দিনাজপুরের কাছে, কিংবা দার্জিলিং থেকে নীচে নামলে যে শিলিগুড়ি তার পাশেই, নেপাল সীমান্তের কাছাকাছি নকশালবাড়ি বলে একটা গ্রাম আছে। চা বাগানের ধারে । নকশালবাড়ি গ্রাম থেকে যেহেতু এর উৎপত্তি, সেজন্য পরবর্তী কালে নাম হয় নকশালবাড়ি আন্দোলন, যার নেতা ছিলেন চারু মজুমদার। কৃষক জনতার মুক্তির সংগ্রামে নতুন ভারত প্রতিষ্ঠার যে লড়াই, তারই একটা ধারা হিসাবে আবির্ভূত হয় এই আন্দোলন। এই আন্দোলনের ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। দমনপীড়নও ভয়াবহ আকার নেয়। এর চিত্র একজন নকশাল কর্মীকে নিয়ে লেখা মহাশ্বেতা দেবীর *হাজার চুরাশির মা* উপন্যাসে পাওয়া যায়। এই আন্দোলন পরে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গের অনেক খ্যাতিমান লেখক, শিল্পী এবং রাজনীতিবিদকে পাওয়া যাবে যারা কোন না কোন ভাবে নকশাল ধারার সাথে যুক্ত ছিলেন।

* স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে এখন যে বিতর্ক তার আসলে কোন অর্থ বা গুরুত্ব নাই। জিয়াউর রহমান যদি পরে বিএনপি প্রতিষ্ঠা না করতেন তাহলে এই বিতর্কের উৎপত্তিই হতো না। ২৫ মার্চ আমরা যখন ব্যারিকেড দেওয়ার কাজ করছি তখন তো কোন ঘোষণা শুনে বা কোন নির্দেশনা নিয়ে আমরা সেইকাজে হাত দেই নাই। পুরো মুক্তিযুদ্ধের সময় ঘোষণা নিয়ে কারও কোন মাথাব্যথা ছিল বলে আমার জানা নাই। শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চ একরকম ঘোষণা, কিন্তু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা তো আমরা শুনি নাই। জিয়াউর রহমান স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যে ঘোষণা পাঠ করেছিলেন সেটা ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষেই। জিয়াউর রহমান যে বক্তব্য দিয়েছেন প্রবাসী সরকার সেটা ধারণ করে প্রচার করেছে। নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব অবধারিত ছিল। সে নেতৃত্ব কতটুকু কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল, মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে সেই

নেতৃত্ব থাকতো কিনা সেটা অন্য ব্যাপার, কিন্তু যা হয়েছে তা প্রধানত আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই। আবার সেক্টর কমান্ডার হিসাবে জিয়াউর রহমান ভূমিকা পালন করেছেন, মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। সেটা অস্বীকার করলে প্রবাসী সরকার কিংবা পরে শেখ মুজিবের খেতাব প্রদান সবই অস্বীকার করতে হয়।

জিয়ার রাজনীতি নিয়ে আমাদের প্রশ্ন থাকতে পারে, অবশ্যই প্রশ্ন আছে, তিনি তো আমাদের দেশের শাসক শ্রেণীর অংশ। সামরিকীকরণ, সামরিক বাহিনীর ভেতরে অনেক হত্যাকান্ড ইত্যাদি অনেক বিষয়ে তাঁর বিরুদ্ধে বলার আছে। কিন্তু তিনি মুক্তিযুদ্ধের একটি বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন সেটা তো ঐতিহাসিক সত্য। সেখানে তিনি কতটুকু মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন করছেন, সেখানে তার ভূমিকা কী ছিল সেটা নিয়ে অনেকে এখন প্রশ্ন তুলছেন। সেগুলি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তো শুধু জিয়া নন, অনেককে নিয়েই প্রশ্ন তুলতে হবে। শেখ মুজিবও তা থেকে বাদ যাবেন না। সেটা আমরা অবশ্যই করতে চাই। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, শেখ মুজিবুর রহমান পুরো যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না, তিনি গ্রেপ্তার হলেন ২৫ মার্চ রাতে। কিন্তু তারপরও তার অনুপস্থিতির মধ্যেও তিনিই ১৯৭১ এর যুদ্ধের নেতা ছিলেন, সেটা অনস্বীকার্য।

* এই অঞ্চলের নাম পূর্ব বাংলাই ছিল, পরে হয় পূর্ব পাকিস্তান। বিভিন্ন পার্টি কেউ পূর্ব বাংলা কেউ পূর্ব পাকিস্তান নামে নিজেদের পরিচয় দিতেন। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর তারা কেউ কেউ নাম পরিবর্তন করেছেন কেউ নাম পরিবর্তন করেননি। কেউ কেউ পূর্ববাংলা রাষ্ট্রের পরিচয় দেওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন। সেটি তাদের বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক অবস্থান আমি মনে করি। ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চের পরে বাংলাদেশ পরিচয় হচ্ছে এই অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় পরিচয়। মুক্তিযুদ্ধের দুর্বলতা সম্পর্কে, তার নেতৃত্বের শ্রেণী চরিত্র সম্পর্কে, নেতৃত্বের ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার নিশ্চয়ই যুক্তি আছে। এটা বলারও যুক্তি আছে যে, ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ যথার্থ মুক্তির যুদ্ধ হয়ে উঠতে পারেনি। হলে দেশ আজ এরকম অবনত, দারিদ্র বৈষম্য ও নিপীড়নে জর্জরিত থাকতো না। সেজন্যই মুক্তির যুদ্ধ আমাদের শেষ হয় নি। কিন্তু যে রাষ্ট্রে আমাদের এই লড়াই তার নাম বাংলাদেশ। আর কিছু নয়।

* মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন শ্রীলংকার ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিলনা। তবে পাকিস্তানের পক্ষে তারা অবস্থান নেয় নাই। এটাই গুরুত্বপূর্ণ।

* ১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও স্বাধীনতা বিরোধীরা বিভিন্ন ভাবে সক্রিয় ছিল। ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন হওয়ার পরেও সারা দেশের উপর কেন্দ্রীয় কোন প্রশাসন স্থাপন হয়নি। বাংলাদেশের প্রশাসন তখন কারা পরিচালনা করেছে সেটা এখনও অপরিষ্কার। কারণ প্রবাসী সরকার দেশে এসেছে এক সপ্তাহ পরে।

সুতরাং সে সময় একটা অস্থায়ী ব্যবস্থাপনা ছিল, কোন কোন জায়গায় কোন অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, কোন কোন জায়গায় প্রশাসনে আগে যারা ছিলেন তারাই এডহক প্রশাসন ব্যবস্থা চালাচ্ছিলেন। কোথাও কোথাও আবার রাজাকার আলবদর পাকিস্তান সেনাদের গোপন অবস্থান ছিল। স্বাধীনতার ঠিক পর পর মিরপুর মোহাম্মাদপুর কাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল তার পরিষ্কার তথ্য এখনও আমরা পাইনি। এই সময়েই ভাই শহীদুল্লাহ কায়সারকে খুঁজতে গিয়ে লেখক চলচ্চিত্রকার জহির রায়হান রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হন। ১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলো জহির রায়হান নিখোঁজ হলেন ৩০শে জানুয়ারী। তার খোঁজ আর পাওয়া যায় নাই। কীভাবে সম্ভব? এর ব্যাখ্যা কী? আমরা এখনও পরিষ্কার জানি না।

* বাঙালী বিহারী সংঘাত একটা খুবই অসুবিধা জনক অধ্যায়। ভারত থেকে উদ্বাস্তু হযে আসা বিহারী জনগোষ্ঠীর সাথে বাঙালী জনগোষ্ঠীর দূরত্ব পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী তাদের স্বার্থে সবসময় ব্যবহার করেছে। এরই চূড়ান্ত চেহারা আমরা দেখি ১৯৭১ সালে। বাঙালী বিহারী যেই হোক যারা অপরাধ করেছে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে তাদের শাস্তি প্রাপ্য। কিন্তু বিহারী জনগোষ্ঠীর শিশু নারী কেন তাদের কতিপয় ব্যক্তির অপরাধের দায় বহন করবে? পরবর্তী প্রজন্ম কেন দুর্ভোগ পোহাবে? এখন যারা বিহারী জনগোষ্ঠী আছে, ৭১ পরবর্তী প্রজন্ম তারা এখন পর্যন্ত যে অবস্থায় আছে তার অবসান হওয়া দরকার। বাংলাদেশের অন্যান্য নাগরিকের মতোই তারাও এখানে লড়াই করবে, বাংলাদেশকে নতুন ভাবে তৈরি করবার জন্য সকল ধর্ম বর্ণ জাতি ভাষার নারী পুরুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হওয়া দরকার।

* গত ৪০ বছরে বাংলাদেশে বাণিজ্যিকীকরণ এমন মাত্রায় গেছে যে এখন মুক্তিযুদ্ধ নিজেই একটি পণ্য কিংবা অন্য পণ্য বিক্রির বাহন বা মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় স্মৃতিসৌধ যা মানুষের লড়াইএর ধারাবাহিকতার একটা সেতু তা এখন মোবাইল কোম্পানীর খপ্পরে; শহীদ, শহীদের স্ত্রী, শহীদ মিনার সবই এখন বিনা বাধায় বাণিজ্যের উপকরণ। এমনিতেই মানুষের মুক্তির চেতনার ধার নষ্ট করবার জন্য, ৭১ এর লড়াইএর চেতনা বিফল করবার অনেকরকম চেষ্টা করা হয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের সাথে শ্রেণীমৈত্রী গড়ে তুলেছে মুক্তিযুদ্ধের তথাকথিত সপক্ষ শক্তি। মুক্তিযুদ্ধ, ধর্ম সবই একদিকে বাণিজ্য; অন্যদিকে জনবিরোধী রাজনীতির বর্ম হিসেবে এগুলোর ব্যবহারের চেষ্টাই জোরদার। এর বিপরীতে মানুষের মুক্তির যুদ্ধকে অব্যাহত রাখায় নিজ নিজ ভূমিকা পালনই হচ্ছে আমাদের এই সময়ের দায়িত্ব। ধন্যবাদ।

'বাঙলার পাঠশালা' আয়োজিত 'আনু মুহাম্মদ বক্তৃতামালা-২'। ২০ মার্চ ২০১১

ধর্মের নানা ভাষা, ফ্যাসিবাদী আবহাওয়া এবং বুদ্ধিবৃত্তির লড়াই

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে কিংবা বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কীভাবে দেখব ধর্ম, আধিপত্য এবং বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতার প্রশ্ন কিংবা ফ্যাসিবাদের উত্থানের প্রশ্ন? এবং চারিদিকে যে আতংকের পরিস্থিতি সেটাকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব? আজকের আলোচনায় এই বিষয়গুলোই বৃহত্তর পরিসর থেকে বোঝার চেষ্টা করবো।

বছর পনেরো আগে ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশে আমরা লেখক শিল্পীদের একটা সমাবেশ করেছিলাম। ১৯৯২ সালে যুদ্ধাপরাধী বিরোধী একটা আন্দোলন বেশ বিস্তার লাভ করেছিল। গণআদালতের সেই আন্দোলন হয়েছিল জাহানারা ইমারের নেতৃত্বে এবং সে গণআদালতে গণরায় হয়েছিল- গোলাম আজমের ফাঁসি ঘোষণা করা হয়েছিল এবং তারপরও সে সময় তৎকালীন সরকার গোলাম আজমকে নাগরিকত্ব দিয়েছিলেন। সেই বছরই ১৯৯২ সালেই ৬ ডিসেম্বর ভারতে বি.জে.পি এবং শিবসেনা'রা সবাই মিলে বাবরী মসজিদ ভাংচুর করে। ভারতে বাবরী মসজিদ ভাঙার পরে বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধী আন্দোলন সাংঘাতিকভাবে বিপর্যস্ত হয় কারণ ওই বাবরী মসজিদ ভাঙার ইস্যুকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী এবং যুদ্ধাপরাধী নেতৃত্বাধীন যে সমস্ত দল আছে তারা রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে এই এজেন্ডাকে খুব কার্যকরীভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়। সেই পরিস্থিতিতে ১৯৯৩ সালে পন্ডিত, শিক্ষক ড. আহমদ শরীফকে মুরতাদ বলে ঘোষণা করা হয় এবং আহমদ শরীফের ফাঁসি চাওয়া হয়। এর কিছুদিনের মধ্যেই লেখক ও কবি তসলিমা নাসরিনের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয় এবং তসলিমা নাসরিনের ওপর হামলাও হয় কয়েক দফা। এবং তার পরপরই সংসদে ব্লাসফেমি আইন বলে একটি আইন প্রস্তাব আকারে উপস্থিত করা হয়। ব্লাসফেমি আইনের মূল কথাটা হচ্ছে যে, কেউ যদি ধর্ম সম্পর্কে কিংবা রসুল সম্পর্কে কটূক্তি করে কিংবা ধর্মদ্রোহীতার কোন উপাদান যদি কারও কোনো বক্তব্যে থাকে তাহলে সেটা হবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কোনটি আপত্তিকর, কোনটি অশ্রদ্ধার, কোনটি ধর্মানুভূতিকে আঘাত করে সেই ব্যাখ্যাটা সাধারণত নির্ভর করে, যারা ক্ষমতায় থাকে তাদের উপর।

সুতরাং এই ধরনের একটা আইন থাকা মানে যে কোন ধরনের লেখা বা যে কোন ধরনের বক্তব্য যদি ক্ষমতাবানদের অপছন্দ হয় তাহলে ধর্মদ্রোহীতার দায়ে

অভিযুক্ত করে তাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো সম্ভব। ইতিহাস বলে, এই ধরনের আইনের অস্তিত্ব থাকা মানেই হচ্ছে, লেখক, শিল্পী-সৃজনশীলতার জন্য বড় ধরনের হুমকি। সে জন্যই আমরা তার প্রতিবাদ করে, সেই ব্লাসফেমি আইন যাতে প্রবর্তিত না হয় তার বিরোধিতা করে লেখক-শিল্পীদের একটা সমাবেশ করেছিলাম ১৯৯৪ সালে। ব্লাসফেমি আইন প্রবর্তিত হয় নাই। কিন্তু মাঝেমধ্যেই ব্লাসফেমি আইন প্রবর্তনের জন্য আবার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

অন্ধ ঘাতক

যে বছরে আমরা সভা সমাবেশ করেছি সেই বছরই মিশরে, আমাদের থেকে বেশ দূরেই, আবার অনেক দিক থেকে কাছেও বটে, অনেক বৈশিষ্টের দিক থেকে, মিশরের একজন লেখক তাঁর নাম হচ্ছে নগিব মাহফুজ- তিনি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী লেখক, তাঁর ওপরে হামলা হয়। হুমায়ূন আজাদের মতো তাঁর ঘাড়েও ঠিক ছুরি দিয়েই হামলা হয়েছিল। নগিব মাহফুজ বেঁচে গিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর হাত দিয়ে লেখার ক্ষমতা তারপর থেকে বিলুপ্ত হয়। তিনি এখন আর হাত দিয়ে লিখতে পারেন না। তিনি মুখে বলেন এবং তার ভিত্তিতে অন্যরা লেখেন। সেভাবেই তিনি লেখার কাজ অব্যাহত রেখেছেন। নগিব মাহফুজকে যে আক্রমণ করেছিলো সেই লোককে পরে ধরা হয়েছিল। এবং সনাক্ত করা হয়েছিল যে, সেই লোক একটি ইসলামী গ্রুপের সদস্য।

নগিব মাহফুজের একটা বই নিয়ে বিভিন্ন ওয়াজে বিভিন্ন সময়ে বলা হতো- ইসলাম বিরোধী, ধর্ম বিরোধী। সেই আক্রমণকারীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আপনি কি সেই বই পড়েছেন? তার উত্তর ছিল, 'আমি এই বই পড়ি নাই'। যে বই তিনি পড়েন নি সেই বই লেখার অপরাধে কিন্তু তিনি একজন মানুষকে খুন করার জন্য আক্রমণ করেছিলেন। 'কী কারণে আপনি তাকে খুন করার জন্য আক্রমণ করলেন?' 'আপনি কোত্থেকে এই লেখক সম্পর্কে জানলেন?' তার বক্তব্য ছিল যে, আমি আমার যে ধর্মীয় নেতা তার বিভিন্ন সময়ের বক্তব্য, ওয়াজ এবং ধর্মীয় যে সমস্ত বয়ান সেগুলোর থেকে এ সিদ্ধান্তে এসেছি। তাহলে এটা একটা পরিবেশ- যে পরিবেশের মধ্যে এরকম হতে পারে যে, একজন আরেকজনকে না চিনে না জেনে, ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ না থাকা সত্ত্বেও তার মধ্যে এরকম হিংস্রতা তৈরি হতে পারে, কিংবা এরকম একটা বোধ তৈরি হতে পারে যে, একজন মানুষকে খুন করা তার জন্য ফরজ কিংবা মানুষকে খুন করাটা তার আর একটা বড় ধরনের নৈতিক দায়িত্ব। কেননা তাকে খুন না করলে বড় ধরনের একটা বিপর্যয় হচ্ছে- সমাজে কিংবা ধর্মে। এই ব্যাখ্যাটি তার মাথায় নিশ্চয়ই কোন না কোনভাবে এসেছে। এবং তার ফলেই তার এই আচরণ।

হুমায়ুন আজাদের উপরে কারা আক্রমণ করেছিল তা আমরা জানি না। এরকমেরই কেউ কিনা, ওয়াজ শুনে বা বয়ান শুনে যার মধ্যে হিংস্রতা এসেছে সেটা আমরা জানি না। কিংবা এরকম কি হতে পারে যে আরও কোন বড় খেলা, রাজনৈতিক গেম কিংবা ফ্যাসিবাদী কোন ধরনের নকশার গুটি হিসেবে এই ধরনের একটা কাজ হয়েছে বা এরকম উন্মাদনা ব্যবহার হয়েছে? সেই প্রশ্নটিও তোলা দরকার। এসব আক্রমণ, আতংক সৃষ্টি বোমা হামলার একটা সমাধান আমরা যেটা হচ্ছে 'রাজাকার' 'আলবদর'-দের বিরুদ্ধে 'মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তির' ঐক্যবদ্ধ হওয়া। সেগুলো কতটা কার্যকর- সেটা এই ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপকে সামাল দিতে পারবে কিনা সেটা একটা বড় প্রশ্ন। প্রশ্নটা আরেক প্রশ্নের সঙ্গে জোড়লাগা। সেটা এই যে, এই শক্তিটা কীভাবে বিকশিত হল এদেশে? এই প্রবণতাগুলো কীভাবে শক্তিশালী হলো যেখানে মত-পথের কিংবা ভিন্নমত তরিকার প্রতি চরম অসহিষ্ণুতা এখন রীতিমতো একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে?

একই ধর্মের নানা ধারা

গত ৩০ বছরে বাংলাদেশে ধর্মীয় রাজনৈতিক গোষ্ঠী এবং ধর্মীয় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, ধর্মীয় মতাদর্শ- ধর্মীয় মতাদর্শকে ঘিরে বিশেষ ধরনের কিছু গোষ্ঠী শক্তিশালী জায়গায় এসেছে। এই গোষ্ঠীগুলো যে চিন্তাভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গিগুলো ধারণ করে সেগুলো খুবই অসহিষ্ণু, আগ্রাসী। প্রচলিত ধর্মে অবিশ্বাসী যারা, তাদের প্রতি একটা অসহিষ্ণুতা তো আছেই; কিন্তু ধর্মে বিশ্বাসী যারা তারাও এই অসহিষ্ণুতার শিকার। ধর্মে বিশ্বাসীদের মধ্যে যদি কেউ একটা নির্দিষ্ট ধারার বাইরে হয় তারাও এই আক্রমণের শিকার হতে পারে। যেমন- আহ্মদিয়াদের অসুমলিম ঘোষণা করা বেশকিছু ইসলামী গ্রুপের প্রধান দাবী এবং প্রধান ব্যস্ততা। আহ্মদিয়াদের অমুসলিম ঘোষণা করার দাবী পাকিস্তানে পূরণ হলেও বাংলাদেশ সরকার এখনও পুরণ করে নাই। কিন্তু তাদের সমস্ত প্রকাশনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

অথচ আহমদিয়ারা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ এক এবং হযরত মুহম্মদ তাঁর প্রেরিত রসুল অর্থাৎ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। তার মানে যেটা মুসলমান হবার জন্য প্রধান শর্ত, সেটা আহমদিয়ারা বিশ্বাস করেন। এবং এখন তাঁরা আরও যোগ করেছেন, বলেছেন, তাঁরা নবী মুহম্মদকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হিসেবেও বিশ্বাস করেন, এটা হচ্ছে তাঁদের ব্যাখ্যা। কোরান তারা বিশ্বাস করেন, হাদিস তাঁরা বিশ্বাস করেন। সেখানে তাঁদের পার্থক্য হচ্ছে যে, আহমেদ-গোলাম আহমেদ বলে একজনকে তাঁরা মনে করেন বর্তমান সময়ের জন্য তাঁদের পথ প্রদর্শক। এখন মুসলমান হিসাবে তারা কোরানে বিশ্বাস করেন, হাদিসে বিশ্বাস করেন, কিন্তু তাঁরা মুসলমান হিসাবে নিজেদের পরিচয় রাখতে পারবেন না, এবং মুসলমান হিসাবে তারা নিজেদের কোন প্রকাশনাও করতে পারবেন না। কারণ যারা

এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ কিংবা শক্তিশালী তাঁরা মনে করেন যে, ওরা মুসলমান না। সুতরাং তারা দাবী করছেন রাষ্ট্রের কাছে যে, তাকে অমুসলমান ঘোষণা করতে হবে, তারা কোন প্রকাশনা করতে পারবে না। তাহলে এটা একটা পরিস্থিতি যে পরিস্থিতিতে মুসলমান হয়েও অবস্থান নিরাপদ হয় না।

পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা আমরা জানি। পাকিস্তানে একজন আহমদিয়ার মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল কারণ সেই আহমদিয়া ব্যক্তি কোরান শরীফ পাঠ করেছিলেন, এই অপরাধে তাঁর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়েছিল। কোরান শরীফ পাঠ করছিলেন তাও বাইরে না, ঘরের মধ্যে, সেটা অন্য আরেকজন লোক শুনেছিল, শুনে তার বিরুদ্ধে মামলা করেছিল। যেহেতু পাকিস্তানে আহমদিয়ারা অমুসলিম সুতরাং সে কোরান শরীফ পড়তে পারে না, পড়লে 'ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ধর্মানুভূতিতে আঘাত দিয়েছে' মর্মে তার বিরুদ্ধে মামলা সম্ভব। তার শাস্তি হবে- ব্লাসফেমি আইন অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড। পরে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয় নাই, কিন্তু তার দীর্ঘকালীন হাজতবাস নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। পাকিস্তানে আহমদিয়াদের ওপরে এর আগে আক্রমণ হয়েছিল সেটার নেতৃত্ব দিয়েছিল জামায়াতে ইসলামী এবং এজন্য মাওলানা মওদুদীর মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল, কার্যকর হয় নাই অবশ্য। একটা গণহত্যার মতো ঘটনা ঘটেছিল সে সময়ে।

অন্যান্য ধর্মের মতো ইসলাম ধর্মেও নানা ভাগ। কিন্তু এই ভাগটাই শেষ নয়। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত সুন্নী-শিয়া বিরোধটা ওই রকম আকার ধারণ করে নি যেমন পাকিস্তানে হয়েছে; শিয়া এবং সুন্নীর সংঘাত সেখানে খুবই নিয়মিত ঘটনা। সুন্নীরা সেখানে শক্তিশালী, শিয়ারা সংখ্যালঘু। শিয়া মসজিদের উপরে হামলা হয়েছে বহু, প্রচুর শিয়া এর মধ্যে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন আক্রমণে নিহত হয়েছেন। শিয়ারাও কিছু-কিছু আঘাত করেছেন। সুন্নী-শিয়ার বাইরে আবার সুন্নীদের ভেতর বিভিন্ন ধরনের মাযহাব আছে। আবার লা-মাযহাবও আছে। আবার মাযহাবীদের মধ্যে বিভিন্ন রকম তরীকা আছে সেগুলোর মধ্যেও বিভিন্ন রকমের ভাগ আছে এবং একটা গোষ্ঠী আরেকটা গোষ্ঠীকে খাঁটি মুসলমান হিসাবে স্বীকার করেন না। কেউ কেউ অন্যকে কাফের বলে সম্বোধন করে। তাহলে এটা একটা আবহাওয়া যা শুধুমাত্র এরকম না যে, ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বাইরে যারা, যারা ধর্মে অবিশ্বাসী তাদের জন্য ভীতিকর কিংবা আতংকের, তা নয়। এমনকি যারা বিশ্বাসী বলে নিজেদের মনে করেন তারা নিজেরাও যদি সংখ্যায় কম হন কিংবা শক্তিতে দুর্বল হন বা রাজনৈতিক প্রভাব কম থাকে তাহলে তাদের অবস্থানও ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। নিজেদের প্রচার প্রকাশনা, মত প্রকাশ, চিন্তার স্বাধীনতাটাও এখানে নিরাপদ থাকে না। যে কোন সময়ে যে কোন ধরনের হুমকি, উস্কানি এমনকি আক্রমণের শিকার হওয়া সম্ভব। যদি আহমদিয়ারা

আজকে বাংলাদেশে অসুমলিম ঘোষিত হন পরবর্তীকালে শিয়াদের ক্ষেত্রে হয়তো হবে সমস্যা। তারপর আরও, আরও.......।

আমরা জানি চরমোনাই এবং দেওয়ানবাগী খুব সহিংস সংঘাত হয়েছে। ইসলামী ঐক্য জোটের মধ্যেই বিভিন্ন ভাগ আছে, উত্তেজনা আছে। ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন এবং ইসলামী ঐক্যজোটের মধ্যে সমস্যা আছে। বিভিন্ন পীরের মধ্যে সমস্যা আছে, সংঘাত আছে। ধর্মের কাঠামোর মধ্যেই বিভিন্ন ব্যাখ্যার জন্য পার্থক্য তৈরি হয়। অসহিষ্ণুতা থেকে সহিংসতা তৈরি হয়।

প্রশ্ন আসে, একটা সমাজে কি এরকম পরিস্থিতি থাকতে পারে- এরকম একটা পরিস্থিতি কি আমরা স্বাভাবিক বলে মনে করতে পারি যেখানে একজন মানুষ তার ধর্মবিশ্বাসের জন্য আঘাত প্রাপ্ত হয়? আক্রান্ত হয় ধর্মবিশ্বাসের জন্য কিংবা ধর্মে অবিশ্বাসের জন্য কিংবা ধর্মে সংশয়ের জন্য? আখতার হামিদ খানের কথা হয়তো কেউ কেউ মনে করতে পারেন, পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত বড় আমলা একজন, বাংলাদেশের কুমিল্লা একাডেমীর মহাপরিচালক ছিলেন। অনেক বয়:বৃদ্ধ অবস্থায় তাঁর বাড়িতে বেশ কয়েকবার হামলা হয়েছে। কারণ তিনি পাকিস্তানে জারিকৃত হুদুদ আইন এবং অন্যান্য নিপীড়নমূলক ধর্মীয় আইনের বিরোধিতা করেছিলেন। সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউল হকের সময়ে এমন অনেক ধরনের আইন হয়েছিল যেগুলি পাকিস্তানে ধর্ম বিশ্বাসীদের জীবনকেও অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। নারীর অবস্থা তো বটেই।

এতোক্ষণ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে কথা হল। কিন্তু এ থেকে এরকম ভাবার কোন কারণ নেই যে, এই ধরনের পরিস্থিতি শুধু মুসলিম প্রধান অঞ্চলে বিরাজ করছে। বিভিন্ন অঞ্চলে অন্যান্য ধর্মের প্রভাবের আওতায়ও এরকম চিত্র কিংবা কোথাও কোথাও আরও ভয়াবহ চিত্র বিরাজ করে। যাকে হিন্দু ধর্ম বলা হয়, তা বস্তুত বহুমতের একটা মিশ্রণ, বহু ধর্মের সমষ্টি আসলে। এই বহুধর্মের সমষ্টি হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে যে বিভাজন সেই বিভাজনটা হচ্ছে প্রধানত জাত বা কাস্ট বা বর্ণ অনুযায়ী। উচ্চবর্ণ, নিম্নবর্ণ ধরে প্রধানত চারভাগ, তার মধ্যে আরও অনেক উপভাগ।

হিন্দু সমাজে এগুলোর বাইরে আর একটা বড় জনগোষ্ঠী হচ্ছে 'বর্ণহীন' যাদেরকে গান্ধী খুব আদর করে নাম দিয়েছিলেন হরিজন। হরিজন মানে হচ্ছে হরি'র জন। হরি'র সাথে সম্পর্কিত মানে ভগবানের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত মানুষ। হরিজন নাম দেওয়ায় তাদের সামাজিক অবস্থানের যে খুব পরিবর্তন হয়েছে তা নয়। সামাজিক অবস্থান যেখানে ছিল সেখানেই আছে, নামটা হরিজন হয়েছে। এবং সামাজিকভাবে তারা এখনও অচ্ছুত। এবং সারা ভারতে বর্ণবাদী হামলায়

নিম্নবর্ণের বা অস্পৃশ্য মানুষ যতো মারা গেছে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় মুসলমান তত মারা যায় নাই।

গুজরাটসহ বিভিন্ন অঞ্চলে দাঙ্গায় বহু রক্তাক্ত অধ্যায় তৈরি হয়েছে ভারতে। গুজরাটে সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর যে নারকীয় নির্যাতন হয়েছে তার তুলনা ইতিহাসে কমই পাওয়া যাবে। ভারতে বিভিন্ন সময়ে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় দুই ধর্মের যতলোক মারা গেছে তার থেকে অনেক বেশি মারা গেছে একই ধর্মের মধ্যেই বর্ণবাদী বিভিন্ন ধরনের হামলা এবং নির্যাতনে। আর সামগ্রিকভাবে-ধারাবাহিকভাবে তাদের ওপরে যে নির্যাতন সেটাতো অব্যাহতই আছে, যে জীবন যাপন করেন নিম্নবর্ণের মানুষ সেটাকে কোনমতে মানুষের জীবন বলা যায় না।

আমরা ইউরোপে খ্রীস্টান ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে দেখেছি ভয়ানক অনেক বর্বর অধ্যায়। সেইখানে একসময়ে চার্চ এবং রাষ্ট্রের সম্মিলনের ফলে সারা ইউরোপে কত হত্যাকাণ্ড হয়েছে - কত গণহত্যা হয়েছে এমনকি ডাইনি নাম দিয়ে কত লক্ষ লক্ষ নারীকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে, সেই পর্বগুলো অনেকসময় স্মরণে থাকে না। এখনও ইউরোপে ক্যাথোলিক প্রটেস্টান্ট সংঘাত বিরাজমান আছে। এছাড়া খ্রীষ্টান ইহুদী সংঘাত, আবার মুসলিম বিদ্বেষ এগুলো নানাভাবে কাজ করে। বিশ্বব্যাপী মার্কিনী বর্বর আগ্রাসনে ঈশ্বর আর ধর্মের নামাবলী ব্যবহার ক্রমাগত বাড়ছে।

এরকম বিশ্ব পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের জায়গা কোনটা? ধর্মকে আমরা কীভাবে দেখব এবং কীভাবে দেখব ফ্যাসিবাদকে? ফ্যাসিবাদ কি একটা রাষ্ট্রের ভেতরের ব্যাপার নাকি তার সঙ্গে আন্তজার্তিক যোগসূত্র আছে? এবং সেটাকেই বা আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি? লেখকের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা? মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা তরলভাবে এই কথাগুলো প্রায়ই উচ্চারিত হয় কিন্তু এটাকে কে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করেন তার ওপরে নির্ভর করে এর প্রকৃত অর্থ। বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা ধারণার একটা বড় ধরনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে, এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা তার সঙ্গে রাষ্ট্রের বা ক্ষমতার উজ্জ্বল সংঘাত দেখি।

বুদ্ধিবৃত্তিক সৃজনশীলতা ও প্রশ্নের পরিসর

বৃদ্ধিবৃত্তিক চর্চা মানে হচ্ছে যা একজনের জীবন-জগত সম্পর্কিত বোধকে বিশ্লেষণ করার মধ্যে দিয়ে তৈরি হয়। বিশ্লেষণ বা প্রশ্ন- প্রশ্ন এবং বিশ্লেষণ ব্যাপারটাই হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত মত, পথ, যে বিশ্বাস ইত্যাদিকে চ্যালেঞ্জ করা। কারণ প্রশ্ন মানেই হচ্ছে বিদ্যমান যা কিছু তাকে আর পুরোপুরি স্বীকার না করা। স্বীকার না করা মানেই হচ্ছে তার মধ্যে একটা চর্চা সজীব থাকা। আর সেটাই বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা, চিন্তার চর্চা, সৃজনশীলতার একটা চর্চার সূত্রপাত করে। এবং যখনই বুদ্ধিবৃত্তিক

চর্চার প্রশ্ন আসে তখনই সেখানে একটা বিরোধিতার প্রশ্ন আসে, ক্ষমতার সাথে তার একটা সংঘাতের প্রশ্ন আসে। প্রশ্ন আসে সামাজিক দায়ের। মানে একজন যখন চিন্তা করে, কি কারণে সে করে? চিন্তাটা করে কারণ যে সমাজে সে বসবাস করে, যে চারপাশ-পরিপার্শ্বিকতার মধ্যে সে বসবাস করে সেই পরিপার্শ্বিকতা তার কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। কিংবা তার কাছে নানারকম প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। সুতরাং সে সেই প্রশ্নগুলো উত্থাপন করে একটা চ্যালেঞ্জ উত্থাপন করে কিংবা অনুসন্ধান করতে থাকে।

এই অনুসন্ধান-অনুসন্ধিৎসা-প্রশ্ন-বিশ্লেষণ এইগুলো বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতার সঙ্গে খুব ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। এটার একটা প্রধান দিক হচ্ছে সামাজিক দায়, সে সামাজিক একটা দায় অনুভব করে, শুধুমাত্র ব্যক্তির দায় নয়-অন্য অনেকের জন্য, তার নিজের বোধে অন্য অনেকের চাপা বোধ প্রতিফলিত হয়। সে একক ব্যক্তি হলেও একটি নির্দিষ্ট সময়ে আসলে যে কাজগুলো করে, যদিও অনেকে তখন তাকে ভোট দিয়ে নির্বাচন করে নাই সমষ্টির প্রতিনিধি হিসাবে, কিন্তু বাস্তবে সে সমষ্টিকে প্রতিনিধিত্ব করে। বরঞ্চ এমনও হতে পারে যে সমষ্টির মধ্যে সে বসবাস করে সেই সমষ্টি তার সঙ্গে একমত নয় এবং তার উপরে খড়্গহস্ত। তারপরেও সে ওই সমষ্টিকেই প্রতিনিধিত্ব করে কারণ সেই সমষ্টির যে শৃঙ্খল কিংবা বন্ধ্যাত্ব সেটাকেই সে প্রশ্ন করছে। সুতরাং সে সেই হিসেবে সমষ্টিরই প্রতিনিধি। এই কথা চিন্তা এবং কাজ যখন সে করতে থাকে তখন যে প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতা, তার সাথে তার সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। ক্ষমতার সাথে তার সংঘাত অনিবার্য হবে; সেই ক্ষমতা রাষ্ট্রক্ষমতা তো হতেই পারে, ধর্মীয় ক্ষমতা হতে পারে - সামাজিক ক্ষমতা হতে পারে, সামাজিক যে বিভিন্ন ধরনের শ্রেণী ও গোষ্ঠীগত ক্ষমতা সেগুলো হতে পারে। সেই সমস্ত ক্ষমতার সঙ্গে সংঘাতটা সরাসরি হয়ে যায় এবং এইসব কিছু মিলে প্রতিষ্ঠিত যে বিশ্বাস সেই বিশ্বাসকে সে নাড়া দিতে থাকে।

চারটি শর্ত ও ভারত চীন আমেরিকার ধ্বংসযজ্ঞ

এই বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা, বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা কিংবা সৃজনশীলতা এগুলো নির্ভর করে অনেক বিষয়ের উপর। আমরা চারটি দিককে এর মধ্যে সনাক্ত করতে পারি। এগুলো হলো : সামাজিক দায়, সমষ্টির প্রতিনিধিত্ব, ক্ষমতার সঙ্গে সংঘাত এবং প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসকে প্রশ্ন করা। এইগুলোকে ধারণ করেই বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার জায়গাটা গড়ে ওঠতে পারে এবং বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতার প্রশ্ন আসে। এটা ঠিক এরকম না যে, এই বিষয়টি এই সময়েই উত্থাপিত হচ্ছে মাত্র। মানুষ যখন থেকে চিন্তা করা শুরু করে - মানুষ যখন থেকে চিন্তা করতে সক্ষম হয় এবং চিন্তার মধ্য দিয়ে সে নতুন জিনিস বুঝতে উপলব্ধি করার ক্ষমতা অর্জন করে তখন থেকেই এই সংঘাতের

জায়গা তৈরি হয়েছে। সমাজের একটা ক্ষুদ্র কিন্তু ক্ষমতাশালী অংশ তাদের ক্ষমতা রক্ষা করা চেষ্টা করেছে আর কেউ কেউ সৃজনশীলতা, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, চিন্তা -বোধ আর সর্বোপরি সংবেদনশীলতা দিয়ে সেই প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার যে ক্ষয়, সেটার যে স্ববিরোধ, সেগুলোকে চিহ্নিত করে নতুন আরেকটা সম্ভাবনা দেখার চেষ্টা করেছে।

এই সংঘাত অতএব মানুষের ইতিহাসে দীর্ঘদিনের। সেই কারণে আমরা যাদেরকে ধর্মের প্রবর্তক হিসেবে জানি তারাও একটা পর্যায়ে এই বুদ্ধিবৃত্তির চর্চারই সৈনিক ছিলেন, বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে নতুন স্বাধীনতার প্রবর্তক ছিলেন। বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চারই এক একজন বড় মাপের প্রতিনিধি তাঁরা। ধর্ম, লোকজ্ঞান, দর্শন বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন চিন্তার চর্চা আমরা দেখি। যেমন আমরা খনার বচনের কথা জানি। এই খনা হচ্ছেন আমাদের ইতিহাসে, আমাদের জানা ইতিহাসে, এই অঞ্চলের ইতিহাসে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ও স্বাধীনতার উপরে বড় ধরনের ফ্যাসিবাদী হামলার শিকার মানুষের একটা বড় দৃষ্টান্ত। তিনি নারী ছিলেন এবং তাঁর সম্পর্কে যতদূর জানা যায় তিনি নতুন নতুন পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, চিন্তা, ভাবনা মানুষের সামনে উপস্থিত করতেন। এখন হয়তো তার সঙ্গে অনেক কল্পকথা যোগ হয়েছে, অলৌকিকত্ব যোগ হয়েছে; কিন্তু তার যে প্রজ্ঞা, তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি বিবেচনা-প্রশ্ন বিশ্লেষণ ক্ষমতা অসাধারণত্ব তাতে খর্ব হয় না। চিন্তা ও বিশ্লেষণের অসাধারণ ক্ষমতা থাকার ফলেই, সমাজ ক্ষমতা সেই সময় খনার সেই ক্ষমতাকে ধারণ করতে পারে নাই কিংবা হুমকি বোধ করেছে। সেই কারণে খনার জিহ্বা কেটে নেওয়া হয় এবং তারপর থেকে তিনি আর কথা বলতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁর যে বচন সেগুলো আমাদের সমাজে পরম্পরায় রয়ে গেছে। আরও কত বিভিন্ন অঞ্চলে কত লেখক শিল্পী কিংবা চিন্তাবিদ এরকমভাবে আক্রান্ত হয়েছেন, আত্মাহুতি দিয়েছেন তা আমরা জানি না। বহু জায়গায়-বহুদেশে-বহুকালে।

যেমন চীনের কথা বলি। খ্রিস্টপূর্বকালের কথা, বিদ্যাচর্চা তখন সেখানে তুলনায় বেশ, চীনে নতুন-নতুন গবেষণা হচ্ছে- নতুন নতুন চিন্তা দানা বাঁধছে। সেই সময় ইউরোপে অন্ধকার, কিন্তু ভারত এবং এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে তখন খুব সমৃদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা হচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বৌদ্ধ বিহারগুলোতেও তখন বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানচর্চা হচ্ছে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃথিবীর প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়, সেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ-জন এসে লেখাপড়া করেছেন। সেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা আমাদের এদিকে শালবন বিহার কিংবা মহাস্থানগড় এই সমস্ত জায়গাগুলি ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার তখন তীর্থস্থান। মানে দুই আড়াই হাজার বছর আগেও এ জায়গাগুলো ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় অনেক অগ্রসর।

প্রাচীন রাজধানী পুন্ড্রনগরী বা মহাস্থানগড়ে এখন তো সে চিহ্নগুলো রাখাই হচ্ছে না কারণ অনেক জায়গায় যে নির্মাণ প্রভৃতি ছিলো সেগুলো থেকে ইট কোথায় যাচ্ছে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নাই। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দায়িত্ব যদি পুলিশ অফিসারকে দেয়া হয়, বোঝা যায় সরকারের এবিষয়ে আগ্রহ কেমন। সুতরাং তাদের ধরন অনুযায়ী যা-যা হওয়া দরকার সেগুলোই হচ্ছে এবং ইট-পাথর যা-যা ছিল তা বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে। সেই সমস্ত জায়গায় বিভিন্ন ধরনের নির্মাণ হচ্ছে; একটা জায়গায় আবার মসজিদও বানানো হচ্ছে। মসজিদের এক্সটেনশন হয়েছে যার ফলে ওই জায়গাটায় আর কোনদিন খননও চালানো যাবে না। সুতরাং আমরা জানতেও পারব না ওই জায়গাটায় আসলে কী ছিল বা আছে।

এ সমস্ত স্থান প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার খুব বড় ধরনের কেন্দ্র। চীনেও সে রকম ছিল। সেই সময়ে অনেক লেখালেখি হচ্ছে, প্রশ্ন উত্থাপন করা হচ্ছে রাষ্ট্র নিয়ে, অর্থনীতি নিয়ে- সমাজ নিয়ে। এক পর্যায়ে সম্রাট এবং ক্ষমতাবান গোষ্ঠীর মনে হল যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাটা 'মাত্রা' ছাড়িয়ে যাচ্ছে; বিজ্ঞানী দার্শনিক লেখক, তারা যে সমস্ত চিন্তা-ভাবনা করছেন, লেখালেখি করছেন সেগুলো ক্ষমতার জন্য বিপজ্জনক। তখন তো কাগজ ছিল না। তখন লেখা হতো পাতার উপরে। তখন জ্ঞান-চর্চা এতো বিশেষায়িত হয় নি। তখনকার জ্ঞানচর্চার ধরনই এরকম যে, একজন যিনি জ্ঞানী তিনি সব বিষয়েই জ্ঞানী। যিনি চর্চা করছেন- বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, তারপর সাহিত্য সবকিছু একসাথেই তখন চলতো। একটা পর্যায়ে সেই পণ্ডিত ব্যক্তিদের সাথে রাষ্ট্র সংঘাত অনুভব করলো। সম্রাট সিদ্ধান্ত দিলেন যে, সবগুলো বই নিয়ে আসো, নিয়ে এসে একটা গর্তের মধ্যে সেগুলো ভরো। আর যত পণ্ডিত এর মধ্যে আছে যারা ভক্তি প্রদর্শন করে নাই, নতজানু হয় নাই, আত্মসমর্পণ করে নাই তাদেরকেও ধর। এবং সবাইকে ধরা হলো, সেই সমস্ত গর্তের মধ্যে পণ্ডিত আর তাদের সব রচনা ফেলে একসাথে জীবন্ত কবর দেয়া হলো। ওই ইতিহাস তো শেষ! ওইখানে কি লেখা হয়েছিল? জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা সেখানে কতদূর অগ্রসর হয়েছিল আমরা জানি না। ওইটার সমাপ্তি হয়ে গেছে ওইখানেই!

আমেরিকা নামে যে দেশটি এখন পরিচিত সেটি প্রকৃতপক্ষে সম্প্রসারিত ইউরোপ। আদিতে আমেরিকা যেটা ছিল সেটা দখল করেছে ইউরোপ। ১৪৯২ সাল থেকে যার দখল পর্ব শুরু হয়। কলম্বাস দিয়ে যার শুরু। লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা আর সভ্যতা ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় দস্যু দখলদাররা যে আমেরিকা দখল করলো- সেটা একটা বিশাল সভ্যতা ছিল। ক্রমান্বয়ে পরিষ্কার হচ্ছে যে, সেখানে কী বিশাল সভ্যতা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। সেখানে ধর্ম-রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান, তাদের যে রীতিনীতি প্রথা-বিশ্বাস, তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার যে মাত্রা সেগুলো ইউরোপ থেকে

অনেক উচ্চমাত্রায়। একটা জায়গায় তারা খাটো ছিল সেটা হচ্ছে যুদ্ধ-অস্ত্র। অস্ত্র এবং যুদ্ধে মোকাবেলা করতে পারে নি বলেই তারা ইউরোপের কাছে পরাজিত হয়েছে। কারণ ইউরোপিয়ানদের কাছে গান পাউডার ছিল, যেটা তাদের কাছে ছিল না। গান পাউডার, বন্দুক এবং তার সঙ্গে দখলের জ্ঞান-কৌশল-অর্থনীতি সেইগুলো দিয়েই একের পর এক দখল করে পুরোনো সভ্যতা পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়। সুতরাং আমেরিকায় যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা সেটাও কিন্তু আমরা ঠিকমত জানি না।

আর ভারতবর্ষেও ব্রাহ্মণ্যবাদের আধিপত্য বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ও স্বাধীনতার পথে ছিল বরাবর প্রতিবন্ধক। গৌতম বুদ্ধের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা, নতুন চিন্তা, জীবন কাঠামো ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্যবাদী-বর্ণবাদী যে সংস্কৃতি কিংবা আধিপত্য সেটা থেকে মুক্ত করে মানুষকে। মানুষের মধ্যে তা ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে একটা জায়গা তৈরি করেছিল। পরবর্তী সময়ে তার একটা পাল্টা প্রতিক্রিয়া হয় এবং ব্রাহ্মণ্য শাসকেরা ক্রমান্বয়ে গণহত্যা এবং বর্বর হত্যাকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে বৌদ্ধ প্রতিরোধের সব চিহ্ন ধ্বংস করে। কিছুদিন আগে আমি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশেই বুদ্ধগয়া- যেখানে গৌতম বুদ্ধ ধ্যান করেছিলেন বলা হয় সে জায়গাটা আছে। তিনি মারা গেছেন সেই জায়গাটা আছে। সেই বৃক্ষ, যে বৃক্ষের নীচে তিনি বসেছিলেন সেটা আছে।

কিন্তু অবাক কান্ড হল, তার সামনে বিশাল যে মন্দির বৌদ্ধ মন্দির- সেই বৌদ্ধ মন্দিরের গায়ে লাগানো সব হচ্ছে হিন্দুদের দেবতা। কী করে আসে? হিন্দুদের দেবতা তো বৌদ্ধ মন্দিরের গায়ে থাকার কথা না! আছে এই কারণে যে, ওই বৌদ্ধ মন্দির হয়ে, একটা পর্যায়ে যখন তারা মোটামুটিভাবে নিজেদের অবস্থান তৈরি করেছে তারপরেই সেখানে হামলা হয়েছে, হামলা হয়ে সমস্ত বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলো হিন্দু প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবার চেষ্টা হয়েছে। এবং এক পর্যায়ে তো গৌতম বুদ্ধকেও অবতার- মানে হিন্দুদেরই আরেকটা অবতার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। মানে তাকে হজম করে ফেলা হয়; তার ফলে ওই ব্রাহ্মণ্য শাসন এবং নিয়ন্ত্রণ-বর্ণবাদী নিয়ন্ত্রণ, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় কোন ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করা, সেগুলোকে নিষিদ্ধ করা, সেটা হয়েছিল। ধর্মীয় শাস্ত্রমতে বিধানই তো ছিল যে, শুদ্ররা যদি বেদ পাঠ করে, তাহলে তার জিহ্বা কেটে নেয়া হবে। কিংবা কোন শুদ্র যদি তীর চালানো বা যুদ্ধ চালনা শিখতে যায় তাহলে তার আঙুল কেটে দেয়া হবে।

এ ধরনের অনেক কাহিনী আমরা সেই ইতিহাসের মধ্যে পাই। তার মানে প্রত্যেকটা পর্যায়ে মানুষের ইতিহাসে জানা অজানা, একটা অব্যাহত লড়াইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। যে লড়াইটা চলেছে, অসংখ্য মানুষ তার শিকার হয়েছেন। ভিন্নমত, ভিন্নপথ, ভিন্ন ব্যাখ্যা, ভিন্ন বিশ্লেষণ বা প্রশ্ন সামনে এনে ইতিহাসে বারবার অসংখ্য মানুষ নির্যাতিত হয়েছেন এবং তারপরেও এটা কখনই থামে নাই। মানুষের

ইতিহাসে এটা কখনই মাটি চাপা দেয়া যায় নাই, নিস্তব্ধ করা যায় নাই। এটাই মানুষের অন্তর্শক্তি। বুদ্ধিবৃত্তি বা সৃজনশীলতার জন্ম এখানেই।

ধর্মের ভেতর মুক্তির লড়াই

একজন ব্যক্তি হয়তো পরাজিত হতে পারেন কিন্তু ব্যক্তি পরাজিত হলেও সমষ্টি পরাজিত হয় না। সমষ্টির ধারাবাহিকতা চলেছে। এই ধারাবাহিকতায় আমরা দেখি যে, যে সমস্ত ধর্মকে আমরা পরবর্তীতে নিপীড়ক অস্ত্রের অবস্থানে দেখি এই ধর্মগুলিই আদিকালে ঠিক এরকম বিদ্রোহ হিসাবে কিংবা মুক্তির সংগ্রামের একটা বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। আপনারা যদি ইহুদী ধর্মের কথা বিবেচনা করেন, ইহুদী ধর্মের উদ্ভবটা আসলে হচ্ছে দাস বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। দাসদের যে বিদ্রোহ সেই বিদ্রোহের নেতা হিসেবেই মুসা, যাকে আমরা ইহুদী ধর্মের প্রবর্তক হিসেবে জানি, তাঁর যাত্রা শুরু। তারপরে তার সাথে অনেক মিথ যোগ হয়েছে।

সাগর পার হওয়া- তারপরে সরে যাওয়া পানি আবার ফিরে আসা এ সমস্ত কল্পকথা জনপ্রিয়। এর সামাজিক পাঠ যদি করি তাহলে ফেরাউনের সাথে মুসার যে সংঘাত তা আসলে দাসদের সাথে মালিকদের সংঘাত। দাস মালিকদের সাথে দাসদের সংঘাতের মধ্যে মুসার অবস্থানটা ছিল নির্যাতিত দাসদের পক্ষে এবং দাসদের পক্ষে একটা শাসনব্যবস্থা কায়েম করা এবং দাস মালিকদের ও ফেরাউনের যে আধিপত্য সে আধিপত্যের বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্রোহকে ভাষা দান করাটা ছিল তাঁর ধর্মের মূল কথা। এবং ঈসার ব্যাপারেও, যিনি যিশু বলেও পরিচিত- তাঁর অবস্থানটা হচ্ছে সেই সময়কার যে শাসন ক্ষমতা কিংবা চর্চা বা বিশ্বাস সেটাকে প্রশ্ন করে দাঁড়ানো। এবং সে জন্যই বাইবেল-এ সে সময়ে বাইবেলে কিংবা ঈসার মুখ দিয়ে যে সমস্ত কথাবার্তা সেগুলো হচ্ছে গরীবের পক্ষে বা নিপীড়িতের পক্ষে। এবং তাকে ক্রুশবিদ্ধ হতে হয় সেই কারণেই। মানে যিশুর যে অবস্থান সেই অবস্থান যে শাসকদের জন্য কত বিপজ্জনক হুমকি হয়ে উঠেছিল সেটা তার ক্রুশবিদ্ধ হওয়া থেকে আমরা বুঝতে পারি। শাসকরা তাকে কোনভাবেই বাঁচিয়ে রাখতে রাজি হয় নাই। তাকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করেছিল।

পরবর্তীকালে আরব দেশে নবী মুহম্মদের ক্ষেত্রেও আমরা ঠিক একই ঘটনাই দেখি। ইসলাম ধর্মের উদ্ভবটাও ঠিক একইভাবে সেই সময়কার প্রতিষ্ঠিত যে ক্ষমতা, যে বিশ্বাস, যে নিপীড়নমূলক অবস্থা সেটার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা, সেটার থেকে বেরিয়ে, তার থেকে উন্নত ঐক্যবদ্ধ একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। ইসলাম ধর্মের ইতিহাস যদি আমরা পর্যালোচনা করি দেখব যে, সেই সময়ে যারা ইসলাম ধর্ম প্রথম গ্রহণ করছেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন নিম্নবর্গের মানুষ, কোন-না-কোনভাবে নিপীড়িত এবং তরুণ। তরুণ এবং নিপীড়িত যারাই প্রধানত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছেন তারা লড়াই করছেন কাদের সাথে? লড়াই

করছেন দাস মালিকদের সাথে- সম্পত্তিবান মালিকদের সাথে। এই লড়াই পরবর্তীকালে অন্যান্য স্থানেও অব্যাহত ছিল। জামায়াতে ইসলামী ইব্‌নে সিনার নামে বিরাট-বিরাট প্রতিষ্ঠান করেছে- এই ইব্‌নে সিনা তখনকার ক্ষমতাসীনদের দ্বারা যে কত নিগৃহীত হয়েছেন তার কথা কমই উচ্চারিত হয়। এবং অনেকে মুরতাদ হিসেবেও ঘোষণা করেছেন। ইমাম গাজ্জালীর উপরেও বড় ধরনের নির্যাতন হয়েছে, তাকে গ্রাম ছাড়া, দেশ ছাড়া হতে হয়েছে। ওমর খৈয়াম- ওমর খৈয়ামের পরিচয়টা আমরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কবি হিসেবে পাই- প্রেমের কবি। কিন্তু ওরম খৈয়ামের আসল পরিচয় হচ্ছে বিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিদ এবং দার্শনিক। সেই ওমর খৈয়ামের উপর পথে-ঘাটে চড়াও হয়ে মারপিট করা হয়েছে বহুবার। তার কারণ, ওমর খৈয়াম কিছু কথাবার্তা বলেছেন, যা ক্ষমতার জন্য বিপজ্জনক অতএব তাঁকে পাকড়াও কর, তাঁকে মারো।

দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত মুসলিম সভ্যতার মধ্যে বেশ একটা সমৃদ্ধ সময় ছিল। সেই সমৃদ্ধ সময়ে যারা নতুন-নতুন চিন্তা-ভাবনা নিয়ে আসছিলেন তাঁরা অনেক ধরনের হামলা-আক্রমণের শিকার হয়েছেন। এই মত-পথগুলোকে গ্রহণ করার মত অবস্থা যদি সমাজে থাকতো, তাহলে হয়তো পরবর্তী সময়ে তাদের এই ক্ষয় শুরু হতো না। শাসকেরা গ্রহণ করতে পারে নি নতুন চিন্তা, নতুন পথ, নতুন মত বা বিশ্লেষণ রীতি। এসব ব্যাপারে তাদের এতো ভীতি ছিল যে, তাদের দমন করেই তারা নিজেদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে, ক্ষমতাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। ইউরোপ এবং আরবের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় যেটাকে খ্রিস্টান এবং মুসলমান ধর্মযুদ্ধ হিসেবে বলা হয়। অনেকগুলো ধর্মযুদ্ধ হয়ে একটা পর্যায়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সন্ধি হলো- সন্ধি হয়ে শেষ হলো।

তারপর থেকেই ইউরোপের উত্থান, ইউরোপ আরব থেকে গ্রহণ করলো, আরব অন্যের থেকে তো নয়ই, নিজের থেকেও গ্রহণ করলো না। আরব নিজের জ্ঞান-বিজ্ঞানকেই অস্বীকার করলো। সেটা গ্রহণ করলো ইউরোপ, আরব থেকে। তা গ্রহণ করে বলেই ইউরোপের পরবর্তীকালে বিকাশ সম্ভব হয়। এই গ্রহণ করাটা ইউরোপেও তো সহজ হয় নাই। ইউরোপেও আমরা জানি যে, সব সময়ে রাষ্ট্র-ধর্ম এগুলোর সাথে বিদ্যাচর্চা, নতুন চিন্তার সংঘাত হয়েছে। সেখানে ধর্ম ছিল সরাসরি রাষ্ট্র ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত। এবং চার্চ নিজেই ছিল একটা বড় ভূ-স্বামী। সম্পত্তি মালিকদের একটা অংশ নিজেই। নিজে রাষ্ট্র ক্ষমতার অংশ এবং একই সাথে সম্পত্তি মালিকদের অংশ; রাষ্ট্র ক্ষমতা এবং চার্চ এই দুয়ের পারস্পরিক মৈত্রির ভিত্তিতেই সেখানে শাসন-শোষণ কিংবা নিপীড়ন চলতো। সুতরাং যে কেউ নতুন কথা বললে সেটা যদি রাজার বিরুদ্ধে যায়, ধরে নেয়া হতো এটা চার্চের বিরুদ্ধে, কেউ যদি চার্চকে সমালোচনা করে তাহলে ধরে নেয়া হতো এটা রাজার বিরুদ্ধে।

সুতরাং এ ধরনের নতুন চিন্তা যত এসেছে সবগুলোকেই ধরা হয়েছে রাষ্ট্রদ্রোহী এবং ধর্মদ্রোহী একইসঙ্গে। রাষ্ট্র আর ধর্ম যেহেতু একাকার সুতরাং রাষ্ট্রদ্রোহীতা মানেই ধর্মদ্রোহীতা- ধর্মদ্রোহীতা মানেই রাষ্ট্রদ্রোহীতা। ইউরোপে এই লড়াই বহুদিন পর্যন্ত চলেছে। এক হিসেবে পশ্চিমে এখনও তা চলছে। ওইখানে চার্চের মধ্যে থেকেই আবার একটা ভিন্ন ধারা তৈরি হয়। কোপার্নিকাস যখন বলেন যে, 'পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে'। এটাতো আমাদের কাছে এখন এতোই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার যে, এইটা নিয়ে যে কখনও কোন রক্তাক্ত সংঘাত হয়েছিল এটাই বিশ্বাস করা কঠিন হয়। কোপার্নিকাস যখন বললেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে তখন এটা ছিল একটা ভয়াবহ উক্তি। ভয়াবহ উক্তি ছিল এই কারণে যে, এটা চার্চের সমগ্র অস্তিত্বকে একটা নাড়া দিয়ে দেয়, এই উপলব্ধি চার্চের সমগ্র অস্তিত্বকে নেগেট করে, কারণ চার্চ বলছে, 'সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে'। চোখের সামনে তো সেটাই দেখা যায়, আমরা তো চোখে তাই দেখি। কেন চোখে যেটা দেখি তার থেকে অন্যটা হবে?

কিন্তু বিজ্ঞানী কিংবা অনুসন্ধানী তো চোখের সামনে যা দেখা যায় সেটাই বিশ্বাস করবেন না। তিনি আরও প্রশ্ন করবেন, আরো অনুসন্ধান করবেন। অনুসন্ধান করে সঠিক জায়গা দাঁড় করবার চেষ্টা করবেন। তো কোপার্নিকাস সেটা করেছিলেন এইং তা করার কারণে তাঁকে নিপীড়িত হতে হয়েছিল। আমরা ব্রুনোর কথা জানি, ব্রুনোকে বলা হয়েছিল যে, তুমি যে কথাবার্তাগুলো বলছো, সেই কথাগুলো তোমার প্রত্যাহার করতে হবে, বলতে হবে যে, এটা তোমার ভুল। ব্রুনো তা করতে রাজী হলেন না, তাঁকে বন্দী করা হলো। কয়েক বছর বন্দী থাকলেন ব্রুনো। বন্দী থাকার পরেও যখন ব্রুনো আত্মসমর্পণ করতে রাজি হলেন না তখন তাঁকে পুড়িয়ে মারা হলো।

ব্রুনো পুড়ে মরলেন। ব্রুনোর এই পুড়ে মরার কথাটা আমরা জানি, কিন্তু আরও কতজনের যে জানি না সেটাই আমরা জানি না। আরও অনেককে হয়তো পুড়িয়ে মারা হয়েছে; নির্যাতিত হয়েছেন, মারা গেছেন তাদের কারো কথা আমরা জানি না। গ্যালিলিওকেও বন্দী করা হলো। গ্যালিলিও বন্দী থাকলেন। এবং গ্যালিলিও অনেকখানি আত্মসমর্পণও করলেন। কিন্তু যেটা করলেন সেটা হচ্ছে, তাঁর সমস্ত কাজ যে গ্রন্থ, সেই গ্রন্থটা গোপনে ছাত্রের হাত দিয়ে বাইরে পার করে দিলেন। যার ফলে গ্যালিলিও সেখানে আটকে থাকলেও তাঁর কাজ যেটা- সেই কাজটা আমাদের কাছে এলো এবং এখনো পর্যন্ত আমরা তার সুফল পাচ্ছি। সুতরাং আমরা সর্বত্রই একটা ধারাবাহিক লড়াই দেখতে পাই, বিভিন্নভাবে। বুদ্ধিবৃত্তিক জগৎ চিন্তাজগৎ, মতপ্রকাশ, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, সব সময়ই ক্ষমতার সাথে তার একটা সংঘাত হয় এবং ক্ষমতাটা কী ধরনের সেটা নির্ভর করে সমাজব্যবস্থার স্তরের উপরে। আর চিন্তার স্তরটাও নির্ভর করে তার উপরে যে কোন স্তরে আমরা বসবাস করছি, নির্ভর করে সেখানে কোন ধরনের চিন্তা ক্ষমতার জন্য হুমকি হচ্ছে।

মুক্তির ধর্মতত্ত্ব

আমরা দেখি যে, ধর্মের মধ্যে- ধর্মের কাঠামোর মধ্যেই, ধর্মের কাঠামোর বাইরে তো আছেই- যারা চিন্তা করছেন, প্রশ্ন করছেন, বিশ্লেষণ করছেন তাঁদের সাথে ধর্মীয় ক্ষমতার একটা সংঘাত হচ্ছে। আবার একটি নির্দিষ্ট ধর্মের মধ্যেও আমরা দেখি যে, এই মতবিরোধের ফলে, ধর্মের মধ্যেও ধারার ভিন্নতা তৈরি হচেছ। ধর্মের মধ্যে এমন ধারাও তৈরি হতে পারে যে ধারা শাসকদের কিংবা সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে দাঁড়ায়- আবার এমন ধারা তৈরি হয় যারা শাসিত বা নিপীড়িতদের পক্ষে দাঁড়ায়। ক্রিশ্চিয়ানিটির মধ্যে আমরা গত কয়েক দশকে দেখেছি একটি ধারা বেশ ভালমত বিকাল লাভ করেছে যেটার নাম হচ্ছে লিবারেশন থিওলজি। তাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে যে, ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছে, সকল মানুষই হচ্ছে ঈশ্বরের সৃষ্টি, সুতরাং সেই সৃষ্টির কল্যাণ সাধন করাই হচ্ছে ঈশ্বরের কাজ করা। সৃষ্টির পক্ষে কাজ করা মানেই হচ্ছে ঈশ্বরের কাজ করা এবং যারা সৃষ্টিকে অর্থাৎ মানুষের উপরে নিপীড়ন করবে, নির্যাতন করবে তারাই হচ্ছে ঈশ্বরের কাছে অভিশপ্ত। সুতরাং তাদের বিরোধিতা করাটাই হচ্ছে পূণ্যের কাজ। এবং ধর্মের পথে কাজ মানে হচ্ছে অন্যায়ের বিরোধিতা করা, শোষণের বিরোধিতা করা, নিপীড়নের বিরোধিতা করা। এবং এই ধারা ক্রিশ্চিয়ানিটির মৌলিক দিকগুলো মানে, চর্চা করে নিবেদিত ভাবে কিন্তু তারপরেও ক্রিশ্চিয়ান পোপ কিংবা ক্রিশ্চিয়ান হায়ারার্কি তাদেরকে তাদের দলের লোক হিসাবে গ্রহণ করে না।

গুয়াতেমালা, নিকারাগুয়া, এল সালভেদর- এই দেশগুলোতে এই ধারার লোকজনের সংখ্যা অনেক বেশি। নিকারাগুয়ায় যে বিপ্লব হয়েছিল সেই স্যান্ডেনিস্টা বিপ্লবে এই ধারাটা খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। চিলি, হন্ডুরাস, ব্রাজিল এই দেশগুলোতেও তাদের ভূমিকা অনেক। কিছুদিন আগে পোপ কিউবা সফরে গেলেন। অনেকেই আতংকিত ছিলেন এই ভেবে পোপ কিউবায় গেলেই কিউবা বিপ্লবের অবসান ঘটবে। কিন্তু এই সফর কিউবার জনগোষ্ঠীর মধ্যে এটা তেমন কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নাই। কোন রকম আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে নাই। কারণ এই পুরো বিষয়টা তাদের কাছে জানা এবং জানা এই কারণে যে ক্রিশ্চিয়ানিটির যে ঐ বিপ্লবী ব্যাখ্যা তাতেই তারা অনেক বেশি অভ্যস্ত, ল্যাটিন আমেরিকায় সেই ধারাটাই অনেক শক্তিশালী। তার ফলে ওই রোমের পোপের যে ভার্সান অব ক্রিশ্চিয়ানিটি সেটা তাদের কাছে মোটেই গৃহীত হয়নি।

বিপ্লবী ধারার একজন ফাদার কিছুদিন আগে খুন হলেন। নিকারাগুয়াতে ওইরকম বেশকিছু ফাদার খুন হয়েছিলেন। স্যান্ডেনিস্টার আন্দোলনের সময়ে সমোজার বাহিনী গুপ্তঘাতকরা তাদেরকে খুন করে তাদের উপরে লাল কাপড় দিয়ে ঢেকে উপরে লিখে দিয়েছিল 'কমিউনিস্টদের দালাল'। কারণ তারা এই পুরো

বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে সক্রিয় ছিলেন। আর গুয়াতেমালার একজন বিশপ, বোধ হয় কিছুদিন আগে তাঁকে বন্দী করা হলো - তার জীবন সংশয় হয়েছিল, খুন হয়েছিলেন কিনা ঠিক এখন আমার মনে নাই-চেষ্টা হয়েছিল; তিনি বলেছিলেন, 'আমরা যারা ধর্মীয় নেতা, আমরা যদি দরিদ্রদের গিয়ে সেবা করি তাহলে আমাদের বলা হয় সেন্ট-পীর বা দরবেশ।' যেমন মাদারতেরেসা, তিনি গরীবদের কাছে যাচ্ছেন, সেবা করছেন। সারা বিশ্বের শাসকগোষ্ঠী এটাকে গ্রহণ করে, যে ঠিক আছে পীর, দরবেশ কিংবা মহান ইত্যাদি। কিন্তু ওই বিশপ আরও বলছেন, 'যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, দারিদ্র কেন হচ্ছে? আমরা যদি প্রশ্ন উত্থাপন করি দারিদ্র কেন হচ্ছে? দারিদ্রের কারণ কী? তখন আমাদের বলা হয় আমরা কমিউনিস্ট।' কেননা কারণ অনুসন্ধান করতে গেলেই যে বিদ্যমান ব্যবস্থা তা বিপদের মধ্যে পড়ে। তখন তারা বলে যে, এতো আর হুজুর নেই-দরবেশ নাই, কমিউনিস্ট-এ পরিণত হয়েছে।

ইসলাম ধর্মের মধ্যে, আমাদের দেশে, খুব তাৎপর্যপূর্ণ যে এই শোষণ-নিপীড়ণ বিরোধী যে বিশ্লেষণ তা একটা শক্তিশালী বা প্রতিষ্ঠিত ধারা হিসেবে দাঁড়াতে পারেনি। এখানে ইসলাম ধর্মের নামে সংগঠিত যে ধারাগুলো পাই, তাদের প্রায় সবগুলোই কোন না কোনও ভাবে শাসক-সাম্রাজ্যবাদ এবং নিপীড়ক এগুলোর সঙ্গেই সম্পর্কিত আছে কোন না কোনও ভাবে। একটা ধারা তৈরি হয়েছিল, একটা বিশাল ব্যতিক্রম হিসেবে, সেটা ব্যক্তি মাওলানা ভাসানী। যিনি ইসলাম ধর্মকে নিয়েই, ইসলাম ধর্মের বিশ্বাস নিয়েই, ইসলাম ধর্মেরই বিশ্লেষণ দিয়ে, একটা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী- শোষণ বিরোধী - নিপীড়ন বিরোধী- বৈষম্য বিরোধী ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এটাকে কোন একটা ধারা হিসাবে দাঁড় করাতে পারেন নাই। তিনি ব্যক্তি হিসেবেই ছিলেন।

বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক-সাংগঠনিক শক্তিগুলো আছে সেই শক্তিগুলোর অধিকাংশের ইতিহাস বলে, এদেশে শাসক রাষ্ট্রক্ষমতায় যারা অধিপতি মতাদর্শ ধারণ করে তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ভাবেই তারা সবসময় কাজ করেছে। এখন আমরা 'ইসলাম ভারসেস ওয়েস্ট' একটা কথা খুব শুনি, একটা বিশ্বাস দাঁড়িয়েছে যে, পশ্চিমের সাথে ইসলামের একটা সংঘাত হচ্ছে। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামপন্থী যে সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং গোষ্ঠী আছে, তাদের ইতিহাসটা কিন্তু ভিন্ন চিত্র দেয়। তারা এই দেশে (এটা জামায়াতে ইসলামী ও মওদুদীর ক্ষেত্রে আরও বিশেষভাবে সত্য) পাকিস্তানে এবং বাংলাদেশে বরাবরই সামরিক শাসকদের পক্ষে ছিল, বরাবরই তারা সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে ছিল। ১৯৭১ সালে সরাসরিভাবে যুদ্ধাপরাধী হিসেবেই অধিকাংশ ইসলামপন্থী দল এবং গ্রুপ কাজ করেছে। ব্যক্তি হিসেবে অনেক ধর্মীয় নেতা তার সঙ্গে একমত ছিলেন না; ধার্মিক এবং ধর্মবিশ্বাসী মানুষ তো পাকিস্তানী শাসনের বিরুদ্ধে কিংবা গণহত্যার

বিরুদ্ধেই ছিলেন, নিপীড়িত ছিলেন। কিন্তু ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলো বা ধর্মীয় রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলো প্রায় সবগুলোই পাকিস্তানী শাসন, সামরিক বাহিনীর গণহত্যা এবং সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের প্রজেক্টগুলোর সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিল।

তারা কি মৌলবাদী?

এখন এই ধর্মীয় গ্রুপগুলো যে কাজ করে তাদের 'মৌলবাদী' নামে ডাকা হয়- আমি এই জায়গাটায় একটু পরিস্কার করতে চাই। এই গ্রুপগুলোকে বোঝানোর জন্যে 'মৌলবাদ' ঠিক শব্দ বলে আমার মনে হয় না। আক্ষরিকভাবে মৌলবাদ শব্দটা তো এসেছে ক্রিশ্চিয়ানদের একটা 'ফান্ডামেন্টালিস্ট' কনফারেন্সকে কেন্দ্র করে। এর আক্ষরিক কথাটা হচ্ছে, যদি তার ধর্মের মৌল যে নীতি সেটার প্রতি বিশ্বাস রাখে তাহলে সে মৌলবাদী। যদি নীতিগত অবস্থান ধরি তাহলে যারাই ধর্মে বিশ্বাসী তারাই মৌলবাদী। আবার যদি আমরা ধরি যে, ধর্ম প্রবর্তনের সময় যে নিয়ম-নীতি ইত্যাদি ছিল সেগুলোকে এখন পর্যন্ত কার্যকর বলে যারা মনে করে, তাহলে এখনকার বিবেচনায় তারাই হচ্ছে মৌলবাদী। ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের সময় বা তার শত বছরের মধ্যে কিংবা খেলাফতের সময় যে নিয়ম-বিধি ব্যবস্থা ছিল, এতো বছর পরেও ওই একই বিধি-ব্যবস্থা, নিয়ম-কানুন সমস্ত কিছু এখনো প্রযোজ্য; এটা যদি কেউ মনে করেন তাহলে তাকে আমরা বলতে পারি যে তিনি মৌলবাদী।

কিন্তু এইরকম একজন বিশ্বাস করা মানেই কিন্তু তিনি যে আরেকজনের উপরে চড়াও হচ্ছেন কিংবা আরেকজনের জন্য হুমকি হচ্ছেন, তা তো নয়! একজন ব্যাক্তি মনে করতে পারেন, হ্যাঁ আমি মনে করি যে, ওই রকমভাবে জীবন যাপন করা উচিৎ। ওই রকম বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে থাকা উচিৎ তিনি নিজের মতো করে থাকতে পারেন; তিনি তো আরেকজনের উপরে জোরজার নাও করতে পারেন, অসহিষ্ণু নাও হতে পারেন, 'যার ধর্ম তার কাছে' (লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়াদ্বীন) এটাতো তিনি বিশ্বাস করতে পারেন। তাহলে সেই মৌলবাদী আর ইসলাম ধর্মীয় যে গ্রুপগুলো বর্তমান সময়ে অসহিষ্ণুতার একটা প্রতীক হিসাবে দাঁড়াচ্ছে, তারা তো এক নয়। তাদেরকে তো মৌলবাদী বললে ঠিক বোঝানো যাচ্ছে না জিনিসটা।

দ্বিতীয়ত: জামাত কিংবা কাছাকাছি ধারার এই গ্রুপগুলো কিন্তু ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন সময়কালের মৌলনীতি এখনো প্রযোজ্য তা মনে করে না। তাদের জীবন যাপন যদি আপনারা দেখেন, জামায়াতে ইসলামী কিংবা শায়খুল হাদীস থেকে শুরু করে ইসলামী ঐক্য আন্দোলন কিংবা ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনে যারা নেতৃবৃন্দ আছে, তাদের সম্পত্তি মালিকানা, তাদের বিনিয়োগ, তাদের জীবন যাপন, তাদের গাড়ী, তাদের বিশ্বাস-সমস্ত কিছুর মধ্যে যদি দেখেন, তারা অনেক ধরনের পরিবর্তন এনেছে। যে কাজগুলো কিছু বছর আগেও অনেকের দৃষ্টিতে নাজায়েজ

ছিলো সেগুলো এখন জায়েজ। অনেক ধরনের পরিবর্তন এসেছে তাদের। এক সময় তো ছবি তোলাই নিষিদ্ধ ছিল, এখন টেলিভিশন তো খুব গ্রহণযোগ্য একটা মিডিয়া হিসেবে ইসলামী গ্রুপগুলোর কাছে পরিগণিত হচ্ছে। তারা ব্যবহার করছে, সিডি ব্যবহার করছে, অডিও-ভিডিও নানান কিছু ব্যবহার করছে। দামী গাড়িতে যাতায়াত করছে। ব্যাংকও অনেকে গ্রহণ করছে। শেয়ার বাজার গ্রহণ করছে। সুবিধামতো অনেককিছুই তারা গ্রহণ করছে। সুতরাং এদেরকে আমরা ওই সংজ্ঞা অনুযায়ী তো 'মৌলবাদী' বলতে পারি না।

পুঁজি ও আল্লাহর আইন

তাদের একটা চিন্তা ও বিশ্বাসের ধরন আছে, তাদের একটা বিশ্বাস-একটা রাজনীতি আছে, সেই রাজনীতির মধ্যে সম্পত্তি মালিকানার প্রশ্ন আছে, বিনিয়োগের প্রশ্ন আছে, এইগুলো যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে কোন মতেই তাদের এমনকি সামন্তবাদী বা প্রাক পুঁজিবাদীও বলা যায় না। বামপন্থী আন্দোলনের মধ্যে এই ধারণাটা অনেকেরই আছে যে, এই ধর্মীয় দলগুলো বোধ হয় সামন্তবাদকে প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু যদি এদের কর্মসূচী, জীবন-যাপন, বিনিয়োগ ইত্যাদি পর্যালোচনা করা যায় তাহলে এটা পরিষ্কার হবে যে, এরা মোটেই সামন্তবাদকে প্রতিনিধিত্ব করে না। তারা এখন 'বুর্জোয়া'দেরই প্রতিনিধিত্ব করে, পুঁজিবাদেরই প্রতিনিধিত্ব করে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যেটা সেই ব্যবস্থার সঙ্গেই তাদের একটা সমন্বয় আছে। তারা এনজিও করছে, তারা বিনিয়োগ করছে, তারা বাজারকে গ্রহণ করছে একটা বিধি-ব্যবস্থা হিসাবে। এবং রাষ্ট্র ও বাজার সবগুলোকে তারা মিলিয়ে একভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করছে।

এখন যে জায়গাটা তাদের আলাদা সেটা হচ্ছে, তারা গ্রহণ করছে পুঁজিবাদী অর্থনীতি, কিন্তু রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় তারা বলছে যে এটা 'আল্লাহর আইন' দ্বারা চলবে। যখন একজনে বলে কিংবা একটা গোষ্ঠী বা একটা রাজনৈতিক দল বলে যে, আমরা ক্ষমতায় গেলে আল্লার আইন দ্বারা সব চলবে, তখন এই 'আল্লার আইন'টাকে আমরা কীভাবে সংজ্ঞায়িত করবো? পুঁজির আইন তো গ্রহণ করছে তারা, তারপরে আল্লাহর আইন কোথায় কাজ করবে? তাছাড়া তাদের দৃষ্টিতে যেটা আল্লার আইন- তারা যেটাকে আল্লার আইন মনে করছে- সেটা যে আল্লার আইন আরেকজনের কাছে তা নাও মনে হতে পারে। ধরেন, ভূমি ব্যবস্থা কীরকম হবে? মাওলানা ভাসানীর লাইন ধরলে ভূমি- জাতীয়করণ করতে হয়, সামাজিক মালিকানার মধ্যে যেতে হয়। সারা বাংলাদেশের সম্পত্তির সামাজিকীকরণই এই দৃষ্টিতে আল্লাহর আইন। কারণ আল্লাহই্ সব কিছুর মালিক, মানুষ তাই কোন ব্যক্তিগত মালিক হবে না। এটাই হচ্ছে মওলানা ভাসানী যেভাবে ইসলামকে বোঝেন সেটা। আর জামায়াতে ইসলামীর মওলানা মওদুদী কিংবা গোলাম আজম

কিংবা নিজামী যেভাবে ইসলামকে বোঝেন, তার অর্থ হচ্ছে, ব্যক্তিগত মালিকানাটাই হচ্ছে এটার শক্তিশালী ভিত্তি। মুনাফাভিত্তিক অর্থনীতি ও ব্যক্তিগত মালিকানাকে কোনভাবে খর্ব করা যাবে না। ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে, তার উপরেই দাঁড়াবে সমস্ত কিছু। তাহলে আল্লাহ্‌র আইনের পার্থক্যটা, ধর্ম সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের মধ্যে দিয়ে খুব মৌলিক পার্থক্য হিসেবে দাঁড়াচ্ছে।

এখন জামাত বা সমমনা ইসলামী দলগুলো ক্ষমতায় গিয়ে যদি বলে যে এটাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র আইন, এবং এই আল্লাহ্‌র আইনের বিরোধিতা করা মানেই হচ্ছে ধর্মদ্রোহীতা এবং ধর্মদ্রোহীতার শাস্তি তো মৃত্যুদণ্ড। এইটা যদি একটা রাজনৈতিক ভার্সন হয়, তাহলে ওই রাজনীতিটাকে ফ্যাসিবাদী রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না। কারণ, কোন কিছু নিয়ে তো প্রশ্ন করা যাচ্ছে না। আল্লাহ্‌র আইন নিয়ে তো প্রশ্ন করা যায় না! তারা যদি বলে যে আমরা আল্লাহর আইন অনুযায়ী কাজ করছি, সেটা নিয়ে তো আর বিতর্ক করা চলে না। ধর্মীয় কাঠামোর বাইরে যারা তারা তো বটেই, যারা কাঠামোর মধ্যে বসবাস করে তারাও তো বিতর্ক করতে পারে না; সুতরাং সেক্ষেত্রে একটা ভয়াবহ ফ্যাসিবাদী ভূমিকা ছাড়া তাদের ওই অবস্থাকে টিকিয়ে রাখার আর কোন উপায় নাই। সে কারণে জামায়াতে ইসলামীর দক্ষ সামরিক বাহিনী হচ্ছে অন্যতম এজেন্ডা। দক্ষ সামরিক বাহিনী ছাড়া তারা এই ব্যবস্থা রাখতে পারবে না। কারণ বড় ধরনের দমনমূলক ব্যবস্থা ছাড়া এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা সম্ভব না। সেই জন্যই এই ধরনের ব্যবস্থা, যেটা আমরা এখন প্রায়ই শুনতে পাচ্ছি বিভিন্ন ইসলাম ধর্মীয় গ্রুপগুলোর মধ্যে যে, মানুষের তৈরি আইন-মানুষের তৈরি যে বিধিব্যবস্থা সেটা চলবেই না, আল্লাহর তৈরি আইন দিয়ে সমস্ত চলতে হবে। সেই আল্লাহর তৈরি আইনের নামে কর্তৃত্বমূলক একরৈখিক এই বিধিব্যবস্থার কারণেই- এই গোষ্ঠী বা এই দলগুলোর চিন্তা চেতনা বা প্রবণতার মধ্যে মর্মবস্তুর দিক দিয়েই একটা ফ্যাসিবাদী ব্যাপার থাকে।

সেই কারণে আমার নিজের ধারণা, আমি মনে করি যে, এদেরকে ঠিকমত নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে গেলে এদের ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী বলাটাই যুক্তিযুক্ত। এবং এর সাথেই গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে, এই ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী যে চিন্তা কিংবা দর্শন কিংবা রাজনীতি ধারণ করে সেটা টিকতে পারে না যদি একটা বৃহত্তর ফ্যাসিবাদী আবহাওয়া সেখানে না থাকে। একটা বৃহত্তর ফ্যাসিবাদী আবহাওয়ার মধ্যেই এই ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী অংশটা হচ্ছে একটা সাবসেট। যেমন ১৯৭১ সালের রাজাকার-আলবদরকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি। কিন্তু রাজাকার আলবদর হিসেবে তারা যে ভূমিকা পালন করেছে তাতো স্বাধীন-সার্বভৌম ভূমিকা ছিল না। তারা এই ভূমিকা পালন করেছিল বা করতে পেরেছিল পাকিস্তানী সামরিক-বেসামরিক ক্ষমতার পক্ষে, বৃহৎ পুঁজির পক্ষে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে। সুতরাং পাকিস্তানী বৃহৎ পুঁজি এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকার একটা স্থানীয়

হাতিয়ার হিসেবে কিংবা একটা গুটি হিসাবেই এই রাজাকার-আলবদর বাহিনী ভূমিকা পালন করেছিল। সুতরাং ঐ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে খাতির করে- পাকিস্তানী বৃহৎ পুঁজির সাথে খাতির করে, সেই খাতির নিয়ে রাজাকার-আলবদরদের বিরোধিতা হয় না। সামগ্রিক ফ্যাসিবাদের সঙ্গে খাতির করে তার একটা খণ্ড ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই কার্যকর হয় না। সেই কারণেই ওই সামগ্রিক ফ্যাসিবাদের যে আবহাওয়া সেই আবহাওয়াটাকে যারা ধারণ করে, যারা সেটাকে গ্রহণ করে, তাদের পক্ষে এই ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করা সম্ভব হয় না। সম্ভব হয় না, তার আর একটা কারণ হচ্ছে, এর সাথে যে শ্রেণী মৈত্রী সেই শ্রেণী মৈত্রীর শক্তি অনেক বেশি।

ক্ষমতার গুটি কেন?

কয়েকবছর আগে একটা ছেলে তার বোনকে হত্যা করল। সে মাদ্রাসার ছাত্র, হত্যা করার পরে তাকে যখন এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সে তার ব্যাখ্যাও দিয়েছিল। তার খুবই প্রিয় বোন ছিল, ছোট বোন। খুবই আদর করতো সে। একমাত্র বোন, এত আদরের বোনকে ভাই কী করে খুন করে! ভাইয়ের বক্তব্য হচ্ছে যে, যে নিয়ম নীতির মধ্যে থাকা দরকার সেই নিয়ম নীতির থেকে বোন বেরিয়ে যাচ্ছিল। মানে হয়তো বই-টই পড়ছিল, যে বইটা তার পড়ার কথা না, কিংবা একটু বাইরে যেতে চাচ্ছিল, যে বাইরে যেতে চাওয়ার কথা না, কিংবা গান শুনছিল হয়তো, যে গান তার শোনা উচিৎ না, কিংবা কবিতা পড়ছিল হয়তো, কবিতা-গান এগুলো তো নিষিদ্ধ, এগুলো চলবে না! পড়লে বা শুনলে তার মধ্যে নানা রকম চিন্তা আসতে পারে, প্রশ্ন আসতে পারে, ভাবনা আসতে পারে, স্বপ্ন আসতে পারে। সুতরাং এ সমস্ত কারণে যে বোনকে ভালোবাসে, যেহেতু বোন নষ্ট হয়ে যেতে পারে, মানে নষ্ট হওয়ার একটা নির্দিষ্ট একটা ইমেজ তার কাছে আছে। 'নষ্ট' হয়ে যাবে সুতরাং সেই বোনকে বাঁচানো যাবে না। সেই বোনকে সে খুন করেছে। সম্ভব তার পক্ষে। সম্ভব এই কারণে যে, এই বিশ্বাসটা তার মধ্যে এমনভাবে আছে যে বিশ্বাসের মধ্যে কোন প্রশ্ন নাই, কোন বিশ্লেষণ নাই, কোন ব্যাখ্যা নাই, তার মধ্যে নতুন করে দেখার মতো কোন চোখ আসা নিষেধ, সে ওইভাবে অভ্যস্ত যে কিছুই চিন্তা করা যাবে না। কোন কিছু চিন্তা করা যাবে না, কোন প্রশ্ন করা যাবে না, কোন বিশ্লেষণ করা যাবে না। তার ধর্ম- ধর্মের সৈনিক হিসাবে এটাই হচ্ছে দায়িত্ব।

সুতরাং এরকম একটা আবহাওয়া যাদের মধ্যে তৈরি করা হয়েছে তারা যে কোন ধরনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার হতে পারে। তাদের যে ওস্তাদ বা যে কমান্ড সে কমান্ডের সাথে রাষ্ট্র নিপীড়ক গোষ্ঠীর সম্পর্কের ওপর, ওস্তাদের সামাজিক অর্থনীতিক অবস্থানের ওপর নির্ভর করে যে তারা কোন কাজে কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই ধরনের শক্তি- এই ধরনের যে আবহাওয়া, এই ধরনের সংস্কৃতি কোন সৃজনশীলতার

জন্ম দিতে পারে না। কোন নতুন পথের জন্ম দিতে পারে না। কেবল একটা বদ্ধ অবস্থার জন্ম দিতে পারে। এবং যারা এর মধ্যে বসবাস করে তাদের জীবনটার মতো করুণ জীবন আর কিছু হতে পারে না। কারণ তারা নিজেরাও নিজেদের অবস্থানকে অনুধাবন করতে অক্ষম। এই রকম একটা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে গত ৩০ বছরে আরও বর্ধিত ও শক্তিশালী করা হয়েছে, যাদেরকে যে কোন ধরনের ফ্যাসিবাদী ইন্সট্রুমেন্ট হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

আর একদিকে তৈরি করা হয়েছে মার্কেট। পুঁজিবাদের সেই 'মার্কেট' এর মধ্যে দিয়ে আরেকটা গুপ্তঘাতক এবং সন্ত্রাসী-ফ্যাসিবাদী-লোভী জনগোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে। কয়েকবছর আগের পত্রিকার আরেকটি খবর আমাদের জানিয়েছিল যে, একটা বালককে কয়েকজন মিলে খুন করেছে। কী কারণে? খুন করেছিল যে বালক তার একটা চিঠি পাওয়া গেছে পরে। ৫/৬ বছরের বালকটাকে খুন করার আগে তার ঐ চিঠি সে পাঠিয়েছিল মায়ের কাছে। সেই চিঠিতে লেখা ছিল- "আমি একটা কাজ পেয়েছি। এই কাজ করে আমি লাখখানিক টাকা পেতে পারি, এই লাখখানিক টাকা পেলে আমি বিদেশে চলে যাবো এবং তারপরে আর তোমাদের কোন চিন্তা নেই। তারপরে তোমাদের সমস্ত ভাগ্য ফিরে যাবে। আমাদের এই অবস্থা আর থাকবে না।" আমরা এই অবস্থার মধ্যে আছি যেখানে পেশাদার খুনী কিংবা পেশাদার গুপ্ত ঘাতক একটা বড় ধরনের পেশা হতে পারে একটা সমাজে।

বর্তমান সমাজে বর্তমান বাংলাদেশে পেশাদার খুনী, পেশাদার সন্ত্রাসী হচ্ছে বড় ধরনের একটা পেশা। মানে সন্ত্রাস করাটাই একটা পেশা। পেশা হিসাবে সে সন্ত্রাস করছে। খুন করছে পেশা হিসাবে। একজনের বাড়ি দখল করছে পেশা হিসাবে। একজনের উপর হামলা করছে পেশা হিসাবে। এমনকি রেপও করছে পেশা হিসাবে। আপনারা জানেন যে, ধর্ষণ যেটা- অনেক ধর্ষণ হয় পেশাদারী, পেশাদারী ভিত্তিতে মানে হচ্ছে যে, নারী পাচার করা হবে কিংবা নারীকে প্রসটিটিউশনে আনা হবে, আনার পূর্বশর্ত হিসাবে বিভিন্ন জায়গায় যেমন- টার্মিনাল, বাসস্ট্যান্ড এ সমস্ত জায়গায় কিছু লোক নিয়োজিত থাকে, যাদের দায়িত্ব হচ্ছে যে, কোন মেয়ে যদি তারা মনে করে যে তাকে আনা দরকার বা বাজার দাম ভালো হবে তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে- তাকে রেপ করে, তার প্রতিরোধটাকে চুরমার করে দেওয়া। এটা হচ্ছে তার পেশাদারী দায়িত্ব।

বৃহত্তর ফ্যাসিবাদের আশ্রয়ে

তার মানে বাণিজ্যিকভাবেই এই পেশাগুলো বর্তমান সমাজে তৈরি হয়েছে। যে সমাজে এই পেশাগুলো তৈরি হয়, সেই পেশাগুলো তো নিজে-নিজে চলে না, তার পিছনে বড় ক্ষমতা থাকে। তার পেছনে গডফাদার থাকে, তার পেছনে একটা শ্রেণীশক্তি থাকে। এবং তার পেছনে একটা মালিকানা ব্যবস্থা থাকে। সেই

মালিকানা ব্যবস্থার ভিত্তিতে তাহলে আমরা দুই ধরনের গুপ্ত ঘাতক কিংবা হিংস্র জনগোষ্ঠী পাই- যাদের মাথা কাজ করে না, যাদের চোখ কাজ করে না- যাদের চিন্তাশক্তি নাই নিজের- যে নিজের অবস্থা বুঝতে পারে না, যে নিজে অন্ধ একটা কুপের মধ্যে বসবাস করে সেরকম দুইটা গ্রুপ তৈরি হয়েছে। একটা মার্কেট আরেকটা ধর্ম। ধর্ম এবং মার্কেট এই দুই জায়গায় দুই গ্রুপের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশের রাষ্ট্র এবং তার যাবতীয় শ্রেণী শাসন। আর তার সঙ্গে সম্পর্কিত যে আন্তর্জাতিক ক্ষমতা তার নাম সাম্রাজ্যবাদ।

আজকে আফগানিস্তানে তালেবানদের যে শাসন, তালেবানদের শাসন সম্পর্কে তো সবাই জানেন- তালেবানদের শাসন যেটা ছিল সেটা খুবই অসহিষ্ণু একটা শাসন ছিল এবং সেখানে নারীর অবস্থা ছিল খুব খারাপ। শিক্ষা, গান-কবিতা-সঙ্গীত সমস্ত কিছুই সেখানে ছিল নিষিদ্ধ। সেখানে মুসলমান হিসাবে বেঁচে থাকতে পেলেও একটা নির্দিষ্ট তরিকার মধ্যে থাকতে হবে। কতটুকু তার পাঞ্জাবী হতে হবে, কতটুকু তার দাড়ি হবে সেটাও তারা নির্ধারণ করবে।

এরকম তালেবানদের শাসনটার অবসান ঘটলো যখন মার্কিন বোমা হামলার মধ্য দিয়ে, তখন অনেকেরই ধারণা হলো যে, এটার মধ্যে দিয়ে আফগানিস্তানের জনগণের একটা মুক্তি ঘটল, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বোমা হামলা করে ভালোই করেছে। কারণ আফগান জনগণ মুক্তিলাভ করল। এই ব্যাখ্যাটা অনেকের চিন্তার মধ্যে আছে- হুমায়ুন আজাদের মধ্যেও এই ধরনের চিন্তা ছিল। কিন্তু এই ধরনের চিন্তা আসে কেন? আসে এই কারণে যে তাদের বিবেচনার মধ্যে কিংবা তাদের বিশ্লেষণের মধ্যে ঐতিহাসিক যোগসূত্র অনুপস্থিত থাকে। তারা জানে না কীভাবে তালেবানদের উদ্ভব হয়েছিল? তালেবানদের বানাল কারা? এটা তাদের নাই। কীভাবে মুজাহিদীনরা তৈরি হলো এটা তাদের জানা নাই।

আফগানিস্তানে ৬০ দশক ৭০ দশক ৮০'র দশকে অনেক ধরনের সংস্কার হচ্ছিল, ৭০ দশকে তো বটেই শিক্ষার ক্ষেত্রে, ভূমির ক্ষেত্রে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেক ধরনের সংস্কার হচ্ছিল। সেই সংস্কার যদি সম্পন্ন হতে পারতো তাহলে আফগানিস্তান এখন সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট কান্ট্রি থাকতো। আমরা পেতাম একটি গণতান্ত্রিক আফগানিস্তান। এই যাত্রা বন্ধ করার জন্য, যেহেতু সেই সংস্কার যারা করছিল তারা মার্কিন-বিরোধি ছিল সুতরাং তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য, উচ্ছেদ করার জন্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুজাহিদীনদের নিয়োগ করল। এই মুজাহিদীন প্রথমে, তারপরে তালেবান। এই দুটো গোষ্ঠী তৈরি হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ভূমিকায়। সরাসরি সি.আই এ'র লোক এসে, ইউ.এস. আর্মি ইন্টেলিজেন্স-এর লোক এসে, ইউ.এস. আর্মির থেকে লোক এসে, পাকিস্তানে ট্রেনিং দিয়ে তালেবানদের বড় করেছে। সরাসরি- এটা কোন পরোক্ষ ট্রেনিং না, প্রত্যক্ষভাবে

তারা ট্রেনিং দিয়েছে এবং পাকিস্তান আর্মিকে তহবিল দেয়া হয়েছে এর জন্য। যে ফান্ডের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান আর্মি তাদের পালন করেছে।

সুতরাং তালেবানরা যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্ট, মুজাহিদীনরা যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্ট এবং প্রতিপালিত এই কথাটা ভুলে গেলে আমরা একটা ভয়াবহ বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ব। এই কারণে আমাদের মনে হবে যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বোধ হয় ধর্মীয় ফ্যাসিবাদকে দূর করতে সক্ষম।

পৃথিবীতে এযাবৎকালে মানে গত কয়েক দশকে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী যে উদ্ভব এবং বিস্তার আমরা দেখেছি তাদের প্রত্যেকের পেছনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ইন্ধন ছিল। ১৯৭১ সালে যে রাজাকার-আলবদরদের আমরা দেখি তার পেছনেও ছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। এবং আফগানিস্তানে তো বটেই। তার একটা হামলা চলছে ইরাক, আফগানিস্তানে- মুসলমানদের বিরুদ্ধে তার নানা রকম প্রচার চলছে এবং খ্রেস্টান ভার্সেস মুসলমান এইভাবে বিশ্বকে ভাগ করার একটা প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। যে প্রচারণার শিকার হয়ে অনেকে আবার (শিকার হবার ফলে অনেকে আবার) দেখতে পাচ্ছেন না যে, লড়াইটা ঠিক খ্রিস্টান ভার্সেস মুসলমান নয়, কারণ মুসলমানদের মধ্যে একটা বড় অংশ আছে যারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সৌদীআরবসহ সেখানে আলখাল্লার পোষাক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্যুট-কোট কোন বাধা হচ্ছে না, তাদের মধ্যে গভীর ঐক্য-মৈত্রী এবং একজন আরেকজনের জন্য অপরিহার্য।

অন্যদিকে- আবার খ্রিস্টান অমুসলিম জগতেরও একটা বিরাট অংশ আছে যারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রবল বিরোধী। বিরোধ মুসলমান খ্রিস্টানের মধ্যে এভাবে দেখার ফলে একটা বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। মনে হতে পারে কারো যে এটা বোধ হয় একটা পারমানেন্ট ফেনোমেনা। যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইসলামের বিরুদ্ধে সুতরাং ইসলামী দলগুলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। এই ধরনের একটা বিভ্রান্ত সিদ্ধান্ত কিংবা বিভ্রান্তি অনেক জায়গা থেকে আমরা শুনতে পাচ্ছি, যেটা ভয়াবহ। কারণ এই ইসলামী গ্রুপগুলোর একটা বড় অংশ যাদের কথা আমি বললাম তাদের ইতিহাস, তাদের বিকাশ সম্পূর্ণভাবেই এই শাসক শ্রেণীর সঙ্গেই সম্পর্কিত। আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তালেবানদের উপরে হামলা করতে পারে কিন্তু তালেবানদের বাদ দিয়ে যে শাসন হামিদ কারজাই করছে, সেই হামিদ কারজাই-এর নেতৃত্বেও একই ধরনের শাসন সেখানে আবারও কায়েম হতে পারে। কারণ তারা বলে দিয়েছে যে আইনের ক্ষেত্রে বিশেষত নারী বিষয়ক আইনের ক্ষেত্রে কোন ধরনের পরিবর্তন (তালেবানদের যে আইন ছিল সে আইনের মধ্যে বড় ধরনের পরিবর্তন কোন) তারা আনবে না। আর এটাও ঠিক যে, প্রয়োজন হলে যে কোন সময়েই আবার তালেবানদের মতো যে কোন গ্রুপ তারা তৈরি করতে পারে। এবং এটাও

অসম্ভব না যে, বাংলাদেশে এই ধরনের শক্তিগুলোকে তারা গুটি হিসাবে যে কোন সময়, যে কোন কাজে প্রয়োজন মনে করলে তারা ব্যবহার করতে পারে।

কারণ ধর্মভিত্তিক এসব গোষ্ঠী যে হায়ারাকির মধ্যে আছে; তাতে উপরের অংশের সাথে মৈত্রী স্থাপন সম্ভব হলে একটা বড় ধরনের শক্তি তারা ব্যবহার করতে পারে। আফগানিস্তান থেকে শুরু করে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ এর অভিজ্ঞতা আমাদের এটাই বলে। সেই কারণে আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে, যে ফ্যাসিবাদী আবহাওয়ার মধ্যে আমরা আছি- যে দেশে আমরা দেখতে পাচ্ছি গুপ্ত ঘাতকদের একটা রাজ্যে পরিণত হয়েছে মানে, যে কোন সময় যে কোন মানুষ যে কোন জায়গায় নিহত হতে পারেন, আহত হতে পারেন, হামলার শিকার হতে পারেন, দখলের শিকার হতে পারেন, সেটা পারা শুধুমাত্র রাজাকার-বদর কিংবা ইসলামী গ্রুপ এ সমস্ত কথা বলে এই জায়গাটা ব্যাখ্যা করা যাবে না।

সৃজনশীলতায় মুক্তি

এটা ঠিক যে, ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের বিকাশ হয়েছে খুব বড় আকারে, ব্যাপকভাবে সেই ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের শক্তিবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে সেই ধরনের শাসনের ফলে, যে শাসন সামগ্রিক ফ্যাসিবাদী শাসনেরই একটা প্রতিফলন কিংবা এমন ধরনের দেশী ও আন্তর্জাতিক শক্তির সম্মিলনে, যে সম্মিলনটা জনগণের জীবন-সম্পদ, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য বড় ধরনের হুমকি। সুতরাং আমরা যদি এই অবস্থার পরিবর্তন চাই তাহলে প্রথমে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে নিজের মধ্যে একটা স্বাধীনতার বোধ তৈরি করা, তার মানে হচ্ছে নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত যে বিশ্বাস, টেলিভিশন, রেডিও, বিশ্বব্যাংকীয় আর ধর্মীয় বয়ান ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে যে কথাগুলো আমাদেরকে শোনানো হচ্ছে সেই কথাগুলোকে প্রশ্ন করার কিংবা সেগুলোকে বিশ্লেষণ করার, সেগুলোর বাইরে নিজের দেখার-বোঝার এবং দৃষ্টিদানের ক্ষমতা অর্জন করা নিজেরা এবং দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে সেটাকে মানুষের মধ্যে দিয়ে যাওয়া। এই স্বাধীনতার স্পেসটা মানে এই জায়গাটাতে এখানে সামাজিক দায়, সমষ্টির প্রতিনিধিত্ব করে ক্ষমতার সঙ্গে সংঘাতে যাওয়া এবং প্রচলিত যে বিশ্বাস সেটাকে বিরোধিতা করা। নারকীয় দমন পীড়নের যে শ্বাসরুদ্ধকর-দমবন্ধকর যে অবস্থা সেটা পরিবর্তনের আর কোন পথ নাই। এই স্পেসটা তৈরি করা হচ্ছে আমাদের কাজ। যেটাকে আমরা বলি মানুষের সংগঠিত শক্তি বা মানুষের সংগঠিত আওয়াজ সেটাকে ভাষাদান করাটাও এই বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা বা লেখক-শিল্পীর সেই কাজের মধ্যে দিয়েই সম্ভব। এবং সেটা তারাই করবেন যারা নিজেরাও আবার নানান রকম হামলা-হুমকির মুখে থাকেন। এই সংঘাত আর এর মধ্যে দিয়ে ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়ার সম্ভাবনা তৈরিও মানুষের ইতিহাসের অংশ।

হুমায়ূন আজাদের ওপর হামলার পরিপ্রেক্ষিতে সৃজন আয়োজিত বক্তৃতা। ১৩ মার্চ ২০০৪

দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত : জনগণের স্বার্থ

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশ ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, ভূটান ও বাংলাদেশ 'দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা জোট' বা সার্ক-এর অন্তর্ভূক্ত ছিল। একে এখন সম্প্রসারিত করে আগের সার্কভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে আফগানিস্তান এবং মায়ানমারকেও দক্ষিণ এশিয়ার অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে আফগানিস্তানকে সার্কের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এবং মায়ানমার এখনও পর্যবেক্ষকের মর্যাদায় আছে। তবে বর্তমান আফগানিস্তানের যে অবস্থা তাতে রাষ্ট্র হিসেবে তা কাদের প্রতিনিধিত্ব করবে, আফগান জনগণ নাকি মার্কিন সেনাবাহিনীর, সেটিও একটি বড় প্রশ্ন।

আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী দেশ ভারতের সাথে আমাদের সীমান্ত সবচেয়ে বেশী। আরেকটি প্রতিবেশী দেশ–মায়ানমার–যাদের সাথে আমাদের দীর্ঘদিন কার্যত কোন যোগাযোগ নেই। কিছু বেসরকারি যোগাযোগ আছে যাকে বলা যায় অপ্রাতিষ্ঠানিক বা ইনফরমাল, কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আইনবিরোধী যোগাযোগ। সেগুলো প্রধানত বাণিজ্যিক, টেকনাফ অঞ্চলে গেলে সেটি বোঝা যায়, যাকে চলতি কথায় চোরাচালানি বলি, তার একটি অংশ মায়ানমারের মধ্য দিয়েই হয়। আবার মায়ানমারে যখন কোন সমস্যা হয় তখন অনেকে আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে আসেন। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বলে যাদের আমরা জানি তারা মায়ানমার থেকে আসা জনগোষ্ঠীর একটি অংশ।

এই মায়ানমার একটি বিশাল সম্পদশালী দেশ। সম্ভবত বিশাল সম্পদশালী দেশ বলেই সেখান থেকে সামরিক একনায়কতন্ত্র কোনভাবেই হঠানো যাচ্ছে না। এই সামরিক একনায়কতন্ত্রের সাথে খনিজ সম্পদ দখল ও উত্তোলনের একটা সম্পর্ক আছে। যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মায়ানমারের সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে মাঝেমধ্যেই হুমকি দেয়, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি ইউনোক্যালসহ আরও বেশ কয়েকটি মার্কিন প্রতিষ্ঠান বহু বছর ধরেই মায়ানমারে কাজ করছে। এখন তার সাথে যোগ হয়েছে চীন। বস্তুত বড় ধরনের আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠপোষকতা কিংবা প্রশ্রয় না পেলে এই সামরিক জান্তার পক্ষে এতোদিন টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। যাইহোক, দক্ষিণ এশিয়া এমনিতেই উচ্চ সম্ভাবনাময় – আর এই অঞ্চলে আমরা যদি মায়ানমার এবং আফগানিস্তান অন্তর্ভূক্ত করি – তাহলে এটি সম্পদ এবং সম্ভাবনায় আরও অনেক সমৃদ্ধ। এই অঞ্চলভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন দেশ নিজ নিজ ঘাটতি ও

প্রাচুর্য বিবেচনায় পারস্পরিক সহযোগিতা ও লেনদেনের ভিত্তিতে এই অঞ্চলের নতুন ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পারে, সম্পদশালী অঞ্চলের ক্ষুধার্ত ও নিপীড়িত জনগণের জীবনকে এক নতুন অধ্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু বলাই বাহুল্য, তার শর্ত পূরণে এখনও অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে।

মোঘল আমলে এই দক্ষিণ এশিয়ার বৃহৎ অংশ অখণ্ড ভারত হিসেবে চিহ্নিত ছিল। মোঘল সাম্রাজ্যের পরে বৃটিশ ভারতের মধ্যে বর্তমানের বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত এই তিনটিই অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই হিসেবে সাংস্কৃতিকভাবে এই তিনটি দেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের পারস্পরিক যোগাযোগ আছে। কিন্তু এটিও একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, খুব কাছাকাছি অন্যান্য যে সব দেশ আছে যেমনঃ শ্রীলংকা, তার সাথে আমাদের ভাষাগত, সাংস্কৃতিক কিংবা বাণিজ্যিক যোগাযোগ তুলনায় অনেক কম; নেপালের সাথে খুব ঘনিষ্ট একটি সম্পর্ক হওয়া সম্ভব; কিন্তু তা দাঁড়ায়নি। ভূটান বা মালদ্বীপের সাথেও সম্পর্ক খুব সবল নয়। আর মায়ানমার বা আফগানিস্তান এখনও বেশ দূরের দেশ।

একমাত্র ভারতের সাথেই বাংলাদেশের বাণিজ্যিক এবং অন্যান্য সম্পর্ক ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত আছে। এই দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ভারত হচ্ছে একমাত্র দেশ যেটি তার শাসন ব্যবস্থা বা রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থার একটি ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পেরেছে। বৃটিশরা এই অঞ্চল ছেড়ে যাবার পরে অর্থাৎ বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের পরে ভারতে যে শাসনব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে, তার মধ্যে বড় আকারের কোন ছেদ পরবর্তীতে পড়েনি। আমলাতন্ত্র, বিচার বিভাগ, সামরিক বাহিনী সহ স্থায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ কোন বড় আকারের পরিবর্তন ঘটেনি, সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যবস্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন প্রক্রিয়াও অব্যাহত থাকতে পেরেছে। ব্যতিক্রম শুধু ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে দুই বছরের জরুরী অবস্থা।

ভারত ছাড়া এই অঞ্চলের অন্য দেশগুলোর মধ্যে পাকিস্তান, বাংলাদেশ এই দুটো দেশেই প্রতিষ্ঠার কিছুদিনের মধ্যেই সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এটি এগারো বছর পরে এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আরও কম সময়ে, মাত্র তিন বছর পরে। নেপাল রাজতন্ত্রের অধীনে দীর্ঘদিন শাসিত ছিল। এবং সেই রাজতন্ত্র থেকে নেপালকে মুক্ত করার জন্য, একটি বিপ্লবী আন্দোলনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। দক্ষিণ এশিয়ায় নেপালের মতো এই মাত্রার কোন বিপ্লবী আন্দোলন আর কোন দেশে হয়নি যেটি রাষ্ট্রকে সরাসরি লক্ষ্য করে বা রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে হুমকির মধ্যে ফেলেছে। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শ্রীলংকায় দীর্ঘদিন ধরে সবচাইতে বেশী জাতিগত সংঘাত দেখা গেছে, দীর্ঘ সময় ধরে সশস্ত্র যুদ্ধ চলেছে। একটা পর্যায়ে যেভাবে এর সমাধান হয়েছে বলে বলা হচ্ছে, সেটি আদৌ সমাধান কী না, সেটি নিয়ে প্রশ্ন আছে।

কিন্তু ভারতে যদিও সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা পাওয়া যায়, যা উত্তর-উপনিবেশ দেশগুলোতে বিরল, সেই ভারতেই প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে রাষ্ট্রক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কিত খুবই প্রভাবশালী তিনজন ব্যক্তির সরাসরি নিহত হবার ঘটনাও ঘটে। ভারত প্রতিষ্ঠার ঠিক পর পর, ১৯৪৮ সালে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, যিনি মহাত্মা গান্ধী হিসেবে পরিচিত, তিনি নিহত হন হিন্দু ফ্যাসিবাদীদের হাতে। ১৯৮৪ সালে প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে বাড়ির বাগানে ইন্দিরা গান্ধী শিখ দেহরক্ষীর হাতে নিহত হন। দীর্ঘদিন ধরে শিখদের উপরে বৈষম্যমূলক কিংবা নিপীড়নমূলক যে রীতি-নীতি চলছিল তারই একটি প্রতিক্রিয়া হিসেবে শিখ দেহরক্ষীরা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা করে। কিন্তু এই হত্যাকান্ডের পর শিখদের উপর যে পাইকারী নিপীড়ন ও হত্যাকান্ড শুরু হয় সেটাও আরেক ভয়ংকর অধ্যায়। এর পর প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধী নিহত হন তামিলদের হাতে। তামিল সম্পর্কিত ভারতীয় যে নীতি, দৃষ্টিভঙ্গী তার সরাসরি প্রতিক্রিয়া হিসেবে এক তামিল নারীর গায়ে বাঁধা আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণে রাজিব গান্ধী নিহত হন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আর এক পুত্র, সঞ্জয় গান্ধীও নিহত হন। সঞ্জয় গান্ধী বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছিলেন নাকি তাকে হত্যা করা হয়েছিল তা নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে। সেসময় ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু এই হত্যাকান্ড নিয়ে কোন কার্যকর তদন্ত হয়নি।

সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতার কারণেই ভারত সম্পর্কে একটি মিথ প্রচলিত আছে যে, ভারত হচ্ছে সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে বড় গণতান্ত্রিক দেশ। ভারতকে 'বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ' সম্ভবত: এই অর্থে-বলা হয় যে, ভারত জনসংখ্যার দিক থেকে বিশাল এবং এই বিশাল জনসংখ্যার দেশে নির্বাচনী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সরকার পরিবর্তনের প্রক্রিয়া আর কোন দেশে নেই। সে অর্থে এটি ঠিক। ভারতে এ পর্যন্ত নির্বাচন ছাড়া কোন সরকার পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু এর পাশাপাশি এর বিপরীত চিত্র যথেষ্ট মনোযোগ পায় না যে, বর্তমান ভারতে এক তৃতীয়াংশের অধিক অঞ্চল সরাসরি সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্বের অধীনে, তিন ভাগের এক ভাগ অঞ্চলে কার্যত সামরিক শাসন চলছে। আসাম কিংবা 'সাত বোন' যাদের বলা হয় কিংবা কাশ্মীর অঞ্চলগুলোতে যে পরিস্থিতি তাকে কোনভাবেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলা যায় না। এইসব অঞ্চলে সামরিক বাহিনীর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করবার জন্য 'গণতান্ত্রিক' সরকারই তাদের হত্যার অধিকারসহ নানা অধিকার দিয়ে আইনও পাশ করেছে। সম্প্রতি এই নিয়ন্ত্রণ সম্প্রসারিত হচ্ছে খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ অন্য অঞ্চলগুলোতেও। সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ সম্প্রসারণে ব্যবহৃত হচ্ছে যথারীতি 'সন্ত্রাস বিরোধী' অভিযানের যুক্তি।

দক্ষিণ এশিয়া নিয়ে আলোচনা করতে হলে প্রধানতঃ ভারত নিয়েই আলোচনা করতে হবে। কারণ ভারত হচ্ছে এই অঞ্চলের নির্ধারক শক্তি। দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে পারস্পরিক সহযোগিতা, জনগণের স্বার্থ রক্ষার মতো উন্নয়ন কর্মসূচি নির্ধারণ, প্রাপ্ত প্রাকৃতিক ও উৎপাদিত সম্পদের যথার্থ ব্যবহার, পারস্পরিক সম্মানজনক সাংস্কৃতিক সম্পর্ক, শান্তি ও সংঘাত, ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে কার্যকর কোন পদক্ষেপ নিতে গেলে নির্ধারক ভূমিকা ভারতেরই। জনসংখ্যা, সামরিক ও অর্থনৈতিক সবদিক থেকেই এটি বিশাল শক্তি এবং আশেপাশের দেশগুলোর সাথে তার তুলনাও চলে না। সে হিসেবে পুরো দক্ষিণ এশিয়ার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বোঝার জন্য ভারত কী করছে, কীভাবে বিকশিত হচ্ছে, ভারতের শক্তি কোন জায়গায়, তার সংকট ও দুর্বলতা কোথায়, বৈশিষ্ট্য কী, সমাজের শ্রেণীশক্তির বিকাশ ও মূলধন সংবর্ধনের ধরন, বিশ্ব পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদের সাথে তার যুক্ততা ইত্যাদি বিষয়গুলোর যথার্থ উপলব্ধি অপরিহার্য।

॥ ২ ॥

ভারতে বর্তমানে প্রায় ১১৫ কোটি মানুষের বসবাস। কয়েক বছর পূর্বেও বিশ্বের সবচেয়ে বেশীসংখ্যক ধনীর বাস ছিল জাপানে। বিশ্ব সমীক্ষায় ২০০৮ সাল থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশীসংখ্যক ধনীদের বাস দেখা যাচ্ছে ভারতে। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী সম্পদশালী ধনীদের নামের তালিকায় চতুর্থ এবং পঞ্চম শীর্ষ ধনী হচ্ছে ভারতীয়। বিশ্ব রাজনীতি ও সমর শক্তিতেও ভারত এখন আগের যেকোন সময়ের চাইতে অনেক শক্তিশালী। কিন্তু এগুলোই ভারতের পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। এই ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত অন্য চিত্রাবলী মিলিয়ে দেখলে ভারতকে পুরো চেহারায় পাওয়া যাবে। যখন বিশ্বের সর্বোচ্চসংখ্যক ধনীর বাস ভারতে, তখন বিশ্বের সর্বোচ্চসংখ্যক দরিদ্রের বাসও ভারতেই। ভারতের শতকরা ৪০ ভাগ মানুষ এখনও প্রচলিত দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে। ভারতের এই দারিদ্র্যের সাথে ভয়ানক চেহারার বর্ণপ্রথা, আঞ্চলিক বৈষম্য, জাতিগত নিপীড়ন, সাম্প্রদায়িকতা জড়িত। এইসবকিছু মিলিয়েই ভারতের মধ্যে দারিদ্র্যের উৎপাদন এবং পুনরুৎপাদন হচ্ছে। দারিদ্রক্লিষ্ট এই দেশ সামরিক ক্ষমতায় বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম সেনাবাহিনী পালন করে। পারমাণবিক শক্তি ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নিরাপত্তা চুক্তির মধ্য দিয়ে ভারত এখন এই অঞ্চলের প্রধান সামরিক ক্ষমতা ধারণ করে।

গণতান্ত্রিক শক্তি, বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ, এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের পরিচিতি আছে। ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হয়েছে। সংবিধান এবং বিদ্যমান আইন ব্যবস্থায় অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়ার কথা বলা আছে। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে, রাষ্ট্রীয়ভাবে, শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে, সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এবং সর্বোপরি আধিপত্যকারী মতাদর্শ কিংবা হেজিমনিক

আইডিয়ার মধ্যে খুবই সাম্প্রদায়িক কিংবা ফ্যাসিবাদী উপাদান স্পষ্টভাবে টিকে আছে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার বিস্তারও ঘটছে। সহিংসতার ঘটনা ঘটছে প্রায়ই। সম্প্রতি তার ভয়ঙ্কর কিছু প্রকাশ আমরা দেখেছি। গুজরাট তার মধ্যে একটি। এই সাম্প্রদায়িকতার শিকার সংখ্যালঘু বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, তাদের মধ্যে মুসলমান, খৃষ্টান আছে।

বৌদ্ধরা বহু আগেই এই সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার হয়েছিলেন। বর্তমানের মতো তখন এরকম রাষ্ট্রীয় সীমানা ছিল না। সেই পাল আমলে, সম্রাট অশোকের পর থেকে বৌদ্ধদের, একটি বিশাল প্রভাব তৈরী হয়েছিল পুরো ভারত অঞ্চলে। কিন্তু পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসনে ও সহিংস আগ্রাসনে বৌদ্ধদের পরাজয় হয়। তাঁরা বিতাড়িত হন, গণহত্যার শিকার হন। এ বিষয়ে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অনেক লেখালেখি আছে যাতে ঐ সময়কালে কীভাবে বৌদ্ধরা ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন, কীভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলেন তার বিশ্লেষণ ও বর্ণনা পাওয়া যায়। বৌদ্ধরা ভারতে এখনও আছেন কিন্তু তাঁদের অবস্থান খুব প্রান্তিক।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ভারতে যতসংখ্যক অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষ নিপীড়ন ও বৈষম্যের শিকার, তার চাইতে অনেক বেশী সংখ্যক হিন্দু ধর্মাবলম্বী হিসেবে পরিচিত মানুষই এর শিকার। একই ধর্মের মধ্যে থাকবার পরও তাঁদের উপর নিপীড়ন ও বৈষম্য জারী আছে বর্ণপ্রথার কারণে। এর কারণে ভারতের মধ্যে নিম্নবর্ণ ও হরিজন বলে কথিত অচ্ছুৎ কোটি কোটি মানুষ অবিরাম বৈষম্য, বঞ্চনা ও নিপীড়নের শিকার। বিভিন্ন অঞ্চলে তারা বিভিন্ন সময় এমন ধরনের বর্বরতার শিকার হচ্ছেন যেগুলো বিশ্বাস করাও কঠিন।

ভারতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তার ব্যাপক আঞ্চলিক বৈষম্য। এটি ফেডারেল ধরণের রাষ্ট্র, যেখানে আইন অনুযায়ী প্রতিটি রাজ্যের উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকলেও বাস্তবে ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। বেশ কিছু রাজ্য এখন সরাসরি সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্বের মধ্যে, কার্যত সামরিক শাসনের অধীনে। সেখানে সামরিক বাহিনী আটক, নির্যাতন, হত্যা, গুমসহ যা খুশি তাই করতে পারে। এর জন্য তাদের দায়মুক্তি দেয়া আছে। এর বাইরে অন্য রাজ্যগুলোর মধ্যে বেশ পার্থক্য দেখা যায়। কোন রাজ্যের উন্নয়ন পরিকল্পনায় হয়তো নয়া রক্ষণশীল বাজারী মতাদর্শ সাংঘাতিক রকমের আধিপত্য বিস্তার করেছে। আবার কোন রাজ্যে বামপন্থীরা ক্ষমতায় থাকবার কারণে সেখানে ভূমি সংস্কার বা অন্যান্য ক্ষেত্রে ভিন্ন ধরনের কিছু অভিজ্ঞতা সৃষ্টি হয়েছে। আবার কোন কোন রাজ্যে উন্নয়ন বলতে সাধারণভাবে যা বোঝায় যেমন অবকাঠামো, শিক্ষা, চিকিৎসা, শিল্পায়ন ইত্যাদির উন্নয়ন, সেগুলোও ঠিকভাবে ঘটেনি।

ভারতে সবচাইতে পশ্চাদপদ, সবচাইতে দুর্বল কিংবা অনগ্রসর রাজ্যগুলোর মধ্যে আছে বিহার, ঝাড়খন্ড, ছত্তিশগড় এবং উড়িষ্যা। এই অঞ্চলগুলো আবার খনিজ সম্পদের দিক থেকে সবচেয়ে বেশী সম্পদশালী। ভারতের যত বড় বড় খনি আছে সেগুলো প্রধানত এ সমস্ত অঞ্চলে অবস্থিত। আর এই অঞ্চলগুলোতেই দারিদ্র্য সবচেয়ে বেশী, এবং এসব অঞ্চলে জাতিগত, বর্ণগত, শ্রেণীগত নিপীড়ন ও বৈষম্যের হারও বেশী। একইসঙ্গে এসব অঞ্চলে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধাও অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক কম। পাঞ্জাব শিল্পে উন্নত, জিডিপি'র হিসেবে অন্যরাজ্যগুলোর তুলনায় উপরের দিকে। কেরালা শিল্পে উন্নত নয় কিন্তু জাতিসংঘের হিউমেন ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স (এইচডিআই) অনুযায়ী কেরালা দীর্ঘদিন সবার উপরে। এই ইনডেক্স বা সূচক নির্ধারণ করা হয় জাতীয় আয়ের সঙ্গে শিক্ষা, চিকিৎসাসহ আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে অগ্রগতি মিলিয়ে। পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ কিছুটা অগ্রগতি অর্জন করেছে। কিন্তু কেরালার অগ্রগতি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে আগের অর্জনে ক্ষয় দেখা যাচ্ছে। এই ধরনের বিভিন্নমুখী বিভিন্ন মাত্রার বিভিন্ন স্তরের অঞ্চল নিয়েই ভারত।

এর মধ্যে ভারতের অর্থনৈতিক শক্তির জায়গা তৈরী হয়েছে তার ঐতিহাসিক ভিত্তির কারণে। ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটবার পর যে সরকার গঠিত হয় তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জওহরলাল নেহেরু। তাঁর মধ্যে রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের ধারণা ছিল। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে জাতীয় উন্নয়ন অনুসন্ধান দেখা যায়। জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া ডেভেলপমেন্টের লক্ষ্য তাঁর সামনে ছিল। সেরকম শ্রেণীভিত্তিও ছিল। সেই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী ভারত যাত্রা শুরু করে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলো সেই কাঠামোতেই গ্রহণ করা হয়। রাষ্ট্রের সরাসরি উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের স্থাপন ও বিকাশ ঘটানো হয়। জাতীয় শিল্পের ভিত্তি তৈরী করা, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান তৈরী করে দ্রুত অগ্রগতি অর্জনের চেষ্টা করা, দক্ষ জনশক্তি তৈরী করা, বিভিন্ন রাজ্যে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা, শিক্ষা-চিকিৎসা, ভূমি সংস্কারের বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে ৫০, ৬০ ও ৭০ দশকে ভারত একটি টেকসই শিল্প ভিত্তির উপর দাঁড়ায়।

ভারত ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকালে সারা পৃথিবীতে দুটো রাষ্ট্রীয় শক্তি ছিল প্রধান, একদিকে যুক্তরাষ্ট্র অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯৪৫ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময় ছিল যুক্তরাষ্ট্রের উত্থানের সময়। জাপানে পারমাণবিক বোমায় লক্ষাধিক মানুষ হত্যা করে তার সন্ত্রাসী যাত্রা শুরু। সেই সময়কালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান কাজ ছিল সারা বিশ্বজুড়ে তার শাসন ব্যবস্থাকে গঠন ও পুনর্গঠন করা এবং

তার ক্ষমতার জালকে বিন্যস্ত করা। তার জন্য তারা সামরিক, বেসামরিকসহ বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দখলে নিয়ে আসার কাজগুলো করেছে। ঠিক এই সময় বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ-এরও জন্ম হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের জন্য যে প্রাতিষ্ঠানিক হাতিয়ারের দরকার ছিল সেটি এই প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের মাধ্যমে পূরণ করা সহজ হয়। অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ইউরোপ ক্ষত-বিক্ষত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন গুরুতরভাবে বিপর্যস্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে যতগুলো দেশ জড়িত ছিল তার মধ্যে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় অক্ষত ছিল। শুধু পার্ল হারবার ছাড়া অন্য কোন আঘাত তার গায়ে লাগেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর প্রায় অক্ষত অবস্থায় সামরিক শক্তি এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা দিয়ে সারা দুনিয়ায় দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তরাষ্ট্র অগ্রসর হয়।

১৯৪৫ সাল থেকে পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ যে কাজ করে সেগুলোর উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব যুক্তরাষ্ট্রেরই ছিল। প্রতিষ্ঠাকালের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ছাড়া কেউ বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট হতে পারে না। যে সমস্ত দেশ তখন স্বাধীনতা লাভ করছে তাদের নিজের আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ-এর মাধ্যমে ঋণ এবং অন্যান্য জাল বিস্তার করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য খুব কার্যকর ছিল। আরেকটি বিষয় হচ্ছে নিরাপত্তা। এখনও আমরা প্রায়শই সন্ত্রাসবিরোধী তৎপরতার নামে এই আওয়াজ শুনি। সে সময় নিরাপত্তার আওয়াজ কমিউনিজমএর ভয় দেখিয়ে ছড়ানো হত। নিরাপত্তার আওয়াজ তুলে নানারকম চুক্তি করার কাজটি অনায়াসে তারা করতে সক্ষম হয়েছে। পাকিস্তান প্রথম থেকেই এই যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্বের মধ্যে ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে সিয়াটো ও সেন্টো চুক্তি; পাকিস্তান, ইরান এবং তুরস্ককে নিয়ে রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন (আরডিসি) গঠন সেই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

সেই সময়ের অন্য আরেকটি ঘটনা খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেটি হল ১৯৪৯ সালের চীনের বিপ্লব। প্রথমে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পরবর্তীতে চীন বিপ্লব হওয়ার পরে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের হুমকির কারণে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান কাজ ছিল পুঁজিবাদের নেতা হিসেবে 'সমাজতন্ত্র ঠেকানো'। সমাজতন্ত্র ঠেকানোর জন্য কিংবা তার অছিলায় যা যা করণীয় সেটি করা জায়েজ গণ্য করেই তারা সব আগ্রাসী কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনকে মোকাবিলা এবং কোরিয়ায় যুদ্ধ বাঁধানোর কাজগুলো করতে গিয়ে আঞ্চলিক বিভিন্ন ধরনের ট্রিটি বা চুক্তির মধ্য দিয়ে সামরিক ঘাঁটি করার দিকে অগ্রসর হয় যুক্তরাষ্ট্র। এরপর আসে ভিয়েতনাম যুদ্ধ।

ভারত যেখানে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করে নিজস্ব একটি ভিত্তি তৈরী করলো, সেখানে পাকিস্তান তার নিজদেশের পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য হার্ভার্ড থেকে

বিশেষজ্ঞ নিয়ে আসে । পাকিস্তানকে ল্যাবরেটরি টেস্ট কেস হিসেবে গণ্য করলো যুক্তরাষ্ট্র, যে ল্যাবরেটরির মধ্য দিয়ে তারা তাদের হাতিয়ার হিসেবে পাকিস্তানকে ব্যবহার করবার জাল সাজায়। সিয়াটো ও সেন্টো চুক্তি নিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিও সাংঘাতিকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। ১৯৫৭ সালে অনুষ্ঠিত কাগমারী সম্মেলনে মৌলানা ভাসানী সিয়াটো, সেন্টো চুক্তি এবং তার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বের করে আনার জন্য দাবী-দাওয়া উত্থাপন করলেন। তার কারণে আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে গেলো। তৎকালীন আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন মৌলানা ভাসানী, বিভাজনের পর একই বছর মৌলানা ভাসানী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গড়ে তুললেন।

১৯৫৭ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান কোন স্থিতিশীল সরকার তৈরী করতে পারেনি। প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে একের পর এক সরকার পরিবর্তন হয়েছে। রাজনৈতিক ব্যবস্থা সুস্থির হয়নি। সেখানে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও কোন ধারাবাহিকতা ছিল না। নিজস্ব সক্ষমতা তৈরীর দৃষ্টিভঙ্গীই ছিল অনুপস্থিত। সেই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী এবং লক্ষ্য নিয়ে কোন সরকারী প্রশাসন কিংবা রাজনৈতিক বিধি ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। সুস্থিরতা ও উন্নয়নের অজুহাতে ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী হলো। প্রথম থেকেই অর্থনৈতিকভাবে নাজুক এবং বিশ্ব রাজনীতিতে নতজানু পাকিস্তান মার্কিন প্রভাবাধীন সামরিক বেসামরিক আমলাতন্ত্রের জালে এর ফলে চিরস্থায়ীভাবে আটকে গেলো। জন্মের পর থেকে এ পর্যন্ত তার এই হাল অব্যাহত আছে। বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা বোঝার জন্যও এই প্রেক্ষাপট আলোচনা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাংলাদেশ ঐ কাঠামোর মধ্যেই ছিল, এবং তারই ধারাবাহিকতায় চলছে এখনও।

॥ ৩ ॥

১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের নেতৃত্বে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী হলো। এই অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য পাকাপোক্ত করার অন্যতম একটি স্তম্ভ হিসেবে পাকিস্তান আগে থেকেই ঝুলে ছিল, এরপর একদম আটকে গেলো। অব্যাহত সামরিক শাসন এবং সাম্রাজ্যবাদের খুঁটি হিসেবে ভূমিকা পালনের কারণে পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, বিধিব্যবস্থা এবং সংস্কৃতি কখনোই ঠিকভাবে দাঁড়াতে পারেনি। দক্ষিণ এশিয়াসহ বিভিন্ন উপনিবেশ-উত্তর রাষ্ট্রগুলো সম্পর্কে হামজা আলাভি বলেছেন, 'এ সমস্ত দেশে বেসামরিক এবং সামরিক আমলাতন্ত্র ওভার ডেভেলপড। অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার তুলনায় আমলাতন্ত্র এবং সেনাবাহিনী অনেক বেশী শক্তিশালী, সংগঠিত এবং বিকশিত। তার কারণে এ সমস্ত দেশে বেসামরিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা কখনো স্থিতি অর্জন করতে

পারে না। হয় বেসামরিক আমলাতন্ত্র না হয় মিলিটারী আমলাতন্ত্র আধিপত্য বিস্তার করে।' এই অবস্থার পরিবর্তনে বড় আকারের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তির সমাবেশ ও তার ভূমিকা দরকার হয়।

বাংলাদেশ পাকিস্তানের কাছ থেকে তার প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা এবং অতিবিকশিত বেসামরিক-সামরিক আমলাতন্ত্র উত্তরাধিকারসূত্রেই লাভ করে। এই অবস্থা থেকে মুক্ত হবার প্রতিশ্রুতি নিয়েই ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু তা সেই প্রয়োজনীয় গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তির সমাবেশ নিশ্চিত করতে পারেনি। ৪০ বছরেও নয়। পুরনো ধারা পরিবর্তন করার জন্য নীতি ও দর্শন পরিবর্তনের উদ্যোগ দেখা গেল না, প্রয়োজনীয় নতুন রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিক কোন বিধি-ব্যবস্থা তৈরী হতে পারলো না। পূর্বের পুরো ব্যবস্থাটিকে পরিবর্তনের সূচনা করার কোন চিন্তা বা ক্ষমতা বা শ্রেণীগত দিকদর্শন কোনটিই শাসক দলের ছিল না। যার ফলে ১৯৭৩ সালের মধ্যেই আগের মতো দেশের স্নায়ুযন্ত্রে প্রবেশ করে বিশ্বব্যাংক আইএমএফ, পুনর্বাসিত হয় পুরনো আমলাতান্ত্রিক কাঠামো। ১৯৭৫ সালের পর থেকে পূর্বের ন্যায় সামরিক শাসন, বিশ্বব্যাংক গোষ্ঠীর দাপট এবং আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে বাংলাদেশের জনগণ আবারো প্রবেশ করে। লুটেরা রাজত্ব অবাধ এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। আর পাকিস্তান? ক্রমে গভীর খাদে তার পতন।

অন্যদিকে, আগেই বলেছি, শুরু থেকেই ভারতের যাত্রা ভিন্ন হয়। তার শক্তির উৎস হলো শারীরিক অবস্থান ছাড়াও ক্রমান্বয়ে গড়ে তোলা জাতীয় শিল্প ভিত্তি। সেই ভিত্তির কারণে তার রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেও একটি ধারাবাহিকতা তৈরি হয়। এই প্রক্রিয়ায় তার রাষ্ট্রীয় সীমানায় একটি শক্তিশালী বড় বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ সম্ভব হয়েছে। এর ভিত্তি তৈরী হয়েছিল সে সময়ই। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান যখন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বাহন, মাধ্যম বা হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে, সেই সময়কালে, তার বিপরীতে ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছে। ১৯৬২ সালে চীনের সাথে ভারতের যুদ্ধ বাঁধে। একইসময় চীনের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের দীর্ঘস্থায়ী মতাদর্শিক বিরোধের সূচনা হয়। তার ফলে, চীনের সাথে ভারতের সংঘাত সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। বরং সেটি আরও জোরদার হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বন্ধু খুঁজতে গিয়ে চীন অন্যদিকে ঝুঁকেছে পাকিস্তান ও ক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের দিকে।

পৃথিবীর অনেক দেশের সংবিধানের মতো ভারতের সংবিধানেও সমাজতন্ত্র শব্দটি আছে। 'অধনবাদী পথে সমাজতন্ত্র' হবে – এই তাত্ত্বিক প্রস্তাবনারও অনেক জোর ছিল ৭০ ও ৮০ দশক জুড়ে। সোভিয়েত সমর্থনে ভারতে সমাজতন্ত্র না হলেও, রাষ্ট্রীয় অনুকূল পরিবেশে ভারতে একটি শক্তিশালী শিল্পভিত্তি তৈরী হয়েছে।

টাটা, বিড়লা, গোয়েঙ্কা নামের বাণিজ্যিক গ্রুপগুলো যারা ভারত থেকে জন্ম নিয়ে এখন বহুজাতিক কর্পোরেশন বলে পরিচিত, যাদের সারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিনিয়োগ আছে, তাদের ভিত্তি সে সময়েরই। কয়েক বছর আগে বাংলাদেশে টাটার বিপজ্জনক বিনিয়োগ প্রস্তাব নিয়ে জাতীয় কমিটি থেকে আমরা যখন বিরোধিতা করছিলাম সে সময় অনেকে বলেছেন, 'টাটার রেকর্ড খুব ভাল এবং টাটা একটি বিখ্যাত গ্রুপ অব কোম্পানিজ। টাটা খুব শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। ইনোভেটিভ এবং উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান হিসেবে টাটা যদি বাংলাদেশে আসে তাহলে বাংলাদেশের জন্য তা খুব ভাল হবে।' কোন কোন পত্রিকায় টাটার পক্ষে যুক্তি দাঁড় করাতে গিয়ে অদ্ভুত কিছু কথাও বলা হয়েছিল, যেমন 'রতন টাটার মুখের হাসি খুব সুন্দর। যার মুখের হাসি খুব সুন্দর তারা বাংলাদেশের কোন ক্ষতি করবে এটি বিশ্বাসযোগ্য নয়। সুতরাং যারা মনে করে যে, টাটার বিনিয়োগের ফলে দেশের ক্ষতি হবে তারা ভুল ধারণা করছেন।'

রতন টাটার মুখের হাসি সুন্দর হোক কিংবা অসুন্দর হোক টাটা যে একটি বিশাল প্রতিষ্ঠান এতে বিতর্কের কিছু নেই। কিন্তু টাটা যে এরকম সফল প্রতিষ্ঠান হিসেবে তৈরী হলো, সেটি হতে পারতো না যদি ভারত প্রথম থেকেই বাংলাদেশের মতো উন্নয়ন নীতিমালা কিংবা দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতো। বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক দর্শন ও উন্নয়ন নীতিমালার মধ্যে জাতীয় শিল্পভিত্তি ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান তৈরীর কোন কার্যকর পরিকল্পনা বা দৃষ্টিভঙ্গী নেই, যা ভারতের ছিল। বাংলাদেশের সরকারগুলো উন্নয়ন নীতিমালা তৈরীর জন্য ডিকটেশন নেয় বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ কিংবা বহুজাতিক কোম্পানি কিংবা ইউএস দূতাবাস থেকে। ভারতে ৫০, ৬০,৭০ এমনকি ৮০'র দশক পর্যন্ত এমন কোন অবস্থা দেখা যায় না যে ভারতীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ডিকটেট করছে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ কিংবা মার্কিন দূতাবাস।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাদের রাষ্ট্রীয় শিল্প ভিত্তি নির্মাণে সহায়ক হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের শিল্প ভিত্তি তৈরী করার জন্য বিশেষ করে স্টিল থেকে শুরু করে বৃহৎ শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছিল নানাভাবে; বার্টার সিস্টেমের মাধ্যমে কিংবা সরাসরি তাদের বিশেষজ্ঞ ও প্রযুক্তি দিয়ে। সোভিয়েত সহায়তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য্য নিয়ে সে সময় নানা ধরনের যুক্তি, পাল্টা যুক্তি দেখা যায়। সোভিয়েত পন্থীদের যুক্তি ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়নের এই সহযোগিতার মধ্য দিয়ে ভারত ক্রমান্বয়ে সমাজতন্ত্রের দিকে যাবে। এই যুক্তি যে কতটা ভুল ছিল সেটি এখন বোঝাই যাচ্ছে। কারণ, ভারত রাষ্ট্র ও শ্রেণীশক্তির শাসন যেধরনের ছিল সেখানে রাষ্ট্রীয় মালিকানার ব্যাপ্তি যতই হোক না কেন, শেষ বিচারে এটি বৃহৎ বুর্জোয়াকে পরিপুষ্ট করেছে।

এই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হবে যে, পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে এমন কোন দেশ নেই যেখানে রাষ্ট্রায়ত্ত খাত খুব দুর্বল, ভঙ্গুর অথচ ব্যক্তি

মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান খুব শক্তিশালী। যদি প্রাইভেট সেক্টর বা প্রাইভেট উদ্যোগকেও শক্তিশালী ও সংগঠিত করতে হয় তাহলে অবশ্যই পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে নানা ধরনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সক্ষমতা তৈরী করতে হয়, শক্তিশালী করে, ব্যক্তিমালিকানাধীন উৎপাদনশীল বিনিয়োগ প্রসারে আনুকূল্য দিতে হয়। আবার এ ধরনের উদাহরণ পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে নেই যে, প্রাইভেট সেক্টর খুব দুর্বল কিন্তু রাষ্ট্রীয় খাত খুব শক্তিশালী। দু'টো পাশাপাশি চলে। ভারতে বরাবর বড় বুর্জোয়াজী বা বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী বা গ্রুপ অব কোম্পানি গুলো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান থেকে নানাভাবে সহযোগিতা পেয়েছে। পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে রাষ্ট্রীয় সরাসরি সমর্থন ছাড়া, পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কোন রাষ্ট্রেই এমনকি খোদ যুক্তরাষ্ট্রেও, বেসরকারী খাতের বিকাশ ঘটে নি। বাজার প্রক্রিয়ার 'অদৃশ্য হস্ত' দিয়ে পুঁজিবাদ কখনো বিকশিত হতে পারে না। নানাভাবে রাষ্ট্রের নিকট থেকে ভর্তুকি নেয়া, সমর্থন নেয়ার মধ্য দিয়ে তা অগ্রসর হয়।

ভারতের নীতি স্তরে বড় ধরনের পরিবর্তন আসে কিংবা যে পরিবর্তন অনিবার্য ছিল, তা আসে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে। মনমোহন সিং এবং অন্যদের নেতৃত্বে ভারতে প্রাইভেটাইজেশনের বড় ধরণের উল্লম্ফন ঘটে। নবরত্ন বলে পরিচিত নয়টি বড় বড় ক্ষেত্র (তেল, গ্যাস, এনার্জিসহ আরও অন্যান্য খাত) তারপরও রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায়, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে। এখন পর্যন্ত মাইনিং কিংবা গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের ব্যাপারে ভারতীয় সংস্থা রাষ্ট্রীয়ভাবে শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশী নিয়ন্ত্রণ করে। বিদ্যুৎ খাতের বড় অংশ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে। স্টিল খাত প্রধানত রাষ্ট্রীয় খাতে ছিল, পরবর্তীকালে আস্তে আস্তে টাটা স্টিল এবং অন্যরা এ খাতকে গ্রহণ করেছে। ৯০ দশক থেকে ক্রমান্বয়ে প্রাইভেটাইজেশন হয়। যৌথ মূলধনী কারবার হয়। এবং এই সময় থেকে ভারত অনেকাংশে তার অর্থনীতি উন্মুক্ত করে দেয়, তারপরও তা বাংলাদেশের তুলনায় অনেক সংরক্ষিত। বৈশ্বিক বাজারের সাথে ভারতের যোগাযোগ অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। শুরু থেকেই ভারত ছিল পাকিস্তানের তুলনায় অনেক বেশী 'সংরক্ষিত অর্থনীতি'র দেশ। আমদানির চাইতে নিজেদের শিল্পকে সংরক্ষণ করার নীতিই ছিল তার প্রধান। একদিকে সংরক্ষণ অন্যদিকে পরিকল্পিতভাবে কোন কোন খাতকে বিকশিত করা ছিল ভারতের নীতিগত অবস্থান।

একটি উদাহরণ দেই। ৯০ দশকের প্রথম দিকে আমি আমার বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে কলকাতায় গেছি। সে সময় বিদেশ থেকে বাংলাদেশে অল্পসংখ্যক কম্পিউটার আমদানী হচ্ছে। সেই আমদানী করা কম্পিউটারের মালিক হওয়া তখন খুব প্রিভিলেজড ব্যাপার ছিল। সরকারী কর্মকর্তা যারা ছিলেন, তাদের মধ্যে সেই কম্পিউটার পাওয়া নিয়ে মাঝে মধ্যে বিবাদের কথাও শোনা যেতো। কম্পিউটার

তখন রীতিমতো যাদুর বাক্স। সেটিকে খুব যত্ন করে রাখতে হবে, না হলে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় কম্পিউটার টিকতে পারবে না! এসি রুমে রাখতে হবে। সেকারণে যে সরকারি কর্মকর্তা কম্পিউটারের অধিকার পাবে সে অবধারিতভাবে এসি রুমেরও মালিক হবে। তাই তা রীতিমতো স্ট্যাটাস সিম্বল।

যাই হোক, একইসময়কালে কলকাতায় আমরা যখন বাস টার্মিনালে যাই তখন সেখানে দেখি ভাঙ্গাচোরা টিনের ঘরে ততোধিক ভাঙ্গাচোরা কম্পিউটার নিয়ে লোকজন কাজ করছে। টিকিট কাউন্টারে টাকা-পয়সা জমা নিচ্ছে কম্পিউটারের মাধ্যমে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, কম্পিউটার ঠিকঠাকভাবে কাজ না করলে দু'চার ঘা পড়ছে তার উপর তখন আবার তা ঠিক হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থা। ছাত্র-ছাত্রীরা তখন বললো, 'স্যার, আমাদের কম্পিউটারগুলো কী সুন্দর আর ওদের কম্পিউটারের কী দশা! আমাদের দেশে কত সুন্দর সুন্দর গাড়ী আর এদের একই রকম গাড়ী।' এরকম কথা শুধু ঐ বয়সের ছেলেমেয়েদের মুখে নয়, আরও অনেকের মুখে শুনেছি। গর্ব করতে গিয়ে কী ভ্রান্তি! খেয়াল হয় না যে, ভারতের এগুলো ওদের নিজেদের তৈরি, আর আমাদেরগুলো আমদানি করা, তাতে আমাদের কোন কৃতিত্ব নেই।

ভারতে দীর্ঘদিন এ্যাম্বেসেডর গাড়ী চলছে। তার বাইরে অন্য কোন গাড়ীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেত না। বাংলাদেশের সাথে ভারতের পার্থক্যটি এখানেই। অন্যান্য শিল্পের সাথে ভারত দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার গাড়ী শিল্পকে নিরাপত্তা দিয়েছে, কোনভাবেই বাইরের গাড়ী ঢুকতে দেয়নি। এখন যে বাইরের গাড়ী ঢুকছে সেটিও জয়েন্ট ভেঞ্চারের মাধ্যমে। টাটা'র সাথে মারুতি কিংবা সুযুকি'র সাথে দেশীয় অন্য কোন কোম্পানি ইত্যাদিভাবে। জয়েন্ট ভেঞ্চার ছাড়া বাইরের কোন কোম্পানি ঢুকতে পারে না। সে সংরক্ষণ নীতি এখনো আছে। আগে সেটি আরও বেশী ছিল।

ভারতের বিশেষত্ব এই যে, দু'চার ঘা-বাড়ি দেওয়া কম্পিউটারের মাধ্যমে যে দক্ষ জনশক্তি তৈরী হলো, বাড়ি দিতে দিতে তার মধ্য দিয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরী হলো এবং এভাবে তৈরী হতে হতে ভারত বিশ্বের মধ্যে কম্পিউটার শিল্পে অনেক উপরে পৌঁছে গেল। বিপরীতে, বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত সেই কম্পিউটার আমদানীই করা হয়। মোবাইল থেকে শুরু করে কম্পিউটারের অনেক কিছু আমদানী হয় মার্কিন, সুইডেন, কোরিয়ান কিংবা জার্মান কোম্পানি থেকে কিন্তু তার উৎপাদন হয় ভারতে। আমদানীকৃত পণ্য ভারত হয়ে বাংলাদেশে আসে। ভারত হলো উৎপাদনের জায়গা আর বাংলাদেশ হলো বাজারজাতকরণের জায়গা। কারণ, বাংলাদেশে উৎপাদন বান্ধব পরিবেশ কিংবা তার ভিত্তি তৈরির উদ্যোগই দুর্বল কিংবা উৎসাহিত নয়। পাকিস্তানে যা ছিল বাংলাদেশেও তাই, আমদানি করা জিনিষপত্র নিয়েই বাহাদুরি। ঠুনকো।

পুঁজির নিজস্ব বিধি আছে কিংবা নিজস্ব একটি ভাষা আছে। নিজস্ব একটি চাহিদা আছে, ক্ষুধা আছে। যাকে বলে, ল' অব ক্যাপিটাল। পুঁজি যখন অগ্রসর হতে থাকে, পুঞ্জীভূত হতে থাকে, বড় হতে থাকে তখন তার মধ্যে চাহিদা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন তার সম্প্রসারণের চাপ তৈরী হতে থাকে। আমরা ক্রমে ভারতের মধ্যে তাই দেখলাম। আর এই ক্ষুধাবৃদ্ধির মধ্যে দিয়েই হাজির বর্তমান ভারতের চেহারা।

॥ ৪ ॥

৯০ পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বেসরকারীকরণ, বাণিজ্য উদারীকরণ বিস্তৃত হয়, বৈশ্বিক বহুজাতিক সংস্থার সাথে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরী হয়, বৈশ্বিক মূলধারার পুঁজির সাথে ভারতীয় পুঁজি আরও বেশি করে যুক্ত হয়। কিন্তু যুক্ত হলেও নিজস্ব স্বকীয়তা ছিল, পায়ের নীচের মোটামুটি শক্ত ভিত্তি নিয়েই পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতের বৃহৎ পুঁজির সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সুতরাং আন্তর্জাতিক বহুজাতিক পুঁজি কিংবা রাষ্ট্রের সাথে দর কষাকষি করতে তাদের অসুবিধা হয় না, শর্ত আরোপ করে এবং যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। বহুজাতিক পুঁজি এবং ভারতীয় পুঁজি এখন একসাথে চলে। আমরা দেখি, বহুজাতিক পুঁজির ভারতীয় চেহারা। যার ফলে, ভারতীয় পণ্য বলে এখন কোন কিছুকে আলাদা করা কঠিন।

ভারতীয় পণ্য হিসেবে যাকে আমরা মনে করছি তা হয়তো উৎপাদন করছে কোন সুইডিশ কোম্পানি কিংবা যৌথ উদ্যোগ আছে কোন কোরিয়ান, মার্কিন কোম্পানির সাথে, সে পণ্য আসছে বাংলাদেশে। মার্কিন কোম্পানি আউটসোর্সিং করছে ভারতে। কাজ দিচ্ছে ডাটা এন্ট্রি বা এ ধরনের। ভারত আবার অনেকক্ষেত্রে সেগুলোকে সাব কন্ট্রাক্ট দিচ্ছে বাংলাদেশের কোম্পানিকে। দেখা যায়, এই কাজের জন্য ভারতকে দিতে হবে হয়তো ২০,০০০ রুপি সেক্ষেত্রে বাংলাদেশকে ১৫-২০ হাজার টাকা দিলেই চলবে। এতে ভারতের নীট লাভ কিংবা মার্জিন ভাল, যার কারণে বাংলাদেশে তারা কাজ করাচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশে এধরনের অনেক প্রতিষ্ঠান তৈরী হয়েছে যেগুলো হয়তো মার্কিন কন্ট্রাক্ট কিন্তু ভায়া ভারত। এবং সেখানে কনসালট্যান্ট হিসেবে, বিশেষজ্ঞ হিসেবে যারা কাজ করছে তারা ভারতীয়। বাংলাদেশের পোশাক শিল্প, টেক্সটাইল, আইটি সেক্টর, কম্পিউটার এমনকি বাংলাদেশের বিজ্ঞাপন শিল্প, ফ্যাশন ডিজাইন, গণমাধ্যম, কনসালট্যান্সী ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রেই ভারতের লোকজনদের উপস্থিতি এখন আইনী বেআইনী দুভাবেই অনেক বেড়েছে।

বৈশ্বিক সংস্থা যেমন বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান কিংবা তাদের আশ্রিত বিভিন্ন থিংকট্যাংকই এখন বাংলাদেশের নীতি-পরিকল্পনা প্রণয়ণ করে। তারা যে নীতিগুলো প্রণয়ণ করছে এবং বাংলাদেশের সরকার, আমলাতন্ত্র বস্তুগত কিংবা অন্য কোন সুবিধার জন্য যেগুলোকে বুঝে কিংবা না বুঝে গ্রহণ করছে, সেগুলোতে বাংলাদেশের পরিবর্তে লাভবান হচ্ছে অন্যদের সঙ্গে ভারতীয় পুঁজিও। অর্থাৎ বাংলাদেশের জন্য প্রণীত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর দেওয়া ফর্মূলা ভারতীয় পুঁজির সম্প্রসারণেই কাজ করছে। উদাহরণ হিসেবে অনেকগুলো বিষয়ের উল্লেখ করা যায়। বাংলাদেশের পাটকলগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া কিংবা সেগুলোকে সংকুচিত করার ব্যাপারে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের চাপ ছিল। পাটকল বন্ধ করার জন্য ঋণ প্রদান করে বিশ্বব্যাংক। ফলে আদমজীসহ অন্যান্য পাটকল বন্ধ হলো। এখন আমরা শুনছি যে, পাটকলগুলোকে আবার চালু করা হবে। কিন্তু যা ধ্বস নামার তা আগেই হয়েছে। অন্যদিকে, ভারতে পাট নিয়ে রাষ্ট্রের হস্ত ক্ষেপ ও উদ্যোগ আমরা দেখেছি। তারা নতুন নতুন পাটকল তৈরী করার জন্য, তার নিশ্চিত বাজার তৈরীর জন্য আইন করেছে, প্রতিষ্ঠান তৈরী করছে। পাটের আন্ত র্জাতিক বাজার দখল করার জন্য ভারত কিভাবে মরিয়া হয়ে কাজ করছে সেটিও আমরা দেখেছি। রাষ্ট্র এবং ব্যক্তিমালিকানা হাতে হাত ধরে পাটশিল্পের জন্য একসাথে কাজ করছে, একসাথে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও কর্মপরিকল্পনা নিচ্ছে। বাংলাদেশের কাঁচাপাট তাদের কাঁচামাল।

কয়েকবছর আগে বাংলাদেশের টেক্সটাইল শিল্প মালিকরা সরকারের সাথে দেখা করে বাংলাদেশের টেক্সটাইলের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য নানা প্রস্তাব দিয়েছিল। এডিবি তখন সরাসরি বললো, 'বাংলাদেশের টেক্সটাইল খাতে অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে বড় অপচয়'। এডিবি'র প্রস্তাব বা নির্দেশ ছিল, ভারত থেকে কাপড় আমদানী করে পোশাক শিল্পে ব্যবহার করার ব্যবস্থা নেওয়া হলে তা বাংলাদেশের জন্য ভাল হবে। সুতরাং টেক্সটাইল শিল্প গড়ে তোলায় বিনিয়োগ বা সরকারী উদ্যোগের দরকার কী!

১৯৯৯-২০০২ সালে বাংলাদেশের গ্যাস রপ্তানির জন্য এসব প্রতিষ্ঠান মরিয়া হয়ে উঠেছিল। বহুজাতিক মার্কিন কোম্পানি বাংলাদেশ থেকে গ্যাস উত্তোলন করে ভারতে রপ্তানির জন্য পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছিল। বিশ্বব্যাংক, মার্কিন দূতাবাস, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, দেশীয় কনসালট্যান্ট, সরকার, মন্ত্রী, আমলারা সবাই মিলে রপ্তানির জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছিলো। বাংলাদেশের গ্যাস যাবে ভারতে এবং সেখানে গ্যাসভিত্তিক শিল্প-কারখানা গড়ে উঠবে – এই ছিলো তাদের কর্মসূচির সারকথা। এছাড়া ফুলবাড়ীতে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা তুলে শতকরা ৮০ ভাগ রফতানী করতে চেয়েছিল বৃটিশ কোম্পানি, সে কয়লা যেতো কোথায়? একটি বড় অংশ ভারতে। কারণ, ভারতের কোন কোন অঞ্চলের জন্য বাংলাদেশের উচ্চমানের কয়লা প্রয়োজন।

সমুদ্রের ব্লক থেকে রপ্তানির যে চেষ্টা, যার জন্য মার্কিন লবি শক্তিশালীভাবে কাজ করছে, তা যাওয়ার সম্ভাবনা ভারতে। ২০২১ সাল পর্যন্ত ভারতের বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে পরিকল্পনা রয়েছে তা বাস্তবায়নের জন্য গ্যাস পাবার সম্ভাবনা ধরে নেয়া আছে, তা বাংলাদেশ থেকে। মোদ্দাকথা, সারা দুনিয়ার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে অবস্থান, দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের অবস্থান সে রকম। ভারতে উৎপাদনমুখী যে শিল্পগুলো তৈরী হবে তার জন্য আশেপাশের প্রান্তিক অবস্থানের দেশগুলো সে কাজে সহযোগিতা করবে কাঁচামাল যোগান দেওয়ার মাধ্যমে, আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে, তাদের সাব কন্ট্রাক্টীয় সেবাদানের মাধ্যমে এবং সর্বোপরি তাদের তৈরী জিনিসপত্রের বাজার হওয়ার মাধ্যমে।

এডিবি কিংবা বিশ্বব্যাংক যেসব নীতি দেয় সেগুলো কেন ভারতের পক্ষে যায়? শুধুমাত্র এই কারণে নয় যে, ভারতীয় অনেক ব্যক্তি বিশ্বব্যাংক বা এইধরনের প্রতিষ্ঠানে আছে। ভারতের জনসংখ্যা বেশী, বিশেষজ্ঞ বেশী, দক্ষ জনশক্তি বেশী। সুতরাং এ সব প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় লোকজন বেশী দেখা যাবেই। কিন্তু শুধুমাত্র এ কারণে বিশ্বব্যাংকের দেওয়া নীতিগুলো ভারতের পক্ষে যায় না। বরং কারণ হচ্ছে, বাংলাদেশের অবস্থান এ রকম যে, বাংলাদেশের যারা বিশ্বব্যাংকে কিংবা এডিবিতে কাজ করে, বাংলাদেশের সরকারে যারা আছে তাদেরও এর থেকে ভিন্ন কোন নীতি নেই, চিন্তাভাবনা নেই। উন্নয়ন দর্শন অভিন্ন। এই উন্নয়ন দর্শন অনুযায়ী, শক্তিশালী একটি দেশ এবং দুর্বল একটি দেশ যদি পাশাপাশি অবস্থান করে তাহলে তারা যে নীতি কার্যকর করবে সেটি কোন না কোনভাবে বৈশ্বিক বহুজাতিক পুঁজির পক্ষে যাবে, আঞ্চলিক ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের বড় পুঁজির কাজে লাগবে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক একচেটিয়া স্বার্থেই এ সংস্থাগুলো নীতিগুলো গ্রহণ করে এবং কার্যকর করতে সচেষ্ট হয় তা বাংলাদেশের মতো দেশের আপেক্ষিক অবস্থানকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাকে বৃহৎ অর্থনীতির সম্পূরক অবস্থানে স্থাপন করে ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন ভারতে গেলেন চুক্তি স্বাক্ষর করতে এবং করে ফিরে এলেন তখন এসব চুক্তির পক্ষালম্বনকারী লোকজন বলেছেন, 'এভাবে কুয়োর মধ্যে বসে থাকলে হবে না। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে দুনিয়ার সাথে আমাদের যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। উন্মুক্ত হতে হবে আমাদের। এভাবে নিজেরা বিচ্ছিন্ন থাকা যাবে না। বিশ্বের সাথে যোগাযোগ না করলে আমরা কীভাবে চলবো'! এ কথাগুলো বাস্তব পরিস্থিতির সাথে মিলিয়ে পরীক্ষা করা হলে দেখা যাবে, যেটি আমি কয়েক জায়গায় বলেছি যে, যারা বাংলাদেশে এই কথাগুলো বলেন তাদের উচিৎ হচ্ছে ভারতে গিয়ে এই কথাগুলো বলা। ভারতীয় সরকারকে যদি তারা এই কথাগুলো বলতে পারতেন, 'বিশ্বায়নের যুগে আপনাদের এ ধরনের সংরক্ষণবাদী থাকা ঠিক না। সীমান্তসহ অন্যান্য ক্ষেত্রগুলো আপনাদের খুলে দেওয়া উচিৎ' তাহলেই যথার্থ হতো।

কারণ বাংলাদেশের খুলে দেওয়ার কথা কিভাবে আসে, যেখানে বাংলাদেশের সবকিছু খোলাই আছে। এদেশের দরজা, জানালা খোলার উপায় কী, যেখানে দরজা জানালা কিছুই নেই। বাংলাদেশে আমরা সকাল থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত যা কিছু ব্যবহার করি কিংবা দেখি তার অধিকাংশই তো ভারতের। বাংলাদেশের ঘরে তো ভারতকেই দেখা যায়। টিভিতে তাকালে ভারত। চলচ্চিত্র, ফ্যাশন তাও ভারত। ব্যবহার্য জিনিষপত্রের আয়নায় দেখা যায় ভারতের মুখ। ট্রাক ভারতের, বাসে উঠলে সেটিও ভারতের! অটোরিকশা, গাড়ি, রেলের বগি, তাও ভারতের। সবখানেই ভারত। তাহলে আর কী উন্মুক্ত করবো আমরা! বাংলাদেশের বাজার সৃষ্টি করতে ভারতের কোন অসুবিধা হয়নি।

ভারতবিরোধী হিসেবে যারা পরিচিত, বিএনপি-জামাত-চারদলীয় জোট, সে সরকারের সময় ভারতের বাজার তৈরীর গতি কোন অংশে কম ছিল না। কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি (স্যাপ), বিরাষ্ট্রীয়করণ (প্রাইভেটাইজেশন), নয়া উদারনৈতিক নীতিমালা (নিউ লিবারেল পলিসি) কিংবা পাট-চিনি-মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি এবং বড় শিল্পগুলো বন্ধ করে দেওয়া সম্পর্কিত বিশ্বব্যাংকের যে নীতি তার সুবিধাভোগী কে বা কারা? নিশ্চিতভাবে, ভারত। ভারতের শিল্প পুঁজির মালিক, ভারতীয় পুঁজি হলো তার মূল সুবিধাভোগী। বিশ্বব্যাংকের এসব নীতি প্রয়োগে বিএনপি, জামাত কিংবা চারদলীয় জোটের কখনো শৈথিল্য কিংবা দ্বিধা দেখা যায়নি। এসব সংস্থার নীতি দর্শন নিয়ে কোন বিতর্ক বা বিরোধিতা করতে দেখা যায়নি তাদের। ২০০২ সালে আদমজী পাটকল বন্ধ হলো এই চারদলীয় জোট সরকারের সময়। বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট উচ্চ এবং ভূয়সী প্রশংসা করে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল, 'আদমজী পাটকল বন্ধ করায় আপনাদের সাহস এবং দৃঢ়তা দেখে আমি অভিভূত'! এসব সাহস ও দৃঢ়তাই আমাদের সরকার কেবল দেখাতে পারে!!

৮০'র দশকে কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির বেশ রমরমা অবস্থা। এইচ এম এরশাদ, যার মুখে মাঝে মধ্যে ভারত বিরোধিতার কথাও শোনা যায়, তার সময় যখন বিশিল্পায়ন (ডিইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেস) প্রক্রিয়া শুরু হয়, যার ধারাবাহিকতা চলে ৯০ দশক পর্যন্ত, তার সবচাইতে বড় সুবিধাভোগী ছিল ভারত। সেই সময়েই বাংলাদেশ তাদের জন্য খুলে যায়, পরিণত হয় একটি বড় বাজারে। পরিস্থিতি এখন এমন যে, অন্য কোন বিদেশী বিনিয়োগ যদি বাংলাদেশে হয় তাহলে তাকেও ভারত হয়ে আসতে হয়, কিংবা ভারতের সাথে একধরনের বন্দোবস্ত হয়। ভারত হচ্ছে কেন্দ্র। কিছুদিন আগে ওয়ারিদ এলো মিশর থেকে, পুঁজি ও ক্ষমতার খেলায় তা হয়ে যাচ্ছে ভারতীয় এয়ারটেল। তার মানে, মোবাইল, টেলিফোন খাতও এয়ারটেলের কর্তৃত্বে যাবে। এ চিত্র শুধু বাংলাদেশের নয়। এ চিত্র নেপালের, যদিও

নেপালে এই নিয়ে দ্বন্দ্ব আছে। ভারতের সাথে টেনশন, সহিংসতা কিংবা অশান্তি যেটি শেষ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই তা সত্ত্বেও এই চিত্র অনেকখানি পাকিস্তানেরও। ভারত ও পাকিস্তানের নেতারা মাঝেমধ্যে রুটিনমাফিক শান্তির কথা বললেও শান্তি হবে না। কেননা, শান্তি করলে একটি বড় ধরনের বিপদ আছে। ভারত এ বছর সামরিক খাতে ব্যয় বরাদ্দ করছে ৩২ বিলিয়ন ডলার। এই ডলার দিয়ে সে প্রধানত: অস্ত্র কিনবে। অস্ত্র কেনা হবে আর যুদ্ধ হবে না, এমনটি তো হতে পারে না। অস্ত্র কিনতে হবে, সুতরাং যুদ্ধ যুদ্ধ ভাবও থাকতে হবে। পাকিস্তানের সাথে যদি গণ্ডগোল না থাকে তাহলে সে অস্ত্র কেনার যৌক্তিকতা কী? যদি কাশ্মীর না থাকে তাহলে সে অস্ত্রের কী উপায় হবে? গণ্ডগোল যদি না থাকে তাহলে, অস্ত্র কিনবে কী করে?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র ব্যবসায়ীদের সাক্ষাতকার গ্রহীতা একজন মার্কিন সাংবাদিক একটি বই লিখেছেন। সেখানে তিনি বলছেন, 'একজন মার্কিন আমলা বলছে, আমরা যে ঋণ দেই ভারত এবং পাকিস্তানকে, সে ঋণের অর্থ কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের কাছে ফেরৎ আসে। কীভাবে? যে ঋণ দেওয়া হয় সে ঋণের অর্থে এ সমস্ত দেশ আমাদের কাছ থেকেই অস্ত্র কেনে।' এছাড়া, তার মধ্যে জেনারেল, সেক্রেটারি, মন্ত্রী সাহেবরা যে কমিশন পায়, সে অর্থও খরচ হয় প্রধানত: ঋণদাতা দেশেই। বিমান ভাড়া, মার্কিন মুল্লুকে বাড়ি কেনা ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যয়িত অর্থ শেষ পর্যন্ত যায় মার্কিন অর্থনীতিতেই।

॥ ৫ ॥

পরবর্তী ১০ বছরের জন্য ভারতের রয়েছে বিশাল পরিকল্পনা। সে পরিকল্পনার একটি বড় জায়গা হচ্ছে বঙ্গোপসাগর। অন্যদিকে বড় শক্তি হিসেবে চীন দাঁড়াচ্ছে। চীনে সমাজতন্ত্র না পুঁজিবাদ সেটি ভিন্ন আলোচনা। কিন্তু চীন এখন বিশ্ব রাজনীতি, অর্থনীতিতে একটি বড় শক্তি। এটি বৈশ্বিক অর্থনীতি এবং রাজনীতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চীন এখন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা কেন্দ্র দেশগুলোর জন্য একটি বড় অবলম্বন, আবার বড় ধরনের ভীতিও। অবলম্বন এই কারণে যে, বর্তমান গভীর মন্দার সময় মার্কিন পুঁজিবাদ যে টিকে আছে তার বড় সহায় হচ্ছে চীন। চীন একটি বিশাল বাজার এবং এ সময় যদি সে মার্কিন সিকিউরিটি বন্ডগুলো কিনে না নিতো তাহলে মার্কিন ডলারে বড় ধরনের ধ্বস নামতো এবং আরও বড় ধরনের বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তো। চীনের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিশাল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতিও বিশাল। একদিকে অবলম্বন আবার অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বড় ধরনের হুমকি। চীন ভবিষ্যতে কী করবে, সে কী পুরো অঞ্চল নিজের দখলে নিয়ে নেবে, নাকি কী করবে ইত্যাদি সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ধারণা

নেই যুক্তরাষ্ট্রের। যার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে চীনকে মোকাবিলা করা।

আবার ভারতও এখন একটি বড় শক্তি। ভারতকে বলা হচ্ছে ক্রমবিকাশমান শক্তি। অন্যদিকে ব্রাজিলও ল্যাটিন আমেরিকায় সে ধরনের শক্তি। আফ্রিকার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকাও সে ধরনের ক্রমবিকাশমান শক্তি। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বহুজাতিক পুঁজির জন্য বড় অবলম্বন। কারণ, ভারতে তাদের রয়েছে বিশাল বিনিয়োগ, বাজার। ভারতের উপর ভর করে আশেপাশের সমস্ত দেশগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করায় ভারত হলো এই অঞ্চলের কেন্দ্র। সে হিসেবে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার আঞ্চলিক কেন্দ্র হলো ভারত। আবার ভারতকেও নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন। ভারত মহাসাগর কে নিয়ন্ত্রণ করবে? মার্কিন নেভি না ভারতীয় নেভি? তা নিয়ে টেনশন আছে। ভারতের রয়েছে আরও বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে দাঁড়ানোর সেই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এই পুরো জায়গাটার নিয়ন্ত্রণ, দখল নিতে চায় সে। তা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তার দ্বন্দ্বও আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবার ততোটা ছাড় দিতে আগ্রহী নয়। মার্কিন আবার নিয়ন্ত্রণ করতে চায় ভারতকে। ভারতকে নিয়ন্ত্রণ করা, চীনকে মোকাবিলা করার জন্য যারা হাতিয়ার হিসেবে তাদের চোখের সামনে আছে; কিংবা যে ক্ষেত্রগুলো সামনে রয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশ এবং মায়ানমার অন্যতম। পাকিস্তান যেমন হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তেমনি বাংলাদেশও তেমন একটি ফাঁদে পড়তে যাচ্ছে। বঙ্গোপসাগর নিয়ে চীন এবং ভারতের মধ্যে দ্বন্দ্বও আছে।

চীন, জাপান এবং ভারতের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব-সংঘাত নেই – এভাবে যদি চিন্তা করা যায়, তাহলে এশিয়ার অবস্থাটা কীরূপ দাঁড়াবে? কিংবা এশিয়ার অর্থনৈতিক নীতি, পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই দেশত্রয় যদি সমন্বয় করে এগুতে থাকে তাহলে সে অবস্থাটাই বা কী ধরনের হবে? তাহলে, যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ইউরোপের দাঁড়ানোর আর জায়গা থাকে? চীন, জাপান, ভারতের শক্তি, সামর্থ্য, বিশেষজ্ঞ যদি একসাথে হয় তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কী উপায় থাকে? না, তাদের আধিপত্যের আর কোন উপায় থাকে না। কিন্তু এটি হবে না। কারণ, এ সমস্ত দেশগুলোর মধ্যে নানা ধরণের দ্বন্দ্ব আছে। সবগুলো যে বানানো তা নয়। নিজেদের পুঁজিতান্ত্রিক স্বার্থগত দ্বন্দ্ব যেটি পুঁজিবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তা এই দেশগুলোতে বিদ্যমান থাকার কারণে সেটি হবে না। চীন এবং ভারতের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সেটি যাতে জারী থাকে তার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নানা ধরনের চেষ্টা আছে। এবং এই সংঘাত যাতে কোনভাবেই সমাধান না হয় তার জন্য নানা ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।

গত কয়েকদিন আগে মার্কিন নেভির একটি প্রতিনিধি দল শুভেচ্ছা সফরে বাংলাদেশে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা যদি কোথাও শুভেচ্ছা সফরে যায়

তাহলে তার চাইতে বড় কোন দুঃসংবাদ আর কিছু হতে পারে না। কোথাও যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যায় তাহলে বুঝতে হবে সেখানে অশান্তি সমাগত। অশান্তি ক্রমান্বয়ে দানা বাঁধবে। সে অঞ্চলে অশান্তি চিরস্থায়ী হবে। তো ইউএস নেভি এখানে এসেছে কী কারণে? বঙ্গোপসাগরে আমাদের নিরাপত্তা প্রদান করবে!! প্রশ্ন হচ্ছে, কার হাত থেকে তারা আমাদের নিরাপত্তা প্রদান করবে? কে আমাদের জন্য হুমকি যার নিকট থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের বাঁচাতে পারে? কিংবা পৃথিবীতে এমন কোন দেশ আছে যাকে সে বাঁচিয়েছে? এ ধরনের কোন উদাহরণ নেই। আমরা অতীতে ইউএসএ-র ৭ম নৌবহর দেখেছি। বর্তমানে ভারতকেও দেখতে পাচ্ছি। অপরদিকে মায়ানমার যে আসে সেটি আসে প্রক্সি হিসেবে, টেনশন তৈরী করার জন্য। বঙ্গোপসাগরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ যেমন আছে তেমনি আছে ভারতের। মায়ানমার ও বাংলাদেশের মধ্যে যদি টেনশন বা যুদ্ধ বাঁধানো যায় তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ভারতের এখানে আধিপত্যের জন্য যে নীতি-কৌশল, তা বাস্তবায়ন করতে পারে। এজন্য এ ধরনের ঘটনা যে কোন সময় দেখা যেতে পারে।

এমতাবস্থায়, ভারতের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেরূপ অবস্থা বিদ্যমান টিপাইমুখ বাঁধ, ট্রানজিট, ফারাক্কা, সীমান্ত সংঘর্ষ ইত্যাদি নিয়ে সেগুলোর সুরাহা হওয়া দরকার। কয়েকদিন আগে বিডিআর এবং বিএসএফের মধ্যে মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হলো যে, বিএসএফ বাংলাদেশের আর কোন নিরীহ ব্যক্তিকে হত্যা করবে না। তাহলে, এতোদিন ধরে বিএসএফ যে নিরীহ মানুষগুলোকে হত্যা করলো, তার জবাব কে দেবে? তার বিচারের কী হবে? এতোদিন তারা বলেছে যে, সীমান্ত অবৈধ অনুপ্রবেশের জন্য কিংবা চোরাচালানীর সাথে জড়িত ব্যক্তিদের হত্যা করেছে! কিন্তু ৯/১০ বছরের শিশুদের যে হত্যা করলো তার কী হবে? কিছুই হবে না। কারণ, সরকারের সেই মেরুদণ্ডটি নেই কিংবা ক্ষমতা, ইচ্ছা, অবস্থা নেই, যে বলে, 'সীমান্ত হত্যাকাণ্ডের বিচার করতে হবে এবং এই হত্যাকাণ্ড বন্ধ কর'।

টিপাইমুখ বাঁধ কিংবা সীমান্ত সংঘর্ষ কিংবা ট্রানজিট কিংবা বন্দর নিয়ে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৈশ্বিক, আঞ্চলিক রণনীতির অংশ হিসেবে এখানে নানা পরিকল্পনা করছে। নেপাল বাদে দক্ষিণ এশিয়ায় যে সমস্ত সরকার ক্ষমতায় আছে তাদের সাথে ভারত কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এসব পরিকল্পনার ক্ষেত্রে গভীর ঐক্য আছে। কিছুটা ব্যতিক্রম অবশ্য ভূটানের বেলায় দেখা যায়। সম্পূর্ণ নতুনভাবে তারা পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন পরিকল্পনা সাজাচ্ছে। ভারত এখনো ভূটানকে কব্জা কিংবা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি। এটি হতে পারে যে, ভূটান হাতের কাছে রয়েছে কিংবা যে কোন সময় তাকে ধরা যাবে এই আশায় ভারত তাকে এখন পর্যন্ত গিলে ফেলেনি। জনগণের স্বার্থ বিবেচনায় নেপাল এবং ভূটানের জনগণের

সাথে বাংলাদেশের জনগণের যোগাযোগ তৈরী হওয়া খুবই দরকার। তার ক্ষেত্রেও ভারত বড় প্রতিবন্ধক। কারণ, ভারতের টিভি, রেডিও কিংবা প্রিন্ট মিডিয়াতে বাংলাদেশের মতো দেশের জনগণের আন্দোলন, কর্মকাণ্ডকে যেভাবে উপস্থিত করা হয় তাতে ভারতের জনগণের কাছে বাংলাদেশের মতো দেশের মানুষ কখনো পরিষ্কারভাবে উপস্থিত হতে পারবে না। বিদ্বেষ কিংবা আতঙ্ক ছড়ানোর উপাাদান হিসেবে ভারতের মিডিয়াতে বাংলাদেশের জনগণ উপস্থিত হয়। এর পেছনে দু'টো বিষয় কাজ করে। এগুলো পূর্ব পরিকল্পিত, সুসংগঠিতভাবেই করা হয় একদিকে, অন্যদিকে জাতিবিদ্বেষী কিংবা বৃহৎ রাষ্ট্রসুলভ যে সংস্কৃতি কিংবা মনস্তত্ত্বের কারণে এ কাজগুলো করা হয়।

বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, যত বেশী এদেশগুলোর জনগণকে দূরে রাখা যায়, জনগণের মধ্যে যোগাযোগ যতো বিচ্ছিন্ন করে ফেলা যায়, ততই তাদের জন্য মঙ্গল। যারা বলে যে 'কানেকটিভিটি বাড়াতে হবে' তারা কিন্তু আমাদের দেশের জনগণের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিকতার সাথে ভিন্ন দেশের রাজনীতি, সংস্কৃতির যোগাযোগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে রাখে। নেপাল বাংলাদেশে আসতে পারে না। নেপালকে ভারতের উপর দিয়ে মাত্র ৩৪ কিলোমিটার ঘুরে আসতে হয়। সেজন্য একবার চুক্তিও হয় ভারতের সাথে। সবকিছু ঠিকঠাক। কিন্তু যে দিন যোগাযোগ শুরু হওয়ার কথা সেদিন ভারতীয় সীমান্তের ট্রাক মালিক সমিতি ও শ্রমিক সংগঠন ধর্মঘট ডেকে বসে এ দাবী নিয়ে যে সেদিক দিয়ে নেপালের কোন ট্রাক যাতায়াত করতে পারবে না। তাদের ট্রাক নিতে হবে। ভারত সরকার তাদের অপারগতার কথা জানায়। এছাড়া সে রাস্তাটি যথেষ্ট খারাপ, ঠিক করা হচ্ছে না যার কারণে নেপালের ট্রাকও সেদিক দিয়ে যাওয়া-আসা করতে পারছে না। এভাবে সে পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

আমরা যে বিদ্যুৎ সংকটের মধ্যে বসবাস করছি, ভূটান এবং নেপালের সে অবস্থাটি নেই। নেপাল এবং ভূটান যে পরিমাণ জলবিদ্যুৎ তৈরী করতে পারে কিংবা উৎপাদনে সক্ষম তা দিয়ে পুরো দক্ষিণ এশিয়ার বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। কিন্তু সেটি করা যাবে না। কারণ, ইউএসএইড় তা নিয়ে পরিকল্পনা করছে। এসব নিয়ে ভারত, ভারতীয় বড় বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট কিংবা আইপিপি'র নামে বিদেশী বড় কোম্পানির বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট বসানোর পরিকল্পনা করছে। অর্থাৎ তাদের লাভকে নিশ্চিত করে যে ধরণের পরিকল্পনা করা দরকার তাই তারা করছে। সুতরাং সংকটও থাকবে অনুষঙ্গ হিসেবে।

এই-ই হচ্ছে ভারত। অনেক ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যার অগ্রসর হওয়া। তবে এটিই শেষ কথা নয়। বাংলাদেশের যে কোন ধরনের পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষেত্রে ভারতের বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার।

॥ ৬ ॥

প্রশ্ন ১. কীভাবে বাংলাদেশের সক্ষমতা তৈরী করা সম্ভব?

বেশ কয়েক বছর আগে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের একটি গ্রামে গিয়েছিলাম। মঞ্জির নামে এক তরুণ শিল্পোদ্যোক্তা আমাদের নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলাম, পুরো একটি পল্লী যার নাম টাঙ্গাইল পাড়া। সেখানকার লোকজনের সাথে কথা বলে জানলাম, তাঁদের আদি বাড়ী টাঙ্গাইল। তাঁরা ছিলেন টাঙ্গাইলের তাঁতী। টাঙ্গাইলের তাঁতী এখন ভারতে উৎপাদনকাজে নিয়োজিত। এছাড়া অন্যান্য অঞ্চলের তথ্য নিয়েও জানলাম যে, বাংলাদেশের একান্ত নিজস্ব সৃষ্টি যে জামদানী তার অনেক কারিগরও এখন ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। তাঁদের দক্ষতা ও নৈপুণ্য সেই অর্থনীতির শ্রীবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে।

এটি এক ধরণের পুল বা টান। যদি বাংলাদেশে অনুকূল আবহাওয়া না থাকে কিংবা দক্ষ মানুষেরা যদি বৈরীতার সম্মুখীন হন, এবং অন্যদিকে যদি ভারতে আকর্ষণের ক্ষেত্র তৈরী হয় তাহলে দক্ষজনশক্তির এরকম স্থানান্তর হবেই। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধিবিধান, প্যাটেন্ট রাইট ইত্যাদির কারণে ভবিষ্যতে আরও কঠিন অবস্থা তৈরী হতে যাচ্ছে। মেধাস্বত্ব আইন অনুযায়ী, যদি তারা প্যাটেন্ট করে ফেলে তাহলে ভবিষ্যতে দেখা যাবে আমাদের জামদানী কেনার জন্য তাদের প্যাটেন্ট ফিও দিতে হচ্ছে। এখন তো ডাকাতির মতো বহু ধরনের জিনিসের প্যাটেন্ট হচ্ছে। দেশের চালের বহু ধরনের বীজ প্যাটেন্ট হয়ে যাচ্ছে, গাছ প্যাটেন্ট হচ্ছে, অনেক ধরনের ছোলা প্যাটেন্ট হচ্ছে। এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বিশ্বের শতকরা ৭০-৮০ ভাগ প্যাটেন্ট নিয়ন্ত্রণ করে।

ভারত সেখানে তাদের সাথে প্রতিযোগিতা করছে। ভারত নিজেও হুমকির মুখে। তাই সে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। ভারতের নিমগাছ প্যাটেন্ট করে ফেলেছিল বহুজাতিক কৃষি কোম্পানি। ভারতের মধ্যে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে ওঠেছিল এবং শেষ পর্যন্ত সেটি রোধ করা গেছে। বাংলাদেশে এসব বিষয়ে কোন মনোযোগ নেই। যাই হোক, এ ঘটনা ঘটতেই পারে, এবং সেটিতে তারা সফলও হতে পারে, যদি বাংলাদেশে এই বিষয়গুলোকে মোকাবেলা করার মতো অবস্থা না থাকে। বিশেষত যদি উৎপাদন প্রক্রিয়া, ম্যানুফ্যাকচারিং, উদ্যোক্তা এখানে সেভাবে বিকশিত না হয় তবে দেখা যাবে ভরকেন্দ্রটি আরও দ্রুত ভারতের দিকে চলে যাবে। তারপর সেখান থেকে সাব-কন্ট্রাক্ট নিয়ে এখানে কাজকর্ম করা হবে। যেমনঃ আমাদের দেশে অনেকে জুতা সেলাই করে, ছোটখাট জুতা সেলাই করার কারখানা আছে তাদের, নিজ ঘরের

মধ্যেই অনেক কারখানা। বর্তমানে এধরনের অনেকে এখন জুতা প্রস্তুত করেন বাটা-র জন্য। বাটার দোকানে যে জুতা আমরা দেখি তার খুব ক্ষুদ্র অংশ বাটার ফ্যাক্টরিতে উৎপাদন হয়। বেশীরভাগ উৎপাদন হয় এসমস্ত ছোট ছোট কারখানায়। জুতা পরিচিত হয় বাটা নামে। কারণ, বাটার সেই প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা, ব্যবস্থাপনা ও স্বত্ত্বাধিকার আছে।

বাংলাদেশের বর্তমান উন্নয়ন ধারা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে দেখা যাবে বাংলাদেশ সাব-কন্ট্রাক্ট নিয়ে, এখানেই উৎপাদন হচ্ছে হয়তো, কাজ করছে। কিন্তু তার উপর কর্তৃত্ব না থাকার কারণে সেটি ভারতের প্রোডাক্ট হিসেবে আন্তর্জাতিক বাজারে বাজারজাত হবে, বাটা'র মতো। অধস্তন অবস্থানেই থাকবে বাংলাদেশ। অতএব বাংলাদেশের জাতীয় সক্ষমতা নিশ্চিত করবার পূর্বশর্ত হল, বিদ্যমান উন্নয়ন ধারা বা দর্শন এর আমূল পরিবর্তন।

প্রশ্ন ২. ইউরোপে তো ট্রানজিট হচ্ছে। তার ফলে সেখানে সকলেই উপকৃত হচ্ছে। তাহলে, ভারতের সাথে বাংলাদেশের ট্রানজিট বাস্তবায়িত হলে কেন সকল দেশ উপকৃত হবে না?

বাংলাদেশে ভারতের ট্রানজিট প্রশ্ন নিয়ে যখনই কথাবার্তা হয় তখনই কেউ কেউ বলতে চেষ্টা করেন যে, ইউরোপে যদি ট্রানজিট হতে পারে তাহলে এই অঞ্চলে ট্রানজিট হতে অসুবিধা কোথায়? যারা এই প্রশ্ন করেন, জানিনা তাঁরা দুই অঞ্চলের ভূগোল, ইতিহাস, অর্থনীতির তুলনামূলক চিত্র এগুলোকে আদৌ গুরুত্ব দেন কিনা। ট্রানজিট শুধু নয়, ইউরোপের সাথে এখানকার কোন অঞ্চলের কোনদিক থেকেই তুলনা করা যায় না। ভারতের সাথেও যদি তুলনা করা যায় সেক্ষেত্রেও দেখা যাবে, ভারতের সাথে বাংলাদেশের কিংবা ভারতের সাথে পাকিস্তানের কিংবা ভারতের সাথে নেপালের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক এতো পার্থক্য পৃথিবীর আর কোথাও খুঁজে পাওয়া কঠিন। আবার এই একই দেশগুলো ঔপনিবেশিক ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত।

তারপরও ইউরোপের মতো ট্রানজিট মানে যদি এটি হয় যে, 'এক দেশ অন্য সব দেশের মধ্যে দিয়ে তৃতীয় বা চতুর্থ বা যে কোন দেশে যেতে পারবে', তাহলে নিশ্চয়ই উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু তা যদি না হয় তাহলে উপকৃত হওয়ার চাইতে বিপদগ্রস্ত হবার সম্ভাবনাই বেশি। ভারতকে দেওয়া ট্রানজিট সেজন্যই ইউরোপের সাথে তুলনীয় নয়। ভারতের জন্য যা প্রয়োজনীয় তাহলো, বাংলাদেশ হয়ে তার নিজেরই অন্য অঞ্চলে যাতায়াত করা। বাংলাদেশের রাস্তা-ঘাট ভারত ব্যবহার করবে তার এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে মালামাল আনা-নেওয়ার জন্য। কিন্তু বাংলাদেশ কোথায় যাবে? সে সম্পর্কে ট্রানজিট চুক্তিতে আর কোন বক্তব্য নেই। নেপাল বিষয়ে তো আগেই চুক্তি হয়েছিল, বাস্তবায়ন হয়নি।

কেন হয়নি, সে সম্পর্কে আগেই বলেছি। বাংলাদেশ কি একদিক থেকে রওনা হয়ে, বেনাপোল পার হয়ে, কলকাতা পার হয়ে, দিল্লী পার হয়ে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, ইউরোপসহ বিভিন্নদিকে যাবে? ভারতের জন্য বিভিন্ন বন্দর নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। সে সুবিধা কি বাংলাদেশের থাকবে? বাংলাদেশের জন্য কোন কোন পোর্টে কী কী করা হবে? ট্রানজিট যদি সবার জন্য প্রযোজ্য হয় তাহলে বাংলাদেশের তিনদিকে ভারতের কাঁটাতার আর সীমান্ত হত্যাকান্ড কেন?

ট্রানজিট সম্পর্কিত যে বিধি-ব্যবস্থা কিংবা উদ্যোগ, সেগুলোর ক্ষেত্রে ইউরোপের সাথে দক্ষিণ এশিয়ার চিত্রে ভিন্নতা বুঝতে কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। মূল পার্থক্য হচ্ছে, ইউরোপে প্রতিটি দেশের সাথে প্রতিটি দেশেরই যোগাযোগ নিশ্চিত করা হচ্ছে, সবার জন্য অভিন্ন ব্যবস্থা। ইউরোপে ছোট একটি দেশকে তিন দিক থেকে ঘেরাও করে থাকা কোন বিশাল পরাক্রমশালী দেশ নেই। কিন্তু আমাদের এই অঞ্চলে বিদ্যমান মারাত্মক অসম সম্পর্ক বিশেষ মনোযোগ দিয়ে দেখবার প্রয়োজন সৃষ্টি করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারত যেভাবে তার নিজের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেকার যোগাযোগ নিশ্চিত করবার জন্য বাংলাদেশকে ব্যবহার করতে চাইছে তাতে এটি ঠিক ট্রানজিটের রূপেও থাকছে না।

অনেকে এতদিন বলেছেন, ট্রানজিটে বাংলাদেশের অনেক লাভ হবে, কারণ অনেক শুল্ক পাবে বাংলাদেশ। এদের দৃষ্টিতে শুল্কই বাংলাদেশের জন্য যথেষ্ট, আর কোন বিবেচনার দরকার নেই। কিন্তু কার্যকর হবার মুখে দেখা যাচ্ছে ভারত শুল্ক দিতেও রাজী নয় এবং বাংলাদেশ সরকার তাতেই সম্মতি দিচ্ছে। তাহলে লাভটা কী হল? ভারতের জন্য নতুন নতুন সড়ক নির্মাণ হবে। এরফলে কত ধানীজমি বিনষ্ট হবে, নিজেদের পণ্য পরিবহণ কতটা বাধাগ্রস্ত হবে, কতটা বোঝা সৃষ্টি হবে বাংলাদেশের জন্য তার কোন হিসাব সরকার এখনও উপস্থিত করেনি। ভারত ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করে যাচ্ছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশের বিনিয়োগের জন্য ভারতে সরাসরি সরকারী নিষেধাজ্ঞা ছিল গত বছর পর্যন্তও। কিন্তু অলিখিত প্রতিবন্ধকতা এখনও পর্বতপ্রমাণ।

এছাড়া ভারতের 'নিরাপত্তার সমস্যা' আছে। কারণ ভারত বাংলাদেশকে মনে করছে একটি সন্ত্রাসী এলাকা। সন্ত্রাসী মনে করার কারণে বাংলাদেশের তিন দিকে কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। আমি কিছুদিন আগে নাফ নদী দিয়ে যাচ্ছিলাম, সেখানে দেখলাম, ওপারে কাঁটাতারের মতো দেখা যাচ্ছে। ভারতের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে কিংবা প্ররোচিত হয়ে মায়ানমারও কাঁটাতার দিচ্ছে বাংলাদেশকে ঘিরে। এখন, যে দেশ সম্পর্কে এতোটা অবিশ্বাস কিংবা ভীতি, সেই দেশের মধ্য দিয়ে, ভারতীয় জিনিসপত্র যাবে একমাথা থেকে আরেকমাথায়, কীভাবে? নিরাপত্তার জন্য তারা তখন কী করবে? এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কিন্তু এসব প্রশ্ন অমীমাংসিতই থেকে যাচ্ছে।

ট্রানজিটের বিকল্প কি খোঁজ করা সম্ভব যাতে ভারতও লাভবান হবে, বাংলাদেশও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না? এ বিষয়ে আমি একটি প্রস্তাব বিভিন্ন সময়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি – যেটি দুই দেশের জন্যই গ্রহণযোগ্য হতে পারে। ভারতের এতো কষ্ট করে, এতো দূর থেকে তার পণ্যসামগ্রী নিয়ে পূর্ব ভারতে যাওয়ার ঝুঁকি নেবার বা ব্যয় করবার দরকার নেই। সে দায়িত্ব বাংলাদেশই নিতে পারে। সহজ সমাধান হল, তার পরিবর্তে ভারতের সীমান্ত জুড়ে, কিংবা পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলাদেশের শিল্পোদ্যোক্তারা শিল্প-কারখানা তৈরী করবেন। ভারত এক্ষেত্রে জানাতে পারে কোন কোন শিল্প করলে তাদের জন্য ভালো হয়, সে অনুযায়ী বাংলাদেশ উদ্যোগ নেবে, আর সে ব্যাপারে ভারত প্রয়োজনে কাঁচামাল ও প্রযুক্তি সরবরাহ নিশ্চিত করবে। উৎপাদিত শিল্প পণ্যগুলো ভারতের চাহিদা অনুযায়ী তাদের কথিত পশ্চাতপদ অঞ্চলে বাজারজাত করা হবে। এই ব্যবস্থা দুদেশের জন্যই ভালো, বিনিয়োগ কর্মসংস্থান এবং পণ্য সরবরাহ সব দিক থেকেই। আবার কোন জটিলতাও নেই। তখন পূর্ব ভারতের লোকজন সস্তায় পণ্যদ্রব্য কিনতে পারবে। উত্তর ভারতকে এত দূর ঘুরে, এত পথ পাড়ি দিয়ে, কষ্ট করে বাংলাদেশে ঢুকে ঝুঁকি নেবার দরকার হবে না। এই ব্যবস্থায় সাফল্য খুব দ্রুত সম্ভব, এত সফর আর বৈঠক আর এত চুক্তি না করলেও চলবে। শুধু দরকার হবে বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার রীতিনীতির প্রতি ভারতের শ্রদ্ধাশীল হওয়া, বাংলাদেশের বিনিয়োগ ও বাংলাদেশের পণ্য ভারতে প্রবেশে যে হাজারো প্রতিবন্ধকতা আছে তা দূর করায় যত্নশীল হওয়া। তাহলেই হবে।

প্রশ্ন ৩. মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সমুদ্রে এক ধরণের উত্তেজনা কাজ করছে। যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জনগণের কী ভূমিকা রাখা উচিৎ?

জনগণের ভূমিকা হবে যুদ্ধবিরোধী। মায়ানমারের জনগণের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আওয়াজ তোলা ও তার জন্য কাজ হবে প্রধান করণীয়। যে কোন যুদ্ধ করার সময় শাসকগোষ্ঠী জাতীয়তাবাদী একটি আওয়াজ তোলে। এবং তারা পুরো জনমতকে, তাদের সম্পদকে এই যুদ্ধের পেছনে নিয়ে আসতে চেষ্টা করে। জনগণ অনেকসময় বুঝতেও পারেনা কীভাবে এই কাজগুলো হতে থাকে। সিনেমা তৈরী হয়, টক শো হয়, গান হয়, নাচ হয়, স্কুলে স্কুলে নানা কিছু হতে থাকে, মন্দিরে প্রার্থনা; মসজিদে দোয়া – নানাকিছু হতে হতে এমন একটি উন্মাদনা তৈরী করে মানুষের মধ্যে যে, এটিই হচ্ছে জীবনের একমাত্র অর্থ। এমনও আকাঙ্ক্ষা তৈরী হতে থাকে সমাজে যে, জনগণ ভাবতে শুরু করে, যদি জীবনও দিতে পারি দেশের স্বার্থে তাহলে জীবন সার্থক। কিন্তু এসব যুদ্ধ তো আসলে দেশের জন্য হয় না, হয় ক্ষমতাবানদের স্বার্থে। বিশ্বের নানাজায়গায় এই অভিজ্ঞতা আছে। এ থেকে

বিপ্লবীরা সতর্ক থাকার চেষ্টা করেছেন। বহু জায়গায় অনেক বিপ্লবীও এধরনের যুদ্ধবাজ জাতীয়তাবাদীতার ফাঁদে পড়েছেন।

আগ্রাসন যখন হয় তখন পরিস্থিতি ভিন্ন। যেমন প্রশ্ন এসেছে, ভারত যদি বাংলাদেশে আগ্রাসন করে সেখানে কী হবে? নিশ্চয়ই সেখানে জনপ্রতিরোধ তৈরি করতে হবে, আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হবে। একইসঙ্গে ভারতের জনগণের প্রতিও আহ্বান জানাতে হবে যে, তারা যেন এই আগ্রাসন রোধের জন্য তাদের দেশের শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

॥ ৭ ॥

সারা দক্ষিণ এশিয়ায় যে ধরনের সম্পদ আছে কিংবা সম্ভাবনা রয়েছে তা থাকা অবস্থায় ভারতে ৫০ কোটি, বাংলাদেশে ৮ কোটি কিংবা পাকিস্তানে ৮ কোটি লোকের দারিদ্রসীমার নীচে থাকার কোন কারণ নেই। এই অঞ্চলটি যথেষ্ট সমৃদ্ধ অঞ্চল হিসেবে দাঁড়াতে পারে। এরজন্য যে ধরনের রাজনৈতিক রূপান্তর দরকার, রাজনৈতিক শক্তির বিকাশ দরকার তার জন্য এই অঞ্চলের জনগণের মধ্যে যোগাযোগের বিস্তার ঘটানো প্রথম শর্ত। এই যোগাযোগের ক্ষেত্রে বামপন্থী বা জনপন্থী রাজনৈতিক দল ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেও কিছু সমস্যা আছে। ভারতীয় শাসক শ্রেণীর মধ্যে যে উগ্র শভিনিজম আছে সেটি আমরা পরিষ্কারভাবেই জানি। কিন্তু ভারতীয় বামদের বিভিন্ন ধারাও এ থেকে মুক্ত নয়। জাতীয় স্বার্থ ব্যানারে জনপন্থীদের অবস্থানও ডানপন্থী বা পুঁজিপন্থীদের আড়ালে চলে যায়।

একবার ভারতের এক কমিউনিস্ট পার্টির একজন নেতার সাথে এসব বিষয়ে কথা বলার সময় তিনি কথা ঠিকমতো না বুঝেই আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনাদের কী সাহায্য দরকার'? প্রত্যুত্তরে আমি বললাম, 'কোন সাহায্যই আমাদের দরকার নেই। আপনাদের কাছ থেকে কেউ সাহায্য চাচ্ছে না। আপনি বরং নিজেকে সাহায্য করেন। আপনার দেশে যদি অর্থপূর্ণ কোন পরিবর্তন করতে চান তাহলে পার্শ্ববর্তী দেশে প্রকৃতপক্ষে কী ঘটছে তা আপনাদের জানতে ও বুঝতে হবে। বাংলাদেশ মৌলবাদী, সন্ত্রাসী এরকম শাসক শ্রেণীর প্রচার মেশিনে যদি আপনারাও হজম হয়ে যান তাহলে হবে না। বাংলাদেশ সম্পর্কে পরিষ্কার জানেন। সেখানে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কী লড়াই হচ্ছে, সেখানে কৃষকদের মধ্যে কী অবস্থা তৈরী হচ্ছে, পরিবর্তনগুলো কী ধরনের হচ্ছে, শাসক শ্রেণী কিভাবে আছে, দ্বন্দ্বগুলো কী ইত্যাদি সম্পর্কে না জেনে পাইকারীভাবে 'মৌলবাদী' দেশ আখ্যা দিয়ে এবং বাংলাদেশে গিয়ে শাসক শ্রেণীর দলের সাথে সখ্যতা গড়ে তুললে কারও জন্যই ভালো হবে না'।

বৃহৎ রাষ্ট্র বা জাতিসুলভ অহমিকাবোধ যে সব সময়ে সচেতনভাবে কাজ করে তা নয়, এটি অনেকসময় তাদের অবস্থানগত কারণেই তৈরী হয়। অবহেলা ধরনের ব্যাপার কাজ করে। বাংলাদেশেও বাঙালী বামদের মধ্যে পাশ্ববর্তী বিভিন্ন জাতিস্বত্ত্বা সম্পর্কেও এমন মনোভাব পাওয়া যাবে, ভূটান সম্পর্কে কিংবা এদের চাইতে দুর্বল কারও সম্পর্কে হতে পারে এই ধরনের মনোভাব। এটি দূর করতে হয় ধারাবাহিক সচেতন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেটি ভারতীয় বামদের মধ্যে এখনও খুব দুর্বল। এটিকে বার বার ধাক্কা দেওয়া দরকার এবং দূর করার ক্ষেত্রে আমাদেরও সহযোগিতা করা দরকার।

নেপালে মাওবাদীরা বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে একটি অবস্থানে পৌঁছেছেন, এখন পর্যন্ত টিকে আছেন এবং ভবিষ্যতে আরও বিকাশের সম্ভাবনা আছে তার একটি কারণ হলো ভারতের মধ্য থেকে তাদের প্রতি সমর্থন। ভারতের বিভিন্ন পর্যায়ের বিশেষ করে বৃহত্তর বাম মহলের মধ্যে এবং লেখক, সাংবাদিকদের সমর্থন আদায় করতে পেরেছেন নেপালের মাওবাদীরা। এসব নিয়ে ভারতের জনগণের সাথে গণ সম্পর্ক যেভাবে তৈরী করা দরকার সেটি তাঁরা দক্ষতার সঙ্গেই করেছেন। নেপালের জনগণের সংগ্রামে এগুলো উল্লেখযোগ্য শক্তি যুগিয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় জনগণের সাথে যোগাযোগ তৈরী করার জন্য বাংলাদেশ থেকেও যে ধরনের যোগাযোগ থাকা দরকার সেটিও খুব কার্যকর বলে মনে হয় না। বিভিন্ন পার্টির সাথে ভারতের বিভিন্ন পার্টির যোগাযোগ আছে কিন্তু সেগুলো অনেকটা রুটিন ধরনের যোগাযোগ। জনগণের সাথে জনগণের যেভাবে যোগাযোগ হওয়া দরকার তা আসলে নেই। বর্তমানে যে পরিস্থিতির মধ্যে আমরা বসবাস করছি, নতুন ধরনের সাম্রাজ্যবাদী পুনর্গঠনের যে সময় আমরা পার করছি, সেখানে যতই তারা সংকটের মধ্যে পড়ছে ততই তারা ফ্যাসিবাদী হয়ে উঠছে। যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি দানব, অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু কিন্তু সামরিকভাবে ভয়ঙ্কর, সারা পৃথিবী জুড়ে উন্মাদের মতো দখল আর সন্ত্রাস বিস্তারে সক্রিয়, তখন বিপ্লবী রূপান্তরকামী আন্দোলনকে অতি অবশ্যই আরও বিস্তৃত হতে হবে।

যে ভারতে শতকরা ৪০ ভাগেরও বেশি মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করছে সেই একই ভারত সামরিক দিক থেকে বিশ্বের চতুর্থ স্থানের অধিকারী। অবর্ণনীয় অবস্থার মধ্যে যে পাকিস্তানের জনগণ বসবাস করছে, সে পাকিস্তান পৃথিবীর ষষ্ঠ বৃহত্তম সেনাবাহিনীর দেশ। আফগানিস্তান ক্ষতবিক্ষত, মায়ানমার সামরিক জান্তার ভারে নিস্পিষ্ট। এ অঞ্চলে অতি বিকশিত বেসামরিক-সামরিক আমলাতন্ত্র যার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তার উপর দাঁড়িয়ে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থা পরিকল্পনা আঁটছে। এ কাজ করতে গিয়ে বিদ্যমান শাসক শ্রেণীর মধ্যেই তারা মিত্র খুঁজে পাচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে এবং কর্তৃত্বে বিস্তৃত হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ায় দখল ও আধিপত্যের নকশা। সবদেশের জনগণের স্বার্থই তার পরিপন্থী। এসবের বিরুদ্ধে যোগাযোগ ও সমন্বিত আন্দোলন আমরা কতটা দক্ষতার সাথে, যোগ্যতার সাথে করতে পারি তার উপর বিপ্লবী রূপান্তরের সাফল্য নির্ভর করছে। মনে রাখা দরকার, প্রতিটি দেশের বিপ্লবী গণ আন্দোলন অপরাপর দেশের বিপ্লবী আন্দোলনকে সহায়তা করে, পরিপুষ্ট করে। ফারাক্কা, টিপাইমুখ বাঁধ, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, ভারতের উপর ভর করে নতুন আধিপত্য নকশা এগুলো শুধু যে বাংলাদেশের জন্য হুমকি তা নয়, ভারতসহ পুরো দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের জন্যও তা একইরকম হুমকি। এসব নিয়ে ভারতসহ বিভিন্ন দেশের জনগণের সাথে আমরা এমন কোন কার্যকর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারিনি যা দিয়ে পুরো দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের মধ্যে শাসক শ্রেণীর স্বার্থের বিপরীতে একটি শক্তিশালী সংহতি গড়ে তোলা যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে এই কাজ এই অঞ্চলের সকল গণতান্ত্রিক ব্যক্তি ও সংগঠনেরই অন্যতম দায়িত্ব।

আলাউদ্দিন আহমেদ স্মরণসভায় প্রদত্ত বক্তৃতা। ১২ মার্চ, ২০০৯।

অনুলিখনঃ মেহেদী হাসান।

বাংলাদেশে ভারত

বাংলাদেশের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ গতিমুখ ঠিকভাবে বুঝতে গেলে ভারতের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক গতিধারার অনুসন্ধান জরুরী। সাধারণভাবে বলা যায়, ভারতের অর্থনীতি ও রাজনীতির গতিশীলতা বাংলাদেশের গতিমুখ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, ভবিষ্যতে আরও করবার সম্ভাবনা। এটা বাংলাদেশের শাসক শ্রেণীর কোন সরকার ক্ষমতায় আছে কিংবা নেই তা দিয়ে নির্ধারিত হয় না। বর্তমানে আমরা যে বৈশ্বিক ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে বসবাস করছি আর যেধরনের ক্ষমতা কাঠামো দেশে বিদ্যমান আছে তার মিথষ্ক্রিয়াই এসব কিছু নির্ধারণ করছে। আমাদের অভিজ্ঞতা বলছে, সরকার নির্বিশেষে এই প্রক্রিয়ার বাহক।

আমরা সবাই জানি, বাংলাদেশ প্রায় ঘেরাও হয়ে আছে ভারত দিয়ে, ভেতরেও নানাভাবে ভারত উপস্থিত। বাংলাদেশের তিন দিকের মধ্যে মায়ানমারের সামান্য কিছু অংশ বাদ দিলে, বাকী অংশের পুরোটাই ভারত। আরেক দিকে আছে বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশের সাথে ভারতের যে সীমানা, সেই সীমানার বড় অংশ জুড়ে অনেক টাকা খরচ করে ভারত কাঁটাতারের বেড়া দিচ্ছে, দিয়েছে অনেকখানি। কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যেই আমাদের বসবাস। দক্ষিণে আছে বঙ্গোপসাগর। বঙ্গোপসাগরও কতোটা আমাদের হাতে থাকবে তা এখন অনিশ্চিত। সে হিসেবে আমাদের ভবিষ্যৎ দশা কী দাঁড়াবে সেই একটি বড় প্রশ্ন নিয়েই এই আলোচনা।

গত সেপ্টেম্বরে মনমোহন সিং যখন বাংলাদেশে 'বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ়' করতে এসেছিলেন তখন আমাদের একটি প্রশ্ন ছিল যে, কাঁটাতারের মধ্যে আটকে থেকে আমরা কী করে বন্ধুত্বের হাত বাড়াবো? সকল দেশের সকল মানুষের সাথেই আমাদের বন্ধুত্ব দরকার। কিন্তু একজন যদি কাঁটাতারের ভেতরে থাকে এবং আরেকজন যদি কাঁটাতারের বাইরে থাকে তাহলে যে কাঁটাতার দিচ্ছে তার সাথে যে কাঁটাতারের মধ্যে আটক তার বন্ধুত্বের আলিঙ্গন কিংবা করমর্দন কীভাবে সম্ভব? আমরা কাঁটাতারের ভেতরে থেকে কী করে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে হাসিমুখে স্বাগত জানাতে পারি? বাধ্যবাধকতা আর বন্ধুত্ব তো এক কথা নয়। হাসিমুখে, স্বত:স্ফূর্তভাবে তাকে যদি স্বাগত জানাতে চাই তাহলে তো কাঁটাতারের বেড়াই আমাদের অগ্রসর হতে দেবে না, হাসিমুখে হাত বাড়াতে দেবে না!

যাইহোক, বাংলাদেশে ভারত বিষয় আলোচনার শুরুতে ভারত রাষ্ট্র সম্পর্কে আমাদের বিশেস্নষণ পরিষ্কার করা দরকার। যে প্রশ্নগুলোর মীমাংসা করা দরকার তা হলোঃ ভারত কে এবং কী? বহু শ্রেণী, বহুজাতি, বহুজাতপাত, বহু অঞ্চল নিয়ে যে ভারত তাতো সমরূপ কিছু নয়। সকলে তো ভারত রাষ্ট্র নয়। তাছাড়া ভারতের বর্তমান পর্যায়ে এসে দাঁড়ানোর প্রক্রিয়াগুলো কী কী? কী ধরণের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ভারতের বর্তমান অবস্থান তৈরি হয়েছে? এই বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে পর্যালোচনা করা দরকার।

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারত আমাদেরই দেশ ছিল। সেইসময়ে দেশভাগের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ, বর্তমান ভারত, পাকিস্তান এই পুরো অঞ্চলটা ছিল একই দেশ। মোঘল আমলে, তার বহু আগে সম্রাট অশোকের সময় কিংবা কোন কোন খণ্ডিত সময়ের কথা বাদ দিলে এই বিশাল অঞ্চল বিভিন্ন রাজ্যের রূপে ছিল। মোঘল সাম্রাজ্যের সময় সবচাইতে বেশী সময় ধরে এবং ধারাবাহিকতার সঙ্গে এই পুরো ভারত একটি কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে ছিল। তার ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে আমরা পাই বৃটিশ শাসন। বৃটিশ শাসনের মধ্যেই পুঁজিবাদী যে বিশ্বব্যবস্থা – এবং আধুনিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো – তার মধ্যে ভারতের একটি পরিচয় নির্দিষ্ট হয়।

মোঘল আমলের দীর্ঘ শাসনামলে বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে সম্পর্ক, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি ছিল। পরবর্তীকালে বৃটিশ আমলে ইউরোপীয় রাষ্ট্রীয় ধাঁচের যে কাঠামো সে কাঠামো অনুযায়ী আইন-কানুন প্রণীত হয়, প্রশাসনিক বিন্যাস গড়ে উঠে। এক সময় ভারতের রাজধানী এই বাংলাতেই ছিল, কলকাতায়। এই কলকাতা এখন ভারতের অংশ। একসময় অখন্ড বাংলার কেন্দ্র ছিল কলকাতা, সেটাই ছিল ভারতের রাজধানী। আবার মোঘল শাসন থেকে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যে যাওয়ার প্রক্রিয়ার সূচনাও হয় এই বাংলা দিয়েই।

১৭৫৭ সালে যে নাটক মঞ্চস্থ হয়–যুদ্ধের নাটক–যেখানে সিরাজ-উদ-দৌলা, লর্ড ক্লাইভ, কাশিমবাজার কুঠি ইত্যাদির ইতিহাস সম্পর্কিত যে ঘটনাগুলো ঘটে সেটি তাৎপর্যপূর্ণ। সিরাজের বাহিনীতে ৫৫ হাজারেরও বেশী সৈনিক ছিল আর লর্ড ক্লাইভের বাহিনীতে ছিল ৩ হাজারের কিছু বেশী। কিন্তু লড়াইএর সময় সিরাজের বাহিনীর ৫০ হাজারেরও বেশী সৈনিক সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়ভাবে দাঁড়ানো ছিল। তারা কোন লড়াই করেনি। আর লর্ড ক্লাইভের বাহিনী পুরোটাই লড়াই করেছে। সেই লড়াইয়ের পরেও তারা যখন সম্পূর্ণ পরাজিত হতে যাচ্ছিল সে সময় মীরজাফরদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে যুদ্ধের দৃশ্যপট নতুনভাবে নির্মিত হয়। ক্লাইভের বাহিনী জয়ী হয়। বৃটিশরা পরবর্তীতে এই অঞ্চলের দখলকার্য সম্পন্ন করে। দখলকার্য শুরু হয় ১৭৫৭ সালে এই বাংলা দিয়েই। তারপর ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত তাদের সম্পূর্ণ দখলপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সময় লেগেছে পুরো ১০০ বছর। এর আগ পর্যন্ত

বৃটিশরা পুরো ভারতকে তাদের শাসনাধীনে আনতে পারেনি। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ দমনের মধ্য দিয়ে সমস্ত ভারত বৃটিশের আনুষ্ঠানিক উপনিবেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। আবার বৃটিশবিরোধী যে লড়াই তার সূত্রপাতও এই বাংলা থেকেই। ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলন হয়, এখানে যার উল্লেখ বইপত্রের মধ্যে পাওয়া যায় 'সন্ত্রাসী আন্দোলন' হিসেবে। সশস্ত্র বৃটিশ বিরোধী সেই আন্দোলনের শুরুও বাংলা থেকেই। তার বীরত্বের অনেক গাঁথা আমাদের জানা আছে।

বৃটিশবিরোধী লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চল থেকে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে। কিন্তু যাওয়ার আগে তারা ভারতকে কেটে দু'ভাগ করে দিয়ে যায় স্বাধীনতার নামে। ১৯৪৭ সালে যেভাবে দেশ ভাগ হয়, যেভাবে বিভিন্ন অঞ্চল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতবিক্ষত হয, যেভাবে অসংখ্য মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়, তাতে অনেকের মনে এই প্রশ্নটিই আসে যে, এই স্বাধীনতার জন্যই কি আমরা লড়াই করলাম? অসংখ্য মানুষ এর দ্বারা দুর্ভোগের মধ্যে পড়েন। ভারত এবং পাকিস্তানের দেশ বিভাগের কারণে অসংখ্য মানুষের নিজ বাসভূমি ছেড়ে অপর স্থানে গমন এবং এর ফলে যে যন্ত্রণা-রক্তক্ষরণ প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে তাদের যেতে হয়, নির্মম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় তাতে সে সময় এই প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, স্বাধীনতার মানে কী? স্বাধীনতা মানে কি যন্ত্রণা বৃদ্ধি করা? স্বাধীনতা মানে কি প্রিয় বাসভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হওয়া? বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের ফলাফল মানে কি আপনজন হারানোর যন্ত্রণাকে দীর্ঘস্থায়ী করা? এ ধরণের প্রশ্ন ছিল বহু মানুষের মধ্যে।

১৯৪৭-এর যে দেশভাগ, আগে পরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তার রেশ এখন পর্যন্ত আমরা বয়ে বেড়াচ্ছি। এক একটা যুদ্ধ যখন হয় কিংবা এক একটা নির্যাতন যখন হয়, সে নির্যাতনের ঘটনা কিন্তু নতুন নির্যাতনের ক্ষেত্র তৈরী করে। এক একটা সহিংসতা নতুন নতুন সহিংসতার ভূমি তৈরী করে। যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলো হয়েছে তার প্রতিক্রিয়া থেকে গেছে আজীবন, যে ছিল সে সময়ে ছোট্ট একজন শিশু–তার জীবনের মধ্যেও তার প্রভাব থাকে। তার বর্ণনার মধ্য দিয়ে সে অভিজ্ঞতা তার পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত গেছে। এই প্রতিক্রিয়া কতদূর পর্যন্ত যাবে তা নির্ভর করে ঐ সমাজ যে কারণে এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় মানুষ সে পূবর্তন প্রক্রিয়ার ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসার মতো রাজনীতির বিকাশ ঘটাতে পারলো কি না। আর তা যদি না পারে তাহলে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম এই ঘৃণা-বিদ্বেষ এবং সব ধরনের মানসিক অস্থিরতা কিংবা অসুস্থতা সব বহন করতে থাকবে। এই ভূখণ্ডে সে রাজনীতির বিকাশ না হওয়ার কারণে ১৯৪৭-এর দেশভাগের যন্ত্রণা এবং অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতা এখন পর্যন্ত অব্যাহত আছে। বাংলাদেশে ভারতের অবস্থান অনুধাবনের ক্ষেত্রে দেশভাগের যে প্রভাব প্রজন্ম পরম্পরায় বিদ্যমান

অর্থনীতি-রাজনীতি-সামাজিক ইত্যাদির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সে বিষয়টা আমাদের খেয়াল রাখা দরকার।

ভারতের কয়েক হাজার বছরের বিশাল সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে। সেই সভ্যতা সৃষ্টির ইতিহাস, শিল্প-সাহিত্য নির্মাণ, অর্থনৈতিক বিকাশ যা হয়েছে তা মূলতঃ সে সময়ের অভিন্ন মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই তৈরী হয়েছে। অপরদিকে মানুষের উপর মানুষের নিপীড়ন কিংবা সাম্রাজ্যবাদী শোষণ এবং এর বিরুদ্ধে যে লড়াই তাও ছিল এখানকার জনমানুষের – সম্মিলিতভাবেই। দেশভাগের পূর্ব পর্যন্ত শোষণ-বঞ্চনা-নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ইতিহাস তাই অখণ্ড ভারতের জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রক্রিয়ার ফল। আমরা তারও ধারাবাহিকতা বহন করি।

অনেক ব্যক্তি আছেন যারা আমাদের কাছে চিরস্মরণীয়, ভৌগোলিক দিক থেকে তারা বর্তমান ভারতের অধিবাসী। এই ভারতের মধ্যেই তাদের প্রধান কর্মকাণ্ড ছিল। আমরা রোকেয়া'র কথা জানি। রোকেয়া'র বিশাল কাজ প্রধানতঃ ছিল ভারতের বাংলার মধ্যে। কিন্তু তার সৃষ্টি-তার সৃজনশীলতা আমরা আজো বহন করে চলছি। তেমনি রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গও আনা যায়। রবীন্দ্রনাথকে তো আমরা ভারতীয় বিবেচনা করি না। তিনি আমাদেরও। নজরুলও তাই। অধিবাসী হিসেবে ভারতীয় হলেও আমরা তো নজরুলকে আমাদের মনে করি। এরকম অনেক কিছু যা '৪৭ পূর্ব সময়ের – তার ধারাবাহিকতা আমরা বহন করে চলছি।

ধর্মীয় পরিচয় ও সাম্প্রদায়িকতা

বাংলাদেশ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠের দেশ। এদেশে মুসলমানদের আগমন শুরু হয় প্রায় এক হাজার বছর আগে। সে আগমন প্রভাব বিস্তার করেছিল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। অখণ্ড বঙ্গে যার বৃহৎ অংশ এখন বাংলাদেশ – এই অঞ্চলে তার প্রভাব ছিল অনেক বেশী। অনেক সুফী সাধক এসেছেন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এই অঞ্চলে। রাজ্যশাসনেও মুসলিমদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্-এর শাসনামলের কথা আমরা স্মরণ করতে পারি। তাঁর শাসনামলের অনেক সাফল্যের কথা আমরা জানি। যদিও তার ক্ষমতা দখল কিংবা ক্ষমতা ধরে রাখার যে প্রক্রিয়া অন্যান্য রাজা-বাদশাহদের ক্ষমতা দখলের যে প্রক্রিয়া তার থেকে ভিন্ন কিছু ছিল না। ক্ষমতা দখলের এই প্রক্রিয়ায় বহু হাজার লক্ষ মানুষ মারা গেছেন। কিন্তু তার মধ্যে হুসেন শাহ্র শাসনামলকে গৌরাবোজ্জ্বল হিসেবে চিহ্নিত করার কারণ হলো, তাঁর শাসনামলে এক ধরনের সামাজিক স্থিতিশীলতা ছিল। বেশ কিছু কাজ তিনি করেছিলেন সে সময়। ভারতের বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড জায়গায় মুসলমান যারা ছিল তাদের সম্পর্কে এই অঞ্চলের বসবাসকারী অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে বিশেষত যারা সমাজে ক্ষমতাবান তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া কী ছিল? প্রাথমিক

প্রতিক্রিয়া ছিল এই ধরণের যে, তারা বহিরাগত। কেউ দখল করতে এসেছেন অস্ত্র নিয়ে। যেমনঃ ইখতিয়ারউদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী । আবার কেউ এসেছেন ধর্ম প্রচারের জন্য, সুফী সাধক। কিন্তু এরা সবাই তো বাইরে থেকেই এসেছিলেন। আবার এই অঞ্চলের নিপীড়িত নিম্নবর্ণের মানুষ বা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা বড় ভরসার জায়গা হিসেবে তাঁদের বিবেচনা করেছিলেন।

একটি বড় জনগোষ্ঠী বিশেষত ভারতের ক্ষমতাবান ব্রাক্ষ্মণ শাসককুলের মধ্যে 'জাতীয়তাবাদী' কিংবা 'দেশপ্রেম' এর যে চিত্র দাঁড়ায় তা মূলত: এই বহিরাগতদের বিরুদ্ধে অবস্থান কেন্দ্র করেই। পরবর্তীতে ভারতে সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক কিংবা ধর্মীয় ক্ষেত্রে দু'টো ধারা তৈরী হয়। একটি ধারায় হিন্দু, মুসলমানসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ঐক্য, অসাম্প্রদায়িক বন্ধন তৈরী এবং শক্তিশালী হয়। অপরদিকে, তৈরি হয় ধর্মীয় দেষ-বিদ্বেষ অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক ধারা। সাম্প্রদায়িক এই বীজ গভীর থেকে উৎপাটিত না হওয়ার কারণে, তার সামাজিক অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্তিশালীভাবে থেকে যাবার কারণে, কোন কোন অঞ্চলে কোন না কোন সূত্র ধরে এই ধর্মীয় বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্নভাবে। এখনও তার প্রকাশ নানাভাবে প্রত্যক্ষ করছি আমরা।

কদিন আগেই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের একজন শিক্ষক যার জন্ম দিল্লীর কোন এক জায়গায়, – দিল্লীর কোন একটি পত্রিকায় লিখেছেন যে, যাদের পূর্বপ্রজন্ম এই অঞ্চলের মানুষ ছিল না তাদের আসলে ভারত ত্যাগ করা উচিৎ। অর্থাৎ মুসলমানদের এই অঞ্চল থেকে বের করে দেওয়া উচিৎ। ভারতে, যুক্তরাষ্ট্রে এই কথার প্রতিক্রিয়া হয়েছে। হার্ভার্ডে অন্যান্য যারা ভারতীয় ছিলেন তারা এ নিয়ে প্রতিবাদ করেছেন। মুসলমান-হিন্দু জনগোষ্ঠী সম্মিলিতভাবেই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। এসব প্রতিবাদের কারণে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে ছাঁটাই করতে বাধ্য হয়েছে। এই শিক্ষক আবার তার বিরুদ্ধে আপিল করেছেন।

যাই হোক, মূল কথা হলো, হিন্দু-মুসলমান সব জনগোষ্ঠীর মধ্যেই এই ধরনের ব্যক্তিরা আছেন যারা ভেতরে নানাকারণে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ লালন করেন। কিন্তু এই শিক্ষকের মতো উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে এই মাত্রায় সেই সাম্প্রদায়িকবোধ কাজ করছে যে, অন্য অনেকের মতো ব্যক্তিগত-পারিবারিক পর্যায়ে তার এই বোধ সীমাবদ্ধ রাখতে পারেননি। জনসমক্ষে লিখিত আকারে তিনি তা.প্রকাশ করেছেন। কতটা ঘৃণা কিংবা বিদ্বেষ কিংবা হিংসা একজন ব্যক্তির মধ্যে কাজ করলে তিনি এ ধরণের হিংস্র হয়ে উঠতে পারেন তা এটা খেয়াল করলেই বোঝা যায়। মোদ্দা কথা, এই মাত্রার একজন ব্যক্তির মধ্যে সাম্প্রদায়িক এই বোধ এতো উচ্চ মাত্রায় থাকার অর্থ হলো, সমাজের বিভিন্ন অংশে এই বোধ এখনো জারী আছে। এই প্রভাব আছে বলেই গুজরাটের নরেন্দ্রনাথ মোদীর মতো অসংখ্য মোদী

তৈরী হয়, গুজরাটের ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তৈরীর নেপথ্যে যাদের প্রবল ভূমিকা আছে। বলাই বাহুল্য, এই প্রবণতা হঠাৎ করে তৈরী হয়নি। দীর্ঘ ধারাবাহিক একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বর্তমান এই অবস্থা তৈরী হয়েছে। এর ঐতিহাসিক সামাজিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট আছে।

গুজরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা সকলেরই নিশ্চয়ই মনে আছে। এই ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্যে দিয়ে ভারত নিজেকে উন্মোচিত করেছিল। স্পষ্ট হয়েছিল যে, ভারত রাষ্ট্র 'ধর্মনিরপেক্ষ' -এটা একটা মিথ। ভারতের সমাজ রাজনীতির মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ভয়াবহ মাত্রাতেই আছে। তবে এটাই ভারতের একমাত্র পরিচয় নয়। এর পাল্টা দিকটিও ভারতে শক্তিশালী। সেজন্য এসবের বিরুদ্ধে ভারতে অসাম্প্রদায়িক শক্তির ব্যাপক প্রতিবাদ-প্রতিরোধও আমরা দেখি। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, দাঙ্গার বিষয় যতটা ফলাও করে মিডিয়ায় আসে, বিভিন্ন রাজ্যে কিংবা অঞ্চলে তার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ হয়, সে সব খবরের সিকিভাগও মিডিয়ায় আসেনা। বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা। ভারতের অসংখ্য মানুষ বিভিন্ন গোষ্ঠী সেসময় গুজরাটের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন, সমাবেশসহ নানা কর্মসূচি নিয়েছেন দাঙ্গার বিরুদ্ধে। সে দেশের, এদেশের বেশিরভাগ গণমাধ্যম সেসবের কোন গুরুত্ব দেয়নি।

গণমাধ্যম কোনটাকে খবর মনে করে আর কোনটাকে খবর মনে করে না, তা নির্ভর করে তাদের নীতি-স্বার্থ-উদ্দেশ্য কিংবা এজেন্ডার সাথে সেসব খবর যায় কি যায় না তার উপর। যেমন বাংলাদেশে জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে যখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ব্যাপক গণআন্দোলন হয় তখন ভারত ও পশ্চিমা গণমাধ্যম প্রায় নিরব থেকেছে। অধিকাংশ পত্র-পত্রিকায় টিভিতে সেই আন্দোলনের কোন খবর হয় স্থান পায়নি নতুবা ছিল খুবই গুরুত্বহীন। কিন্তু অযোধ্যায় যখন হিন্দু ধর্মবাদী গোষ্ঠী বাবরী মসজিদ ভাঙ্গে, বাংলাদেশে মুসলিম ধর্মবাদী গোষ্ঠীগুলো বিশেষ করে জামায়াতের মতো দলগুলো যখন সে ঘটনাকে পুঁজি করে এখানে দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা চালায়, বিবিসিসহ গণমাধ্যমগুলো সেই ঘটনাকে ব্যাপক গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করে।

বাংলাদেশের মিডিয়াতে বলিউডের তারকাদের ব্যক্তিগত খবর যত গুরুত্ব পায়, সেখানে লক্ষ কৃষকের আত্মহত্যা বা বন পাহাড়ে শহরে প্রান্তরে সশস্ত্র প্রতিরোধ তার একাংশ গুরুত্বও পায় না। ভারতের পত্রিকাগুলোতে বাংলাদেশের যেসব খবর সাধারণত প্রকাশিত হয় সেসব খবর পড়ে যে কারো মনে হতে পারে যে, বাংলাদেশের একমাত্র সমস্যা হলো ইসলামপন্থী মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলোর 'জঙ্গী তৎপরতা'। এগুলোকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানোই পশ্চিমা ও ভারতের মূলধারার গণমাধ্যমের প্রধান প্রবণতা। তাদের এই ভূমিকা দিয়েই নির্মিত হয় ভারতের বিভিন্ন

শ্রেণী পেশার মানুষের বাংলাদেশ সম্পর্কে ভাবনা ও চেতনা। বাংলাদেশের অবস্থা সম্পর্কে যে খন্ডিত, অস্বচ্ছ এবং নেতিবাচক ধারণা ভারতের মানুষের মধ্যে বিদ্যমান সেটি যে কেউ তাদের প্রশ্নের ধরন খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন।

এটি সত্যিই খুব অবাক করার মতো ঘটনা যে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ভারতের শিক্ষিত এমনকি বুঝদার অনেক মানুষও এইদেশ ও তার মানুষ সম্পর্কে কীভাবে এতো, খন্ডিত ও নেতিবাচক ধারণা পোষণ করতে পারেন? বাংলাদেশ সম্পর্কে এতো অজানা-অজ্ঞতা কিংবা প্রায় 'না জানা' থাকতে পারে! এখানে সমাজ রাজনীতি মানুষের বহুমাত্রিক ঘটনা আছে; সাধারণ মানুষের বিভিন্ন ইস্যুতে লড়াই আছে; সম্পদের মালিকানা, কর্তৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ নিয়ে গণআন্দোলন আছে; রাষ্ট্রীয় এবং সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সংগ্রাম চলছে; জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক অর্জন আছে, সম্ভাবনাও দাঁড়াচ্ছে। মিডিয়ার কারণেই এই সত্যটিও আড়াল হয়ে যায় যে, ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে যে অসন্তোষ এবং বিক্ষোভ দেখা যায় তার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে, এগুলো নিছক 'ইসলামপন্থীদের ভারত বিদ্বেষের' ব্যাপার নয়। প্রতিবেশি রাষ্ট্র এবং তার মানুষদের সম্পর্কে ভারতের মানুষের 'না জানা' কিংবা অজ্ঞতা তৈরীর ক্ষেত্রে প্রধানত দায়ী তাই তাদের গণমাধ্যম, যার পেছনে আছে সুনির্দিষ্ট রাজনীতি।

সর্বোচ্চসংখ্যক গরীব মানুষের দেশ শীর্ষ অস্ত্র আমদানিকারক

যাইহোক, বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে এখন যে ৪টি দেশকে বলা হচ্ছে 'emerging super power' তার মধ্যে ভারত একটি। গত দেড় দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তার নানা মাত্রার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতনের ধ্বনি আমরা শুনতে পাচ্ছি, অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া রাজনৈতিকভাবে সংকটগ্রস্ত। অর্থনৈতিক ধ্বস কমার পরিবর্তে সংকট ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থা থাকা সত্বেও এই রাষ্ট্রটির সামরিক শক্তি বিশাল, যার বলে সারা বিশ্বে এখনও তার সন্ত্রাস, দখল, ভয়-ভীতি, হুমকি-ধমক চলছে। বিশ্বজুড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান তৎপরতাই হচ্ছে -যুদ্ধ, দখল ইত্যাদির মাধ্যমে তার ক্ষয় হতে থাকা ক্ষমতা রক্ষা করা এবং তার বিস্তৃতি ঘটানো।

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক এই মন্দাবস্থায়ও যে চারটি দেশের উপর সারা বিশ্বের নজর এবং যাদের শক্তি-ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে তার মধ্যে প্রথম হলো চীন। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ এখন চীন, খুব দ্রুতই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তাদের। এই দেশটির কাছে যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ সবচাইতে বেশী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৪ ট্রিলিয়ন ডলার ঋণ রয়েছে চীনের কাছে যা ভারতের প্রায় ৩ বছরের জাতীয় আয়ের সমান। চীনের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

এই নির্ভরশীলতার কারণে চীনকে সরাসরি চটানোর ক্ষেত্রেও তাদের যথেষ্ট সতর্ক দেখা যায়। মাঝে মধ্যে যে টানাপোড়েন বাহ্যিকভাবে দেখা যায় সেটাও খুব বেশীদূর পর্যন্ত যেতে পারে না।

দ্বিতীয় বিকাশমান শক্তি হিসেবে ভারতের নাম উল্লেখ করা হয়। তারপরে রয়েছে ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারতের নাম আরও বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয় এ কারণে যে, জনসংখ্যার দিক দিয়ে ভারত হলো দ্বিতীয় বৃহত্তম। জিডিপি দিয়ে পরিমাপ করলে যদিও সবকিছু অনুধাবন করা যায় না, তবুও অর্থনীতি পরিমাপের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত এই পদ্ধতিটিই সবচাইতে বেশি ব্যবহৃত। সে হিসেবে ভারতের অর্থনীতি বিশ্বের অর্থনীতির মধ্যে নবম বৃহত্তম স্থানের অধিকারী। আর সামরিক বাহিনীর দিক থেকে ভারতের অবস্থান হলো তৃতীয়! গত পাঁচ বছরে ভারত অস্ত্র আমদানীর দিক থেকে পৃথিবীর শীর্ষে অবস্থান করেছে। গত বছরে এক্ষেত্রে তার বাজেট বেড়েছে শতকরা ১১ ভাগ।

অর্থনীতির দিক থেকে অনেক পেছনে অবস্থান করলেও সামরিক বাহিনীর দিক থেকে যে রাষ্ট্রটি ভারতের একটু পরেই অবস্থান করছে তার নাম পাকিস্তান। পাকিস্ত ান সেনাবাহিনী বিশ্বের মধ্যে ষষ্ঠতম স্থান অধিকার করে আছে! পাকিস্তান এতোদিন যার পকেটের মধ্যে অবস্থান করেছে, জন্মের পর থেকেই যাকে নানাবিধ 'সেবা' প্রদান করে এসেছে, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই এখন পাকিস্তানে একের পর এক বোমা বর্ষণ করছে। সার্ভিস দেওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান এখন সন্ত্রাসী মার্কিন রাষ্ট্রের বোমার আঘাতে ছিন্নভিন্ন। ভারত এবং পাকিস্তান এই দুই দেশই বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে সামরিক খাতে, তাদের দেশের মানুষের যতই সংকটাপন্ন অবস্থা থাকুক না কেন। কেন? পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করার জন্য অথবা পরস্পর পরস্পরের আনুমানিক আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য!

বৃটিশ ভারত ভাগের সময় তিনটি অঞ্চল সরাসরি বিভক্ত হয়। এক, বাংলা; দুই, পাঞ্জাব; তিন, কাশ্মীর। যে অঞ্চলটিকে ঘিরে উত্তেজনা যুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায়, এবং সার্বক্ষণিক যুদ্ধাবস্থা এখনও চলছে তার নাম কাশ্মীর। কাশ্মীর নিয়ে গোলযোগ যদি অব্যাহত না থাকতো তাহলে ভারত এবং পাকিস্তানের চেহারা অনেক উজ্জল থাকতো। কিন্তু তাতে সামরিক বাহিনীকে কেন্দ্র করে যে কায়েমী স্বার্থবাদীরা আছে তাদের রমরমা অবস্থা থাকতো না। এই দুই দেশের সামরিকীকরণের মধ্য দিয়ে যারা লাভবান হচ্ছে, তাদের জন্য কাশ্মীরের এই গোলযোগ অব্যাহত থাকা খুবই আনন্দদায়ক। তারা এটিকে টিকিয়ে রাখতে পারছে। যার ফলে, পৃথিবীর সবচাইতে বেশী গরীব মানুষ বাস করে যে অঞ্চলে, সেখানে রাষ্ট্রশক্তি অর্থাৎ ভারত পাকিস্তান প্রতিযোগিতা করে বিশ্বের অস্ত্রবাজার চাঙ্গা রাখে।

পাকিস্তান তার বাজেটের সিংহভাগ ব্যয় করে অস্ত্র আমদানীর পেছনে। শিক্ষা, চিকিৎসা, কাজের বিপর্যস্ত অবস্থা থাকলেও বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় সামরিক খাতে। আর এর কারণে স্ফীত হয় সামরিক বাহিনী সম্পর্কিত নানাগোষ্ঠী। ফলে এখন পাকিস্তানের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক যে কোন ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর ভূমিকাই নির্ধারক। সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্ব থেকে পাকিস্তান বের হতে পারছে না, অদূর ভবিষ্যতে কোন সম্ভাবনা নেই। সামরিক প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে আবার মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার বসবাস দীর্ঘদিন। এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানে তালেবান, আল কায়েদা ইত্যাদি নানা গোষ্ঠীকে তৈরী করেছে, ইন্ধন দিয়েছে, লালন করেছে। আবার এই পাকিস্তান আর্মিকে ব্যবহার করেই যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে পূর্ণ দখল কায়েম করেছে। এবং সর্বশেষ তারা এখন পাকিস্তানকেই ছিন্নভিন্ন করছে।

অঞ্চলের নতুন বিন্যাস

কেন পাকিস্তানের এই পরিণতি এবং কেন ভারতের শাসকগোষ্ঠী সুপারপাওয়ার হবার স্বপ্ন দেখতে পারছে তারও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে। বিশেষভাবে খেয়াল করার বিষয় হলো, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের যাত্রা শুরু হবার পর প্রথম থেকেই এই রাষ্ট্রটি ছিল খুব তরল এবং অস্থিতিশীল। গভর্ণর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এক বছরের মাথায় মৃত্যুবরণ করলেন। একজন ঐতিহাসিক লিখেছিলেন যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর জিন্নাহ'র যে অসুস্থতা ধরা পড়ে, সেটি যদি ১৯৪৭ সালের ভাগাভাগির আগে প্রচারিত হতো, তাহলে ইতিহাস হয়তো অন্যরকম হতে পারতো। তাঁর সম্ভবতঃ ফুসফুসে ক্যান্সার হয়েছিল। ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তিনি মারা যান। এরপর থেকে আর কখনই পাকিস্তান স্থিতিশীল হতে পারেনি।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র বিষয়টি সংক্ষেপে একটু বলা প্রয়োজন। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং যে দর্শনের ভিত্তিতে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল তার পেছনে অনেক কারণ আছে। তবে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরে তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন আকাঙ্খা প্রকাশ করে। পাকিস্তান হবার কথা শুধুই মুসলমানদের রাষ্ট্র, ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী প্রজাতন্ত্র। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রথম সুযোগেই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বললেন, 'আমরা কেউ আর এখন মুসলমান কিংবা হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ কিংবা খৃষ্টান নই। ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মচর্চার কথা বলছি না, রাষ্ট্র পরিচালনার দিক থেকে বলছি, আমরা এখন আর কেউ আলাদা কোন ধর্মাবলম্বী নই। আমরা সবাই পাকিস্তানি। আমরা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই'।

পাকিস্তান যে দ্বন্দ্বের ফলাফল, যে আকাঙ্ক্ষা থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম, যেধরনের শ্রেণীশক্তি তার নেতৃত্বে জড়ো হয়েছিল, তাতে প্রতিষ্ঠার পর জিন্নাহর এই

বক্তব্য বা চিন্তা মেনে নেওয়ার মতো কোন ব্যক্তি তাঁর চারপাশে ছিল না। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুর পর থেকে পাকিস্তান আর কোন স্থিতিশীল রাজনৈতিক নেতৃত্ব তৈরি করতে পারেনি। পূর্ব বাংলায় ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের মধ্য দিয়ে মুসলিম লীগকে উচ্ছেদ করলেও তা টিকতে পারেনি। অস্থিতিশীলতা বাড়তেই তাকে, এক পর্যায়ে ১৯৫৮ সালে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে। সেই বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেই এই বাংলাদেশের জন্ম। সেই বাহিনী এখনও পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করছে।

১৯৫৮ সালের আইয়ুব খানের সামরিক শাসন দিয়ে পাকিস্তানের নতুন যাত্রা শুরু। আঞ্চলিক বৈষম্যসহ নানা জটিলতা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ধামাচাপা দিয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্থিতিশীল এবং সুষ্ঠু কোন নীতি করা সম্ভব ছিল না। এটা সম্ভব ছিল না আরও এই কারণে যে, পাকিস্তান প্রথম থেকেই অনির্দিষ্ট গন্তব্য নিয়ে চলছিল। অর্থনৈতিক এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য তারা যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রুপের উপরই সবকিছু ছেড়ে দিয়েছে। হার্ভার্ড এ্যাডভাইজরি গ্রুপ পাকিস্তানের উন্নয়ন নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এজেন্ডা অনুযায়ী এই অঞ্চলে তাদের আধিপত্য নিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পনা করেছে, জাল বিছিয়েছে। 'সিয়াটো' 'সেন্টো' নামের সামরিক চুক্তির পর পাকিস্তান, শাহানশাহ-এর ইরান, তুরস্ককে দিয়ে এই অঞ্চলে 'আরডিসি' নামে মার্কিন উপগ্রহ একটি জোট তৈরি করা হয়েছে।

অন্যদিকে ভারতের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক তখন ভালো ছিলনা। বরং তাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হল সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে। ভারতের জওহরলাল নেহেরু, যিনি ভারত আন্দোলনের সাথে ছিলেন, কংগ্রেসের নেতা, জনগণের আস্থাভাজন এবং জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন ক্ষমতায় ছিলেন নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে। রাজনৈতিকভাবে উদার গণতন্ত্রী নেহরু যেভাবে উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গী দাঁড় করালেন তাকে সমাজতন্ত্র নামে এক ধরনের রাষ্ট্রায়ত্ত খাতকেন্দ্রিক পুঁজিবাদ বলা যায়। সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যের বাইরে এক ধরনের আধুনিক শিল্প সমাজের বিকাশই ছিল নেহরু সরকারের লক্ষ্য। ভারতের শিল্পভিত্তি নির্মাণে সেজন্য তাঁরা পরিকল্পিত অর্থনীতির পথ ধরেছিলেন। মার্কিন প্রভাব থেকে দূরত্ব বজায় রাখার কারণে 'জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন' তৈরীর পেছনে জওহরলাল নেহেরুর পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা রাখা সম্ভব ছিল।

১৯৫০ সাল থেকে ভারতে পরিকল্পনা কমিশনের সাহায্যে যে পরিকল্পিত অর্থনীতির কাঠামো দাঁড় করানো হয়, তার বিশেষ ঝোঁক ছিল, ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান তৈরী করা, মৌলিক শিল্প-কারখানা যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। যে কোন দেশে শিল্প বিকাশের জন্য মূল জায়গা হচ্ছে, ভারী শিল্প তৈরী করা। ভারী শিল্প যদি কোন দেশের অর্থনীতিতে গড়ে উঠতে না পারে তাহলে সে দেশ তার মেরুদন্ডের উপর

দাঁড়াতে পারে না। সেক্ষেত্রে ভারত প্রথমেই – রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর – ভারী এবং মৌলিক শিল্প বিকাশের দিকে নজর দিয়েছিল। এবং তা করেছে রাষ্ট্রীয়ভাবে, রাষ্ট্রীয় খাতে। রাষ্ট্রীয়ভাবে অবকাঠামো উন্নয়ন করা, ভারী শিল্প বিকশিত করা এবং ভারী শিল্প বিকাশের পাশাপাশি কৃষির (সেচ ও অন্যান্য ক্ষেত্রের উদ্যোগ) বিকাশের নানারকম উদ্যোগ গ্রহণ করা ছিল ভারতের অর্থনৈতিক কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। ভারতীয় বৃহৎ ব্যবসায়িক গোষ্ঠী হিসেবে যাদের নাম শোনা যায়, যেমনঃ টাটা, বিড়লা প্রমুখ, তাদের বিকাশও চলছিল পাশাপাশি। ৫০, ৬০ দশকের পর থেকে এদের যে বিকাশ দেখা যায় তাও সম্ভব হয় রাষ্ট্রীয় পরিকল্পিত অর্থনীতির সহযোগী হিসেবেই।

ভারতের এই পরিকল্পিত অর্থনীতি বিকাশের পেছনে প্রধান আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠপোষক ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। সে সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রচারিত একটি তত্ত্ব বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করে। সেটি পরিচিত ছিল 'অধনবাদী বিকাশ তত্ত্ব' নামে। এর সারকথা হলো, তৃতীয় বিশ্বের কোন কোন দেশে যে সমস্ত জনপ্রিয় নেতা আছেন এবং যারা 'সাম্রাজ্যবাদবিরোধী' মানে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য বিরোধী, তাদের নেতৃত্বে বিপ্লবী রা ঐক্যবদ্ধ হলে পুঁজিবাদকে পাশ কাটিয়ে শিল্প অর্থনীতির বিকাশ ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সুতরাং, যে দেশেই বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী না হয়েও 'সাম্রাজ্যবাদবিরোধী' কোন জনপ্রিয় নেতার উপস্থিতি দেখা যায়, তার সাথেই সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি সম্পর্ক স্থাপন করে এবং রাষ্ট্রীয় খাতের মাধ্যমে এক ধরনের উন্নয়নে পৃষ্ঠপোষকতা দান করে, শিল্পভিত্তি নির্মাণে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে। অবশ্য এই তত্ত্ব অনুসরণ করতে গিয়ে বিভিন্ন দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের স্বাধীন বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সে বিষয়ে আলোচনা অন্যত্র করেছি।

৮০'র দশক পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের শিল্প বিকাশের যে ধারা গড়ে ওঠে সেখানে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে দেশের ভেতরে দেশি পণ্যের বিশাল ভোক্তা সমাজ গড়ে উঠে। আমদানি নিয়ন্ত্রিত রেখে ভারতে প্রস্তুত শিল্পপণ্যকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হয়। যেমনঃ ভারতে কয়েকদশক কোন বিদেশী কোম্পানির গাড়ি ছিল না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে ভাড়ায় চলা ট্যাক্সি পর্যন্ত সর্বত্র এ্যাম্বাসেডর গাড়ী চলতে দেখা যেত। এরকম আরও অনেক পণ্যের ক্ষেত্রেও দেখা যায়।

যদিও বৃটিশ আমলে শুরু হয় রেলওয়ে, ভারত সরকারের অধীনে তার বিকাশ ঘটেছে, বিস্তার ঘটেছে উল্লেখযোগ্য হারে। ভারতের রাষ্ট্রীয় সংস্থা বিশেষ করে তেল, গ্যাস, কয়লা, টেলিকমিউনিকেশন ইত্যাদি খাতে জাতীয় মালিকানা ও সক্ষমতার বিকাশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শক্তিশালী ভিত্তি তৈরী হয় টেলিকমিউনিকেশন, অবকাঠামো, জ্বালানী ইত্যাদি খাতে। বর্তমান ভারতের তুলনামূলক শক্ত শিল্পভিত্তির

পেছনে কয়েকদশকের পরিকল্পিত উন্নয়ন মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন তার নিজের আন্তর্জাতিক অবস্থানের কারণে বহুদেশে, মার্কিন বলয়ের বাইরে এসে নিজস্ব উন্নয়নধারা তৈরিতে, সহযোগিতা করে। সবগুলো খুব দৃষ্টিগ্রাহ্য ফল না দিলেও ভারতে সোভিয়েত প্রভাব ও পৃষ্ঠপোষকতা ফলপ্রসূ হয়েছে।

৬০, ৭০, ৮০-র দশকে ভারত কয়েকটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। একটি যুদ্ধ হয় চীনের সাথে, ১৯৬২ সালে। সে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে চীনের সাথে ভারতের বৈরীতা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, চীনের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূরত্ব কমে। পরবর্তীকালে চীনের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের সংঘাত যখন তৈরী হয় তখন চীনের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য আরো জোরালো হয়। চীনের সাথে সেসময় পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠতাও বৃদ্ধি পায়। ক্রমে একদিকে চীন-পাকিস্তান-যুক্তরাষ্ট্র, অন্যদিকে ভারত-সোভিয়েত ইউনিয়ন এ ধরণের একটি মেরুকরণ বা অক্ষ সৃষ্টি হয়। সেসময় চীনাপন্থীদের একটি শ্লোগান ছিল এরকম, "রুশ ভারতের দালালেরা, হুশিয়ার সাবধান"। এখনও কারও কারও মুখে এ ধরণের শ্লোগান শুনতে পাওয়া যায়। তাদের হয়তো খেয়াল নেই কিংবা ধারণাও নেই যে, সেই পূর্বের ভারতও নেই এবং রাশিয়াও সে আগের অবস্থানে নেই। রাশিয়া বর্তমানে পুঁজিবাদী বিশ্বের অংশ, তবে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কে ইদানিং অবনতি দেখা যাচ্ছে। ভারত এখন মার্কিন রাষ্ট্রের খুব কাছের মিত্র, এই অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্র।

চিকিৎসা

যাইহোক, ভারতে তৎকালীন উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও নানা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে ব্যাপক আকারে। আন্তর্জাতিক মানের বেশ কিছু বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে সময়ই। যার ফলাফল এখন পাচ্ছে ভারত। চিকিৎসা, শিক্ষাক্ষেত্রে ভারত বাংলাদেশের তুলনায় কতটা অগ্রগামী সেটি টের পাওয়া যায় যখন দেখা যায় এদেশের মানুষ উন্নত কিংবা নির্ভরযোগ্য চিকিৎসাসেবা নিতে ভারতে যান কিংবা পড়াশুনা করাতে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের ভারত পাঠান। বাংলাদেশ '৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত যে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল সেই পাকিস্তানে এবং গত ৪০ বছরে বাংলাদেশ এই ধারায় উন্নয়ন গ্রহন করেনি। কিন্তু ভারত এই যাত্রা শুরু করেছিল তার জন্মের পরপরই। যার ফলে, দেখা যায়, পাকিস্তান কিংবা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্রের কর্ণধার-এর যদি অসুখ হয় তাহলে তারা চিকিৎসার জন্য ছোটেন অন্য দেশে। রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, রাজনৈতিক নেতাদের অসুস্থতার কারণে অন্য দেশে চিকিৎসা সেবা নিতে যাওয়ার মতো লজ্জার বিষয় আর কী হতে পারে? অথচ আমাদের দেশের নেতা-নেত্রীরা লজ্জা বা সংকোচ তো দূরের কথা, খুবই

আনন্দ নিয়ে অন্যান্য দেশে ছোটেন চিকিৎসা করাতে! বিদেশ ছোটেন রাষ্ট্রীয় অর্থে, প্রয়োজনে কিংবা অপ্রয়োজনে।

অন্যদিকে ভারত এতটুকু পরিস্থিতি অন্তত: তৈরী করতে পেরেছে যে, সে রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী যদি অসুস্থ হন তাহলে তিনি সে দেশে তাঁর চিকিৎসা করাতে পারেন। গত কিছুদিন আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর হার্টের রোগের কারণে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল – সে দেশেরই হাসপাতাল। তার ফলে অর্থ, সময় এবং সম্মান এই তিনটি জিনিসই তাদের বেঁচে গেল।

কিন্তু বাংলাদেশের বিষয়টি উল্টো, কি চিকিৎসা, কি লেখাপড়া, প্রয়োজন হলেই সামর্থ্যবানদের ছুটতে হয় ভারত, আরও অর্থক্ষমতা থাকলে আরও দূরের দেশে। কারণ এইদেশে রাষ্ট্রীয় খাতে চিকিৎসা কোন শক্ত ভিত্তি পায়নি, বেসরকারি চিকিৎসা ব্যযবহুল ও প্রায়ই অনির্ভরযোগ্য। কঠিন রোগ ধরা পড়লে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় এ দেশের মানুষ যখন ভারতে যায় তখন সে দেশের হাসপাতালগুলো পেয়ে বসে, অতিরিক্ত চাহিদা থাকার কারণে, গলাকাটার অবস্থা সুযোগমতো অনেক জায়গাতেই তৈরি হয়। এজন্য কলকাতা কিংবা বাংলাদেশের সীমানার আশেপাশে যে সমস্ত অঞ্চলের হাসপাতাল রয়েছে, বাংলাদেশের মানুষ গেলে সে জায়গার মানুষজন তা খুব ভালো চোখে দেখেন না। কারণ, এদেশের মানুষ যখন চিকিৎসা নিতে সে দেশে ভীড় জমান তখন সেখানকার প্রাইভেট হাসপাতালগুলো চিকিৎসা ফি বাড়িয়ে দেয়। দাম বৃদ্ধির এই চাপ যে একা কেবল এদেশের মানুষ বহন করেন তা নয় । কেননা, হাসপাতালগুলো যখন ফি বৃদ্ধি করে তখন কেবলমাত্র বাংলাদেশের মানুষজনের জন্যই বৃদ্ধি করে না, বৃদ্ধি করে তার নিজের দেশের মানুষের জন্যও। হাসপাতালগুলোতে বাংলাদেশের মানুষের চিকিৎসা চাহিদা থাকার কারণে তারা নিজেদের দেশের মানুষকেও তোয়াক্কা করে না।

একদিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের প্রতি নির্ভরশীলতা আবার অন্যদিকে ভারতের বিভিন্ন অন্যায়ের সমালোচনা তাই সে দেশের লোকজনদের ব্যঙ্গ করবারও সুযোগ দেয়। যার ফলে, বাংলাদেশে কেউ যখন ভারতের আধিপত্য নিয়ে সমালোচনা করে তখন ভারতের কোন নাগরিকের মুখে যদি এ ধরনের কথা শোনা যায়, 'চিকিৎসা কিংবা লেখাপড়া করার জন্য যখন এদেশেই দৌড় দিয়ে আসতে হয় তাহলে এতো কথা কিসের!' এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এই ধরনের অপমানজনক পরিস্থিতি তৈরীর দায় বাংলাদেশে যারা বিভিন্ন সময়ে সরকারে ছিলেন, নীতি নির্ধারণে ছিলেন, সেই নেতা-নেত্রী সকলের।

কেন বাংলাদেশ সুবিধাজনক গন্তব্য?

বাংলাদেশে আমদানি করা কম্পিউটার এসেছে ভারতের আগে। রঙিন টেলিভিশন, দামী গাড়িও আমদানি হয়ে ভারতের তুলনায় আগে পূর্ব পাকিস্তানে

(বাংলাদেশে) এসেছে। ভারতের আগে বাংলাদেশে এসব দেখে এই দেশে অনেকে উৎফুল্ল হয়েছেন, গর্ব করেছেন। ভুল গৌরব! এসব পণ্য এ দেশে এসেছে, উৎপাদিত হয়নি; সেজন্য এই প্রাপ্তি বা জৌলুসের সাথে এদেশের শিল্পায়ন, শিক্ষা বা প্রযুক্তিগত ভিত্তির বিকাশের সংযোগ তৈরি হয়নি। কিন্তু এসব জিনিসপত্র যখন ভারতে পাওয়া গেছে তখন সেগুলো এসেছে তাদের নিজেদের শিল্প শিক্ষা ও প্রযুক্তি ভিত্তির বিকাশের মধ্য দিয়ে। তার ফলে তা শুধু এই পণ্যগুলোর প্রাপ্তি নিশ্চিত করেনি, প্রতিষ্ঠান ও দক্ষ জনশক্তি তৈরি করেছে, জাতীয় সক্ষমতা বাড়িয়েছে। চোখের সামনেই সর্বশেষ উদাহরণ ভারতের তথ্য প্রযুক্তির উল্লম্ফন। তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখযোগ্য জায়গায় গেছে। ভারত এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম আউটসোর্সিং সেন্টার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই ভারতের অবস্থান। ভারতে এখন তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান তৈরী হয়েছে যারা, সারা বিশ্বের কম্পিউটার সেক্টরের সহজ, জটিল অনেক ধরনের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম। বাংলাদেশের আইটি সেক্টরে আউটসোর্সিং থেকে শুরু করে যেসব কাজকর্ম দৃশ্যমান তার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ভারতের সাব কন্ট্রাক্টর হিসেবে করা হচ্ছে। ভারত কাজ নেয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে, আর বাংলাদেশ নেয় ভারত থেকে।

১৯৯০ সাল থেকে ভারতের অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ঐবছরই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ভারতের দিক-দিশাও পরিবর্তিত হয়। ততদিনে টাটা, গোয়েঙ্কা, বিড়লা, মিত্তাল, রিলায়েন্স গ্রুপ ইত্যাদি বড় বড় পুঁজির প্রতিষ্ঠান তৈরী হয়েছে ভারতে। এসব বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের বিকাশে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের ভূমিকা এবং সরকারের সংরক্ষণমূলক নীতি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ছিল। এই বৃহৎ ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর তাদের তরফ থেকেও ভারত সরকারের উপর অভ্যন্তরীণ চাপ ছিল অর্থনীতিকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত করবার। তাদের দাবি ছিল রাষ্ট্রের ভূমিকা কমাতে হবে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বেসরকারী হাতে ছেড়ে দিতে হবে, ব্যক্তি মালিকানায় দিতে হবে, বিশ্ব অর্থনীতির সাথে যোগাযোগ বাড়াতে হবে।

১৯৯১ থেকে এইমুখি পরিবর্তনগুলো শুরু হয়। সেসময় এই পরিবর্তন বা অর্থনৈতিক সংস্কারের যিনি নেতা ছিলেন তার নাম হলো মনমোহন সিং, বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী, সেসময় ভারতের অর্থমন্ত্রীর পদে বহাল ছিলেন। অর্থমন্ত্রী হিসেবে তিনি এ কাজের নেতৃত্ব দেন 'more liberalization, more privatization' শ্লোগানে। ফলস্বরূপ, ভারতের অনেক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ভাগীদার হয়ে যায় বড় বড় ব্যবসায়ী গ্রুপগুলো। কিন্তু মূল বিষয়টি হলো এই যে, এতো বেসরকারীকরণ, বিরাষ্ট্রীয়করণ, বাণিজ্যে উদারনীতি গ্রহণ করার পরও বাংলাদেশের চাইতে সংস্কারের গতি ছিল কম, নিয়ন্ত্রিত। ৮০-র দশকের পর থেকে বাংলাদেশে যেভাবে বিচার বিশ্লেষণ

ছাড়াই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যক্তি মালিকদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে তার তুলনা কমই পাওয়া যাবে। ভারত সে তুলনায় অনেক পিছিয়ে। আমদানী উদারীকরণের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ তুলনামূলকভাবে এগিয়ে আছে। বাংলাদেশের অধিক আমদানিমুখিতার অন্যতম সুফলভোগী ভারত।

প্রাইভেটাইজেশনের ক্ষেত্রে ভারতের চাইতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গতি তাই অনেক ক্ষিপ্র। তার ফলে পাবলিক সেক্টরের বা সর্বজনের প্রতিষ্ঠানকে কোন ধরনের পর্যালোচনা ছাড়া নামমাত্র মূল্যে বেসরকারী খাতে ছেড়ে দিতে দেখা যায়। অন্যদিকে, বেসরকারীকরণ করার পরও যা কিছু এখন ভারত রাষ্ট্রের হাতে আছে সেসব জাতীয় প্রতিষ্ঠান অনেক বেশী শক্তিশালী, শিল্পায়নের সহযোগী। তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী সক্ষম। কারণ, নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক বেশী দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার পরিচয় দেয়। ঐতিহাসিক কারণে কাজের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাদের এই দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা তৈরী হয়েছে।

বাংলাদেশে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া আছে কয়েকটি জায়গায়। বিশেষ করে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বা সরকারের বিভিন্ন নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালনকারীদের স্থান সংসদ বা মন্ত্রণালয় নয়, এগুলো হল বিশ্বব্যাংকের অফিস, এডিবি অফিস; আর আইএমএফ-এর অফিস তো বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যেই। এছাড়া আছে কয়েকটি কনসালটেন্সি ফার্ম। কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে শুরু করে যেসব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে বাংলাদেশে, সেসব প্রতিষ্ঠানে বিশ্বব্যাংক-এডিবি'র কনসালট্যান্টদের প্রভাব বিস্তারকারী ভূমিকা কোন গোপন ব্যাপার নয়। এই কনসালট্যান্টরাই বাংলাদেশের অর্থনীতির গতি প্রক্রিয়া কিংবা জনগণের ভাগ্য নির্ধারণে ছক তৈরি করে। এ ধরনের 'ভাগ্যবিধাতা' প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে এবং সরকারের বৈশিষ্ট্যের কারণে যখন কোন প্রতিষ্ঠান বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেওয়া হয় তখন তা নিয়ে সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে কোনপ্রকার পর্যালোচনা হয় না, হয়নি।

কোন খাতকে বেসরকারী হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে কিংবা কতটুকু অংশ বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হবে কিংবা কোন খাতটি রাষ্ট্রের হাতে রাখা জরুরী, জাতীয় সক্ষমতা বিকাশের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে এসব বিষয় আলোচনা-পর্যালোচনা ছাড়াই বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক পুঁজির কনসালটেন্টদের সিদ্ধান্তকেই শিরোধার্য করা হয়েছে এযাবতকাল। পলিসি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ধরন তাই 'মেনে নেওয়া'র মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। এই 'মেনে নেওয়া'র পেছনে দেশি দখলদার ও কমিশনভোগীদের স্বার্থবিবেচনা প্রধান চালিকা শক্তি। সরকার বদল হয়েছে একের পর এক, কিন্তু নীতিগত ব্যাপারে একই ধারাবাহিকতা অনুসরণ করা হয়েছে।

জোসেফ স্টিগলিজ এর ভাষায়, 'তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে প্রাইভেটাইজেশন হলো আসলে ব্রাইবারাইজেশন', লুণ্ঠন ও ঘুষ বিতরণের একটি পদ্ধতি। লাভবান ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রধান যোগ্যতা হলো, সরকারী দলের সাথে তার বা তাদের যোগাযোগ। বিদেশী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হল বিশ্বব্যাংক বা পুঁজির কেন্দ্র ক্ষমতার সাথে তার সম্পর্ক কতটা ঘনিষ্ঠ, তাদের তালিকাভুক্ত কিনা সেটা। রেলওয়ে কিংবা আদমজী জুট মিল কিংবা বাওয়ানী জুট মিলের যেহেতু পর্যাপ্ত জমি আছে, যা ছিল মূলতঃ জাতীয় প্রতিষ্ঠান, সেগুলোর লাভ-ক্ষতির বিচার বিশ্লেষণ ছাড়াই ব্যক্তিখাতে দিয়ে দেওয়া হয় এসব কারণেই। যার ফলে দেখা যায়, আদমজী জুট মিলের মতো এশিয়ার বৃহত্তম পাট শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়। অনেকক্ষেত্রে কারখানার জমি প্লট করে বিক্রি, হাউজিং প্রকল্প। দেশে শক্তিশালী শিল্প ভিত্তি গড়ে তোলার বদলে পৃষ্ঠপোষকতা পায় দোকানদারী অর্থনীতি। মিলের বদলে মল।

বাংলাদেশে পাটশিল্প যখন বিশ্বব্যাংক সরকারের যৌথ আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হল তখন ভারতে পাটশিল্প পেল বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা। বাংলাদেশে একদিকে ধ্বংস করা হয় বৃহৎ পাট শিল্প, অন্যদিকে বৃহৎ শপিং মল গড়ে তোলার জন্য নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হয়। এযাবতকাল যতগুলো রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানাকে ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সেগুলো অধিকাংশই হয় বন্ধ কিংবা রুগ্ন কিংবা প্রায় বন্ধ করে দেওয়ার মতো অবস্থা তৈরী হয়েছে। লবিস্ট হিসেবে যে যত সক্রিয় সে অনুযায়ী প্রাইভেটাইজড হয়েছে। খেসারত দিতে হয়েছে দেশের সমস্ত মানুষকে। দেশের অর্থনীতি পথ খুঁজে পায়নি। লাভবান হয়েছে দেশী-বিদেশী কতিপয় লুণ্ঠনকারী ব্যবসায়িক গোষ্ঠী।

১৯৯১ এর পর থেকে ভারতেও অনেক বেসরকারীকরণ হয়েছে। এর সুফল ভোগ করেছে এবং লাভবান হয়েছে বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। কিন্তু তারপরেও তাদের এই যাত্রা ছিল পরিকল্পিত ও নানা বিবেচনা নির্ভর। তার ফলে, 'নবরত্ন' নাম দিয়ে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান তারা রাষ্ট্রের হাতে এখনও খুবই গুরুত্ব সহকারে রেখেছে। জ্বালানী, বিদ্যুৎ, রেলওয়ের মতো এগারটি ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে যত্ন সহকারে রাষ্ট্রীয়ভাবে রক্ষা করার কারণে সামগ্রিক অর্থনীতি নৈরাজ্য ও কিছু গোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারিতার শিকার হতে পারেনি, টেকসই উৎপাদনশীল শক্ত ভিত্তি রক্ষা করা গেছে। শিক্ষা গবেষণা এখনও তুলনায় অনেক অগ্রাধিকার পাচ্ছে। বাংলাদেশ ও ভারতের উন্নয়নের এই ভিন্নতাই বাংলাদেশকে ভারতের বৃহৎ পুঁজির চারণক্ষেত্র হিসেবে পরিণত হবার রাস্তা তৈরি করেছে।

ভারতেও প্রাইভেটাইজেশনের ফলে লাভবান হয় বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলোই, পুঁজির সংবর্ধন গতি বৃদ্ধি পায়। আগে থেকে শক্ত ভিত্তি থাকায় তা ঘটে খুব দ্রুত।

২০১০ সালে ভারতে প্রকাশিত মিডিয়ার বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়, সে দেশে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী সংখ্যক বিলিয়নিয়ারের বসবাস, আগে সবচেয়ে বেশী ছিল জাপানে। যে দেশটিতে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক দরিদ্র জনগণ বসবাস করেন সে দেশেই আবার সবচেয়ে বেশী ধনীর আবাসস্থল!

পুঁজির ধর্ম হলো, পুঁজি যত বড় আকার ধারণ করবে তার ক্ষুধা তত বৃদ্ধি পাবে। যত বেশী ঘণীভবন তত বেশী তার বিস্তৃত হওয়ার চাহিদা জন্ম নেয়। পুঁজির ধর্মকে অস্বাভাবিক মোটা একজন মানুষের সাথে তুলনা করা যায়। অতিরিক্ত খাওয়ার কারণে একজন অতিরিক্ত মোটা কিংবা স্থূলকায় হন এবং অসুস্থ হন। আবার মোটা হওয়ার কারণে তার ক্ষুধা বেশী, খাওয়ার চাহিদা বেশী। খাওয়ার কারণে অসুস্থ হলেও টিকে থাকার জন্যই অন্যদিকে আরও বেশী পরিমাণ খাওয়ার চাহিদা তৈরি হয়। পুঁজির বিষয়টিও তাই। পুঁজি নানা ধরনের সঙ্কটের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও তার ক্ষুধার কমতি নেই। পুঁজি যত বড় হয় তত তার আরও বিনিয়োগক্ষেত্র দরকার, আরও অঞ্চল দরকার, আরও বাজার দরকার। পুঁজির সম্প্রসারণ ঘটে মূলত: তার জৈবিক এই বৈশিষ্ট্যের কারণে। সম্প্রসারণ এবং ঘণীভবন পুঁজির অন্ত র্গত বৈশিষ্ট্য। ভারতে বৃহৎ পুঁজিপতি ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর হাতে যে বিপুল পরিমাণ পুঁজির পুঞ্জিভবন হয়েছে তার সম্প্রসারণ তাহলে হতে চাইবে, কীভাবে ঘটবে? নিজ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে সে পুঁজি অন্য দেশে কিংবা অন্য অঞ্চলে ছড়িয়ে যেতে কিংবা থাবা বিস্তার করতে উদ্যত হবে। পাশে যদি এমন একটি দেশ থাকে যার শাসক শ্রেণী অধীনস্ত থাকতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করেন, যেখানে নিজের মেরুদন্ড তৈরির কোন উদ্যোগ নেই, তাহলে সেটাই হবে সবচাইতে সুবিধাজনক গন্তব্য।

একযাত্রায় দুই ফল কেন?

বিশ্বব্যাংক এবং এডিবি'র সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি গোষ্ঠী কিংবা বৃহৎ করপোরেটগোষ্ঠীর লোকজন প্রায়ই বলে থাকেন যে, ১৯৯১ পরবর্তী সময়ে ভারত যে নিউলিবারেল নামে পরিচিত বাজারমুখি নয়া সংরক্ষণবাদী সংস্কার কার্যক্রম শুরু করে তার ফলেই ভারত বর্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, তার প্রবৃদ্ধি বেড়েছে, ভিত্তি মজবুত হয়েছে, উদীয়মান বিশ্বশক্তি হিসেবে দাঁড়ানোর অবস্থা তৈরি হয়েছে। এধরনের সূত্রায়ন ভ্রান্ত এবং মতাদর্শিক অন্ধত্বে আক্রান্ত। তথ্য যাই থাকুক এরা সবসময়ই গায়ের জোরে বলতে চায় যে, বাজারমুখি সংস্কারই উন্নয়নের একমাত্র পথ। যদি একথাই সত্য হতো তাহলে অন্যান্য যে সমস্ত দেশে এ ধরনের সংস্কার হয়েছে তাদের ভিত্তি মজবুত হলো না কেন? কেন ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার বহু দেশ এই পথে গিয়ে ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে এবং পরে এই পথ পরিত্যাগ করে নিজেদের রক্ষা করেছে? আমদানি উন্মুক্তকরণ, বিদেশি বিনিয়োগে সুবিধাদান, ও সর্বজনের সম্পত্তির (public property) যথেচ্ছাচার ব্যক্তিমালিকানায়

স্থানান্তরে অনেকবেশি এগিয়ে বাংলাদেশ। ৮০-র দশক থেকে এবং তার পরবর্তী সময়ে এসব কাজে যে পরিমাণ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার ফলে এখানে তো ভারতের চাইতে বেশি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরী হবার কথা, তা হলো না কেন? কেউ কেউ চীনের কথাও বলে থাকেন যে, চীনের সংস্কারের ফলে তার প্রবৃদ্ধি অনেক বেশী। আসলেই কি তাই? চীন কিংবা ভারতের বর্তমান অবস্থায় পৌঁছানো কি তাদের এসব সংস্কারের ফল? ভারতে কেন এত জৌলুসের পরও ৬০ কোটি মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থান করছে? চীনের চিত্র আবার অনেক ভিন্ন। এসব পার্থক্যের কারণ কী?

পার্থক্য তৈরি হয় বাজারমুখি সংস্কার দিয়ে নয় বরং এর পূর্ববর্তী উন্নয়ন ভিত্তির মধ্যে। ভারতে ৫০ থেকে শুরু করে ৮০ দশক পর্যন্ত শিল্প, কৃষি, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে যে ভিত্তি নির্মাণ করা হয়েছিল সেটাই তার অর্থনৈতিক শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে। এবিষয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি। এই নিজস্ব ভিত্তি থাকায় পরবর্তী সময়ে বাজারমুখি সংস্কার ও অধিকতর উন্মুক্তকরণে নাজুক অবস্থায় পতিত হয়নি দেশ, বিপর্যস্ত হয়নি, বরং পুঁজির সম্প্রসারণে তা সুবিধাজনক হয়েছে। বাইরের পুঁজি অনুপ্রবেশ সেজন্য তার নিজস্ব শিল্পভিত্তি নষ্ট করেনি, তার জাতীয় সক্ষমতা নষ্ট করেনি, অর্থনীতির উপর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ খর্ব হয়নি। যেমন, সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ (FDI) ভারতে গত দুই দশকে অনেক বেড়েছে, বাংলাদেশেও গত দু'দশকে সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ বেড়েছে। বাংলাদেশে বিনিয়োগ হয়েছে, প্রধানত তেল-গ্যাস-বিদ্যুৎ ও মোবাইল খাতে। অন্যদিকে ভারতে হয়েছে বহু খাতে। সরাসরি বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ বৃদ্ধি যদিও দুইদেশেরই অভিজ্ঞতা, কিন্তু ধরনটি ভিন্ন বিশেষ করে পুঁজি বিনিয়োগের ধরন, ক্ষেত্র ও শর্তের বেলায়।

ভারতের জ্বালানী খাতের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে। রিলায়েন্স গ্রুপ, টাটা'র মতো ভারতীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে এই খাতে, তবে সিংহভাগ রাষ্ট্রের হাতে। বিদেশী কোম্পানি অফশোর দুএকটি জায়গায় রয়েছে। জ্বালানী খাতে যতটুকু বিদেশী বিনিয়োগ রয়েছে সেক্ষেত্রে খুব স্পষ্ট করেই শর্ত রয়েছে যে, কোনভাবেই এ সম্পদ রপ্তানী করা যাবে না। এছাড়া ভারতের পক্ষ থেকে আরও কঠিন শর্ত রয়েছে বিনিয়োগের বেলায়। বিদেশী বিনিয়োগ অবশ্যই ভারতের সাথে যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যমে হতে হবে, শেয়ারবাজারে নিবন্ধিত হতে হবে। এগুলো সম্ভব হয়েছে তার নিজস্ব শিল্প ভিত্তির উপর দাঁড়ানোর কারণে। অন্যদিকে বাংলাদেশে তাদের কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ করা হয়েছে, জ্বালানী খাতে তাদের কর্তৃত্বের কারণে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকট জটিল আকার নিয়েছে। প্রতিবছর অন্যান্য খাত থেকে অর্থ নিয়ে তাদের ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। তেল-গ্যাস-বিদ্যুৎ ও মোবাইল খাতে বিদেশি বিনিয়োগের কারণে পুঁজি পাচার ক্রমবর্ধমান। জাতীয় সক্ষমতা ও সম্ভাবনার ক্ষয় এসব বিনিয়োগের সরাসরি ফল।

যখনই বাংলাদেশে ভারতের নানা অপতৎপরতা বেড়ে যায় তখনই ভারতকে মোকাবিলা করতে গিয়ে 'ভারতের পণ্য বর্জন' এর কথাবার্তা শোনা যায়। কিন্তু ভারতের আধিপত্য মোকাবিলা করতে গিয়ে ভারতের পণ্য বর্জন করার আওয়াজ খুব কোন শক্তিশালী অস্ত্র হবার কোন সম্ভাবনা নাই। কারণ, বর্তমানে ভারত কিংবা কোন নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের পণ্য বলে কোন কিছুকে আলাদা করা কঠিন। আপাতদৃষ্টিকে কোন কোন পণ্যকে মনে হতে পারে যে, তা নির্দিষ্ট কোন দেশের পণ্য যেমন, সুইডেন কিংবা জার্মান কিংবা নরওয়ের কোন পণ্য; কিন্তু এসব পণ্যের অনেকগুলোর উৎস ঘাটলে দেখা যাবে নির্দিষ্ট সে পণ্যটি উৎপাদিত হচ্ছে ভারতে। ভারতে এখন অন্যান্য দেশের বহুজাতিক নানা কোম্পানির অনেক কারখানা তৈরী হয়েছে; গাড়ী, মোবাইল, সিম, টেলিফোন, টেলিভিশন, প্রসাধন সামগ্রী, যন্ত্র, ওষুধ ইত্যাদি নানা ধরনের পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে ভারতে। ভারতের বাজার ছাড়াও এগুলোর অন্যতম বাজার বাংলাদেশ।

উৎপাদনশীল তৎপরতা এবং বিদেশী বিনিয়োগের মধ্যে যোগসূত্র থাকার কারণে ভারতের ক্ষেত্রে এসব বিদেশি বিনিয়োগ সবক্ষেত্রে শিল্পবিনাশী হয়নি। আবার ট্রেড ইউনিয়নসহ ক্ষুদ্র উৎপাদকদের সংগঠিত প্রতিরোধও তুলনামূলকভাবে ভারতে বেশি শক্তিশালী। তারফলে সবসময়ই বিচার বিবেচনা ও পর্যালোচনার রাস্তা থাকে।

বহুজাতিক পুঁজির সাথে ভারতের পুঁজির একটা জৈব সংযুক্তি ঘটবার ফলে ভারতীয় বৃহৎ পুঁজিকে বহুজাতিক পুঁজির থেকে এখন আর আলাদা করা যাবে না। কোন কোন ক্ষেত্রে বিরোধ থাকলেও বহুজাতিকের স্বার্থ এবং ভারতের বৃহৎ পুঁজির স্বার্থ প্রধানত এক এবং অভিন্ন। ভারতের মুখোমুখি বাংলাদেশ তাই প্রকৃতপক্ষে বিশ্বপুঁজির মুখোমুখি। বহুজাতিক পুঁজির বাংলাদেশে বিনিয়োগও এখন অনেক ক্ষেত্রেই ভারতের সাথে সম্পর্কিত। ভারতীয় কোন না কোন গোষ্ঠী অনেক বিদেশি বিনিয়োগের সাথেই সম্পর্কিত। অনেক ক্ষেত্রে তারা অংশীদার, কোথাও কোথাও তারা সাবকন্ট্রাক্টর। ইউনোকাল বাংলাদেশ থেকে গ্যাস রপ্তানী করতে চেয়েছিল ভারতের ইউনোকাল-এর কাছে। কেন? সেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে। বহুজাতিক সংস্থাগুলো উৎপাদনের জন্য কারখানা তৈরী করছে ভারতে। আর বাজার অনুসন্ধান করছে ভারতসহ আশেপাশের দেশগুলোতে। বাংলাদেশ তার মধ্যে একটি। তাই বাংলাদেশ যত আমদানী উদারীকরণ করছে, বাণিজ্য উদারীকরণ নীতি গ্রহণ করছে, দেশকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে বহুজাতিক পুঁজির জন্য, তত তার থেকে লাভবান হচ্ছে ভারত।

বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে বৈধ বাণিজ্য অনুপাতই এখন প্রায় ১ঃ১০। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে ভারতে পণ্য রফতানি হয় ৫১ কোটি

মার্কিন ডলার। বিপরীতে ভারত বাংলাদেশে রফতানি করে প্রায় ৫০০ কোটি মার্কিন ডলার। এই চিত্রটি বৈধ বাণিজ্যের। আইনি কাঠামোর বাহিরে যে বাণিজ্য অর্থাৎ চোরাচালানী ধরলে এই পার্থক্য আরও বিশাল হবে। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মাধ্যমে কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি কিংবা দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র ইত্যাদি গ্রহণের মধ্য দিয়ে, গত দু'দশকে বাংলাদেশে যে আমদানী উদারীকরণ করা হয়েছে, শিল্পবিরোধী নীতিগ্রহণ করা হয়েছে কিংবা অবাধ বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রত্যক্ষ সুফলভোগী ভারত।

বাংলাদেশে ভারত থেকে কী কী পণ্য আসে? গরু থেকে শুরু করে মরিচ, পেঁয়াজ, রশুন, চিনি, সার, কীটনাশক, ফেনসিডিল, কাপড়, প্রসাধনী, সিডি, রং, ওষুধ সবকিছুই বাংলাদেশে আসে, বৈধ ও চোরাচালানী দুই পথেই। বাস, ট্রাক, গাড়ি, অটোরিকশা, টায়ার টিউব, যন্ত্রপাতি তো আছেই। বাংলাদেশ থেকে কী যায়? তেলসহ আমদানীকৃত অনেক পণ্যই চোরাচালানীর মাধ্যমে ভারতে যায়। ৮০-র দশকে ভারতে ইলেকট্রনিক পণ্য আমদানী নিষিদ্ধ ছিল। সে সময় বাংলাদেশ থেকে ক্যাসেট প্লেয়ার, রেডিও ইত্যাদি ধরনের অনেক পণ্য ভারতে চালান হতো। এখন এগুলো কম। চোরাই পথে আরও যায় ইট, তৈরি পোষাক, ওষুধ, সার, চাল। নারী ও শিশু পাচারও চোরাই বাণিজ্যের অন্যতম দিক।

ভারত যেহেতু আকারে বিশাল অর্থনীতির দেশ আর বাংলাদেশ যেহেতু তার তুলনায় ছোট অর্থনীতি, সুতরাং এই বাণিজ্য ব্যবধান থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল ভারতে বাংলাদেশের আরও রফতানি বৃদ্ধির সুযোগ আছে। বাংলাদেশ গার্মেন্টস, ব্যাটারী, ওষুধসহ নানা পণ্য আরও অনেক বেশি রফতানি করতে সক্ষম। কিন্তু পারছে না কেন? ভারতের সংরক্ষণবাদী নীতি ও পদক্ষেপের কারণে।

শুল্ক অশুল্ক প্রতিবন্ধকতা ও বিনিয়োগ

বর্তমানে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) যে বিধি রয়েছে সেখানে শুল্কের ব্যাপারে নির্দিষ্ট নীতিমালা আছে। শুল্ক এবং অশুল্ক বাধা দুটোই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ। শুল্ক বাধা হলো, কোন দেশ যদি অন্য কোন দেশের পণ্য আমদানিতে বাধা দিতে চায় তাহলে সেখানে বড় একটি দেয়াল তুলে দিতে পারে শুল্ক-এর হার উঁচু কিংবা অত্যধিক মাত্রায় বাড়িয়ে দিয়ে। যদি নির্দিষ্ট দেশ চায় সীমিত আকারে পণ্য আসুক তাহলে তার হার একটু কমিয়ে দিতে পারে। আর যদি সে চায় যে, শুল্ক হার রাখা হবে না তাহলে রফতানিকারক দেশ বিনা শুল্কে পণ্য রফতানি করতে পারে। আবার কোন কোন পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধ করে সম্পূর্ণ আটকে দিতে পারে। ডব্লিউটিও-এর মত হলো, পণ্যের অবাধ প্রবাহের জন্য এই শুল্ক বাধা কমাতে হবে।

যার ফলে, সারা পৃথিবীতে এই শুল্ক বাধা অনেক কমে গেছে। বাংলাদেশ, ভারতসহ বিভিন্ন রাষ্ট্র এই বিধি মোতাবেক চলছে।

কিন্তু পণ্য প্রবাহের ক্ষেত্রে শুল্ক বাধা (tariff barrier) কমে গেলেও অশুল্ক বাধা (non-tariff barrier) বলে যে অস্ত্র আছে তা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাষ্ট্র ব্যবহার করে। শুল্ক বাধা নামমাত্র হয়তো আছে কিংবা নেই কিন্তু এরকম ক্ষেত্রেও অশুল্ক বাধা অনেকভাবে দেওয়া হয়। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত এই চর্চাই ব্যাপকভাবে করছে। সীমান্ত দিয়ে বৈধভাবে প্রবেশের সময় আমলাতান্ত্রিক জটিলতার জালে আটকিয়ে রেখে হয়রানি কিংবা প্রবেশ করতে না দেওয়া হলো এক ধরনের অশুল্ক বাধা। গুণগত মান পরীক্ষার নামে দীর্ঘসূত্রিতা, যানবাহনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাও এরকম বাধা। ভারতের পক্ষ থেকে এই ধরনের বাধাগুলো দেওয়া হয় নানাভাবে। যার ফলে আনুষ্ঠানিক অনুমতি থাকলেও বাংলাদেশের পণ্য ভারতের বাজারে সহজে ঢুকতে পারে না, অনেকক্ষেত্রে মাসের পর মাস আটকে থাকার পর রফতানি বাতিল করতে হয়। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের ছোটবড় নানাচরিত্রের অশুল্ক বাধাই এখন ভারতে বাংলাদেশের পণ্যপ্রবাহ সম্প্রসারণে প্রধান প্রতিবন্ধক ।

সারা বিশ্ব থেকে ভারত যে পরিমাণ পণ্য আমদানী করে, বাংলাদেশ থেকে আমদানী করে তার শতকরা ১ ভাগেরও কম। তাই বাংলাদেশ থেকে রফতানি বৃদ্ধি ভারতের বাজারে তেমন কোন প্রভাব ফেলার কোন কারণ নেই। কিন্তু তারপরও ভারত এই পণ্য রফতানির পথে নানাপ্রকার শুল্ক-অশুল্ক বিধিনিষেধ তৈরী করে রাখে। বাংলাদেশ থেকে রফতানির বড় একটি ক্ষেত্র হলো তৈরি পোশাক। ভারতের বাজারের শতকরা মাত্র ৪ ভাগ তৈরি পোশাক বাংলাদেশ থেকে রফতানি হয়। যদি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ভারত সমস্ত ধরনের অশুল্ক বাধা দূর করে এবং ডব্লিউটিও-এর বিধি মোতাবেক আচরণ করে তাহলে এই খাতে বাংলাদেশ অনায়াসে দ্বিগুণ বা তিনগুণ রফতানি বৃদ্ধি করতে পারে। এতে ভারতের কোনপ্রকার অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, বরং ভারতের মানুষ কমদামে তৈরি পোশাক পেতে পারে। কিন্তু ভারতের প্রশাসন তাতে রাজি নয়। কিছুদিন আগে ভারতের পক্ষ থেকে বলা হলো যে, তারা কয়েকটি গার্মেন্টস পণ্য রফতানির ক্ষেত্রে শুল্ক বাধা তুলে নিয়েছে, কিন্তু কিছুদিন পরেই জানা গেল যে, অশুল্ক বাধা দেওয়ার কারণে বাংলাদেশ থেকে সেসব পণ্য ভারতে যেতে পারছে না। এটাই সাধারণ চিত্র।

ভারতের বৃহৎ পুঁজির কেন্দ্রীভবন এবং ঘণীভবনের প্রকাশ কী ধরনের হতে পারে? একটি হলো বাজার বিস্তার করা, সেটা খুব জোরদারভাবেই হচ্ছে। দ্বিতীয় হলো, বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, সেক্ষেত্রেও গোপন প্রকাশ্য নানা তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশে এখন অনেক খাতে ভারতের পুঁজি ক্রিয়াশীল। এখন পর্যন্ত সার্ভিস সেক্টর বা পরিষেবা খাতেই তার বৃহদাংশ, তবে ক্রমেই উৎপাদন খাতেও

তাদের আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। কোন কোন বিনিয়োগ তারা করছে বহুজাতিক পুঁজির সাথে যৌথভাবে, কোন কোন খাতে তারা সরাসরি বিনিয়োগ করছে। যেমন, টেলিকমিউনিকেশন খাতে ভারত বিনিয়োগ করেছে এয়ারটেল কোম্পানির মাধ্যমে। টাকার অঙ্কে কতটা বিনিয়োগ করেছে তা নিয়ে অবশ্য যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে। চিকিৎসা, শিক্ষা , বিনোদন, মিডিয়াতে তাদের নানারূপে বিনিয়োগ দেখা যাচ্ছে। স্বনামে বেনামে খুচরা বাণিজ্য থেকে শেয়ারবাজার পর্যন্ত তাদের তৎপরতা তৈরি হচ্ছে। বিনোদন, ফ্যাশন, অডিও-ভিডিও, বিজ্ঞাপন সংস্থা, চলচ্চিত্র ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভারতীয় পুঁজি ক্রমেই স্পষ্ট আকার নিচ্ছে। পরিচয় গোপন করে অনেক পেশায় কর্মসংস্থানও হতে দেখা যাচ্ছে।

এছাড়া অন্যান্য যেসব ক্ষেত্রে তারা বিনিয়োগ সম্প্রসারণ করছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গার্মেন্টস। এর খবর পত্র-পত্রিকায় খুব একটা আসেনি। যতটুকু খবর জানা যায় তাতে গত কিছুদিনে ভারতীয় বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশের ৫০টিরও বেশী গার্মেন্টস কারখানা কিনে নিয়েছে। এই বিনিয়োগকারীদের উল্লেখযোগ্য অংশ উত্তর আমেরিকায় প্রবাসী ভারতীয়। এছাড়া, প্রায় ১০০টিরও বেশী দর কষাকষির মধ্যে আছে বলে জানা যায়। বাংলাদেশের গার্মেন্টস শ্রমিকের মজুরী এবং ভারতের গার্মেন্টস শ্রমিকের মজুরীর অনুপাত হলো ১:৩। ভারতে যদি একজন গার্মেন্টস শ্রমিককে মজুরী দিতে হয় ৯ হাজার টাকা, সেক্ষেত্রে এখানে একই কাজের জন্য গার্মেন্টস শ্রমিককে দিতে হয় ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা। সেকারণে ভারতীয় মালিকদের জন্য বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাতে পুঁজি বিনিয়োগ খুবই লাভজনক। অন্য দেশীয় ছোট কিংবা মাঝারি পুঁজিকে হজম করে বা সঙ্গে নিয়ে বা পরাস্ত করে ভারতের বৃহৎ পুঁজি এখানে ঘাঁটি গাড়বে। সে প্রক্রিয়াই বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে।

ভারত যেভাবে গার্মেন্টস-এর ক্ষেত্রে অগ্রসর হচ্ছে তাতে ধারণা করা যায়, কিছুদিনের মধ্যে বাংলাদেশের গার্মেন্টসের উপর শুল্ক-অশুল্ক বাধাও কমে আসবে। কারণ ততদিনে ভারতের পুঁজি গার্মেন্টস খাতে বিনিয়োগ করে তার তৈরী পোশাক আবার ভারতের বাজারেই রফতানি করতে আগ্রহী হবে। এখানে গার্মেন্টস উৎপাদন করলে কম মজুরীর কারণে ভারতীয় বিনিয়োগকারীর জন্য লাভজনক হবে, আবার ভারতের বাজারে এই পণ্য রফতানি করাও তার জন্য বাড়তি সুবিধা দেবে। কিংবা অন্য কোন দেশেও তারা রফতানি করতে পারবে অধিক লাভজনকভাবে।

গার্মেন্টস এর পূর্বে পাট ছিল বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান শিল্পভিত্তি। সেটিকে খুব জেনেবুঝেই ধ্বংস করা হয়েছে। বৃহৎ পাট শিল্প ধ্বংস হবার পর খুব ছোট আকারে এখন পাটশিল্প টিকে আছে। বেসরকারি খাতে গড়ে উঠা কারখানাগুলো খুবই ক্ষুদ্রায়তন এবং অস্থায়ী নিয়োগ নির্ভর। আদমজী জুট মিল বন্ধ

করার পেছনে বিশ্বব্যাংক ও বিভিন্ন সরকার যৌথভাবে ভূমিকা পালন করেছে। এর পেছনে বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন এজেন্ডা ছিল। বাংলাদেশের বড় পাট শিল্প ধ্বংস করলেও ভারতের পাটশিল্প বিকাশে সমর্থন দিয়েছে বিশ্বব্যাংক, ভারতের সরকারও সেই শিল্প বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছে। বাংলাদেশের পাটশিল্প বিপর্যস্ত হলেও সাধারণভাবে পাটশিল্প পণ্যের চাহিদা ও সুযোগ ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। সেজন্য এটা খুবই সম্ভব যে, ভারতের বৃহৎ পুঁজি এখানেও জায়গা করে নেবে। আমরা হয়তো শীগগিরই দেখবো ভারতীয় শিল্পগোষ্ঠীর মালিকানায় এদেশে বড় পাট কারখানা গড়ে উঠছে।

বাংলাদেশের অন্য আর একটি বিপর্যয়ের জায়গা হলো স্টিল মিল। বাংলাদেশে স্টিল মিলের একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি হয়েছিল। চিটাগাং স্টিল মিল ছিল একটি বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান। যে কোন দেশে শিল্পায়নে স্টিলমিলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ২০০০ সালে সেটি বন্ধ হয়ে যায় সরকার-বিশ্বব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে। পরবর্তীতে ২০০৪ সালে টাটা এখানে স্টিল, বিদ্যুৎ, কয়লা এবং সার শিল্পে বিনিয়োগ করার প্রস্তাব দেয়। বড়পুকুরিয়াতে টাটা এশিয়া এনার্জির মতো উন্মুক্ত পদ্ধতিতে এবং সেই রয়ালটি (৬%), ও শতকরা ৮০ ভাগ রফতানির লক্ষ্য নিয়ে কয়লা উত্তোলন করতে চেয়েছিল। স্টিল, সার ও বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগের জন্য তারা ২০ বছরের জন্য ভর্তুকিকৃত দামে গ্যাসের যোগান দাবি করেছিল।

তেল গ্যাস চুক্তির কারণে বাংলাদেশ যখন বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানির কাছ থেকে গ্যাস কিনছিল প্রতি হাজার ঘনফুট গড়পড়তা ৩ ডলার করে, সেখানে টাটার প্রস্তাব অনুযায়ী তাদের দিতে হতো ১.৫ ডলার হারে। তাছাড়া দেশের চাহিদা যাই থাকুক না কেন, ২০ বছর ধরে তাদেরকে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহ করবার বাধ্যবাধকতাও ছিল তাদের বিনিয়োগ প্রস্তাবনার অন্যতম দিক। এটা বাস্তবায়িত হলে এখন গ্যাস সংকট আরও ভয়াবহ আকার নিতো। সেসময় ৪ দলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় ছিল এবং তাদের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল এই প্রকল্প অনুমোদন করায়। তৎকালীন জ্বালানী উপদেষ্টা টাটার এই প্রস্তাবনার পক্ষে সবচাইতে সোচ্চার ছিলেন। কীভাবে টাটার এই বিনিয়োগ বাংলাদেশের জন্য যথেষ্ট মাত্রায় লাভজনক এবং খুব দ্রম্নতই যে টাটার প্রস্তাব বাংলাদেশের মেনে নেওয়া উচিৎ এই মর্মে পত্র-পত্রিকায় এবং টেলিভিশনের টক-শো অনুষ্ঠানে তিনি জোর গলায় তাগিদ দিচ্ছিলেন। বিপরীতে জনগণের পক্ষ থেকে আমরা তখন টাটার প্রকল্প বাংলাদেশের জনগণ, শিল্প ও অর্থনীতির জন্য কীভাবে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে সে তথ্য-যুক্তি তুলে ধরেছিলাম। টাটার পক্ষে নানা ধরনের প্রচারণা সত্ত্বেও ২০০৪-৫ সালে টাটার এরকম বিপজ্জনক প্রকল্পের বিরুদ্ধে জনগণের দিক থেকে প্রতিরোধ তৈরি হয়েছিল। মিছিল, মিটিং, সভা, সমাবেশ এবং পাল্টা লেখালেখি করে পুরো বিষয়টা জনগণের

সামনে হাজির করার এক পর্যায়ে ব্যাপক জনমত গড়ে উঠলে টাটা এখান থেকে পিছু হটে।

তৎকালীন সময়ে টাটা বিদায় নিলেও বাংলাদেশের বৃহৎ স্টিল মিল প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ধরনের কারখানা গড়ে ওঠে। কিন্তু চিটাগাং স্টিল মিলের মতো বড় আর কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। হয়তো আবার টাটা কিংবা অন্য ভারতীয় বড় পুঁজির প্রস্তাব আসতে পারে। এখন যদি ভারতীয় কোন বৃহৎ পুঁজি এখানে এই খাতে জায়গা করে নেওয়ার কথা ভাবে তাহলে তাদের পূর্বে টাটার অভিজ্ঞতা স্মরণ করেই অগ্রসর হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। এছাড়া কৃষিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও একইভাবে ভারতীয় বড় পুঁজির বিনিয়োগের নানা সম্ভাবনা ক্রমেই বাড়ছে।

এসব বিষয়ে বাংলাদেশে ব্যবসায়ী শিল্পপতিদের সংগঠন এফবিসিসিআই, বিজিএমইএ কিংবা বিকেএমইএ জোরালোভাবে কখনোই তাদের অবস্থান জানায়নি। কখনো কখনো তাদের কিছু আপত্তি শোনা যায়, কিন্তু তাতে কোন জোর নেই। অন্যদিকে, বাংলাদেশের কোন কোন ব্যবসায়ী পূর্বে থেকেই হার স্বীকার করে জুনিয়র পার্টনার হিসেবে যৌথ বিনিয়োগে যাচ্ছে। একটি অংশ ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবেই সক্রিয়।

ভারত-মার্কিন জোট এবং মিথ

১৯৯৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভারতের একটি সামরিক সমঝোতা হয়। পরবর্তীতে তার ধারাবাহিকতায় ২০০৫ সালে এসে চূড়ান্ত চুক্তি হয়। তার পূর্বেই, ১৯৯৮ সালে কাছাকাছি সময়ে, ভারত এবং পাকিস্তান পরস্পরকে জানান দেওয়ার জন্য নিজ নিজ দেশে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুই দেশের উপরই অবরোধ জারি করে। প্রথম থেকেই বোঝা যাচ্ছিল এই অবরোধ দুই দেশের জন্যই কঠিনভাবে প্রযোজ্য হবে না, তা কয়েক বছরের মধ্যেই সত্য প্রমাণিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদীদের আরোপ করা সব অবরোধ প্রকৃত অর্থে অবরোধ নয়। কিছু অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী আক্রমণের চরিত্র গ্রহণ করে, আবার কিছু অবরোধ আরোপ করা হয় দরকষাকষির জন্য। ইরাক, ইরান, উত্তর কোরিয়া কিংবা কিউবার উপর অবরোধের যে ধরন আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রশক্তি ভারত কিংবা তাবেদার রাষ্ট্র পাকিস্তানের উপর জারী করা অবরোধের ধরন তাই এক নয়। কিউবার উপর দেওয়া অবরোধ ৫০ বছর পরও এখন পর্যন্ত জারী আছে, কিন্তু অন্যদিকে ১৯৯৮ সালে ভারত পাকিস্তানে অবরোধ দেওয়ার পরও তা সেভাবে কার্যকর হয়নি, বরং অল্প কয়েক বছর পরেই, ২০০৩-০৪ সালে তা শিথিল করা হয় এবং শীগগিরই তা উঠিয়ে নেওয়া হয়। এরমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র 'ওয়ার অন টেরর' নামে আফগানিস্তানসহ বিশ্বব্যাপী আগ্রাসী সন্ত্রাসী তৎপরতা শুরু করে।

ভারত পাকিস্তান উভয় দেশকেই বগলদাবা করে নিতে সক্ষম হয় যুক্তরাষ্ট্র। পাকিস্তানের উপর ভর করে আফগানিস্তানে নতুন পর্বের আগ্রাসন শুরু হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সাথে সামরিক চুক্তি করে ২০০৫ সালের ২৮ জুন। 'Agreement on the new framework for the India-USA defense relation' নামক চুক্তির মধ্যে কী কী ছিল? চুক্তির মধ্যে ছিল, সামরিক ক্ষেত্রে অব্যাহত পারস্পরিক যোগাযোগ ও উন্নয়ন; গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদান বৃদ্ধি; সমরাস্ত্র বাণিজ্য সম্প্রসারণ; প্রযুক্তি উৎপাদন, স্থানান্তর, গবেষণা ও উন্নয়ন; মিসাইল প্রতিরক্ষা সহযোগিতা সম্প্রসারণ; সামরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে উপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণ; নিরাপত্তা ও সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় যৌথ সামরিক তৎপরতা ও সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি (সন্ত্রাস ও সামরিকীকরণের বিস্তারে 'ওয়ার অন টেরর' যুক্তি হিসেবে এখন সর্বত্র ব্যবহৃত); যৌথ ও সমন্বিত মহড়া; বহুজাতিক কর্মসূচিতে সহযোগিতা বৃদ্ধি ইত্যাদি। ভারতের সাথে মার্কিন এই সামরিক চুক্তি ভারতের জনগণের জন্য তো বটেই পুরো দক্ষিণ এশিয়াতেই ভারত-মার্কিন অক্ষের অগণতান্ত্রিক আধিপত্য বৃদ্ধির একটি বড় অস্ত্র। বাংলাদেশ তার বড় শিকার। এই ধারাতেই ভারত এখন বিশ্বের সবচাইতে বড় অস্ত্র আমদানিকারক দেশ।

১৯৭৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জিমি কার্টার। সেই সময়ই মার্কিন এই প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, 'ভারতকে আমরা দক্ষিণ এশিয়ার নেতা হিসেবে মনে করি।' তখন ভারত এখনকার মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বলয়ের মধ্যে ছিল না। ভারতের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হচ্ছিল তখন। বরং ভারত তখন অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে। সে সময় ভারতকে মিত্র বানানোর প্রক্রিয়ায় উপরোক্ত কথাগুলো বলেছিলেন জিমি কার্টার। এখনকার পরিস্থিতি আরও অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। এখন স্পষ্টতই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার এই অঞ্চলের কেন্দ্র হলো ভারত। ভারতকে কেন্দ্র করেই এই অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা, পরিকল্পনা গৃহীত হচ্ছে এখন। এই পরিকল্পনার মধ্যে যেমন অর্থনৈতিক বিনিয়োগ তৎপরতা রয়েছে, তেমনি রয়েছে সামরিক তৎপরতা।

ইরান থেকে ভারতকে প্রচুর তেল আমদানী করতে হয়। এ কারণে ইরানের সাথে ভারতের সম্পর্ক এখনও ঘনিষ্ঠ। একই কারণে ঘনিষ্ঠতা রয়েছে সৌদি আরবের সাথেও। কয়েকবছর আগে সৌদি আরবের নতুন বাদশা যখন ক্ষমতায় আরোহণ করেন তখন প্রথম যে দেশটিতে তিনি সফরে এসেছিলেন সেটি হলো ভারত। কিন্তু পাকিস্তানে বর্তমান অব্দি তিনি সফর করেননি। ভারত সফর করে তিনি তেল আমদানী-রফতানি সহ আরও নানাবিধ চুক্তি সম্পাদন করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথেও তেমনি নানাবিধ অর্থনৈতিক, সামরিক ইত্যাদি চুক্তি রয়েছে।

মার্কিন রাষ্ট্রের সাথে ভারত রাষ্ট্রের, মার্কিন পুঁজির সাথে ভারতীয় পুঁজির এভাবে মিলেমিশে একাকার অবস্থায় ভারতের বর্তমান নড়াচড়া।

তাহলে বর্তমান ভারতকে আমরা বাংলাদেশে কীভাবে চিহ্নিত করবো? ভারতের সংবিধানে জওহরলাল নেহেরু নেতৃত্বাধীন সরকার তিনটি বিষয় যুক্ত করেছিলেন। এক, ভারত একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ। সংবিধানে এখন পর্যন্ত দেশটি চিহ্নিত হয়ে আছে সমাজতান্ত্রিক দেশ হিসেবে। দুই, ধর্মনিরপেক্ষতা। তিন, গণতন্ত্র। কিন্তু দলিলে লেখা দিয়ে তো হবে না। যে রাষ্ট্র বাস্তবে যা সেভাবেই তো তাকে চিহ্নিত করতে হবে।

ভারত সম্পর্কে বহুল প্রচারিত কথা হল এই যে, এটি সর্ববৃহৎ একটি গণতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। এদেশের অনেকে মনে করেন, ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করা দরকার এই কারণে যে, যদি ভারতের সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক বজায় থাকে তাহলে এখানে ধর্মান্ধ গোষ্ঠী মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না; অসাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর শক্তি বৃদ্ধি হবে, সেকুলারিজম বিকশিত হবে! গণতান্ত্রিক শক্তির শক্তিবৃদ্ধি হবে। কিন্তু কোন ভারত এটি?

ভারতের স্বাধীন লেখক চিন্তাবিদরাই ভারতের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরছেন বারবার। বর্তমান সময়ে এদের অন্যতম অরুন্ধতী রায়। যিনি তাঁর সৃজনশীলতা, বিশ্লেষণী ক্ষমতা, দায়িত্বশীল ও পরিশ্রমী লেখালেখির মধ্য দিয়ে সকল প্রচারণার বিপরীতে ভারতকে যথাযথভাবে উপস্থিত করছেন সেদেশের জনগণ ও বিশ্ববাসীর সামনে। তাঁর প্রকৃতই ভারতের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন। ভারতের শাসকশ্রেণীর কিংবা সাম্রাজ্যবাদীদের উন্নয়ন দামামা বা জৌলুস তাঁর চোখ ঝলসে দিতে বা মস্তিষ্ক অচল করতে পারেনি। তিনি ঠিকঠিক জনগণের জীবন আর শাসকশ্রেণীর প্রতারণা, নিষ্ঠুরতা সনাক্ত করতে পারছেন। তাঁর এবং তাঁর মতো ব্যক্তিদের লেখা, গবেষণা ও আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয় যে, ভারত সম্পর্কে প্রচারিত ধারণাগুলো প্রকৃত অর্থে এক একটি মিথ বা অতিকথন। এই মিথগুলো এতই প্রচার হয়ে থাকে যে, এগুলো সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

এরকম একটি মিথ হলো, 'ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র'। এখন পর্যন্ত দারিদ্র বৈষম্য ভরা ভারতের এক তৃতীয়াংশ অঞ্চল এই রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। খনিজসম্পদ সমৃদ্ধ এসব অঞ্চলে সামরিক বাহিনী যা খুশি তাই করতে পারে, তাদের সেই আইনী অধিকার আছে। কাশ্মীর, উত্তরপূর্বভারতসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সামরিক স্বৈরশাসন স্থায়ী হয়ে আছে, গণহত্যাসহ নির্যাতন নিপীড়নের অসংখ্য ঘটনা তৈরি হয়েছে এসব অঞ্চলে। মিডিয়াতে সেগুলো খুব কম আসে, যুক্তরাষ্ট্র যেখানে সুবিধামতো বিভিন্ন দেশে 'মানবাধিকার লঙ্ঘন' নিয়ে সোচ্চার থাকে, এক্ষেত্রে তা থাকে নীরব। যে দেশের মানুষ নিজ দেশের সেনাবাহিনী দ্বারা

অবরুদ্ধ, অত্যাচার-নির্যাতনের মধ্য দিয়ে বছরের পর শাসিত, সে দেশ কীভাবে সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হতে পারে? প্রায় এক তৃতীয়াংশ দেশ সামরিক বাহিনী দ্বারা পরিচালিত হবার পরও সেটি গণতান্ত্রিক দেশ? ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল সফর, অনুসন্ধান এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অরুন্ধতী রায় এসব অঞ্চলের ভয়াবহ বাস্ত বতা জানিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক চুক্তি, ভারতের শাসকদের জন্য বৈধতার সনদ, নিপীড়ন ও আধিপত্যের ক্ষমতা সম্প্রসারণ।

ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টিও এরকমই। ধর্মনিরপেক্ষতা-অসাম্প্রদায়িকতা ভারতের প্রাতিষ্ঠানিক প্রচার থাকতে পারে, কিন্তু বাস্তবে সে দেশের রাষ্ট্রীয় কিংবা সামাজিক কর্মকাণ্ড বিচার করা হলে বলার কোন উপায় থাকে না যে, দেশটি একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি, সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবাদী তৎপরতা এখনও ভারতের সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষমতা অন্যতম অবলম্বন। আর বাংলাদেশের জন্যও এগুলোই বিপদ। ভারতে যদি সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান ঘটে সেটি সরাসরি বাংলাদেশকে প্রভাবিত করে। সেখানে যখনই কোন ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী উন্মাদনা কিংবা সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে সেটি সরাসরি বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদী বা সাম্প্রদায়িকতার উত্থানে ইন্ধন যুগিয়েছে। সেটি হোক বাবরী মসজিদকে কেন্দ্র করে আগ্রাসী তৎপরতা কিংবা গুজরাটে সংঘটিত ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। যখনই এ ধরনের ঘটনা ঘটে ভারতে, তা পুরো দক্ষিণ এশিয়ায় সাম্প্রদায়িক, ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠীর বিষতৎপরতায় নতুন জীবন দান করে। ১৯৯২ থেকে জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবিতে যে আন্দোলন হয় সেখানে একটি শ্লোগান খুব জনপ্রিয় হয়েছিল, 'গোলাম আযম আদভানী, দুই দেশের দুই খুনী'। এটা খুবই ঠিক। ভারতে আদভানীদের মদদে যে দাঙ্গা হয় সেটি এখানে গোলাম আযমদের শক্তিবৃদ্ধিতে সহায়তা করে। তার বলি হয় দুইদেশেরই সাধারণ মানুষ।

কয়েকবছর আগে কলকাতার দূরদর্শনে একটি টকশো/বিতর্ক হচ্ছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি'র একজন, অন্যজন সিপিএম-এর। বিজেপি'র প্রতিনিধি সিপিএম-এর প্রতিনিধিকে এক পর্যায়ে বললেন, 'আপনারা তো সবসময়ই মুসলমানের দালালী করেন। ওপারে যে বহু হিন্দুকে মেরে ফেলছে তাতো আপনারা দেখেন না। ওপারে হিন্দুদের মেরে শেষ করে ফেললেও আপনাদের কোন খবর থাকবে না। কিন্তু এখানে কোন মুসলমানের গায়ে টোকা লাগলেই তা নিয়ে আপনারা হৈ চৈ করেন।' একই ধরনের অভিযোগ বাংলাদেশেও আমরা শুনি। এখানে যদি কোন সাম্প্রদায়িক নিপীড়ন হয় এবং যারা এর বিরোধিতা করে তাদের বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ করা হয়। বলা হয়, 'এখানে যদি কোন হিন্দু মারা যায় তা নিয়ে আপনারা হৈ চৈ করেন কিন্তু আপনারা কি দেখেন না যে, ভারতে অসংখ্য

মুসলমান মারা গেছে। তা নিয়ে তো আপনাদের কোন মাথাব্যথা নেই। এখানে হিন্দুদের উপর নির্যাতন নিয়েই কি শুধু আপনারা কথা বলবেন!' ভিন্ন দুই রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিনিধিত্বের একই সুর উপরোক্ত কথাবার্তার মধ্য দিয়ে টের পাওয়া যায়।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কিংবা সহিংসতা কিংবা সন্ত্রাস যারা সংগঠিত করে তাদেরকে মোকাবেলা করতে হয় দুদেশেরই প্রগতিশীল শক্তিকে। ভারতে এই সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী শক্তি তুলনায় অনেক বেশি ক্ষমতাবান। দিন দিন তাদের শক্তি এবং প্রভাব উভয়ই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের প্রভাব, প্রতিপত্তির ফলাফল বাংলাদেশেও টের পাওয়া যায়।

ভারত সম্পর্কে দুই ভুল বয়ান

ভারত সম্পর্কে বাংলাদেশে দুইধরনের ধরনের বক্তব্য শোনা যায়। একটি হল, 'ভারত ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সহযোগিতা করেছে, তাই তারা আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র। সেজন্য ভারত কখনোই আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না।' এরকম যুক্তি কাঠামোর মধ্য দিয়ে এটাও বলা হয় যে, 'অতএব ভারতের কোন সমালোচনা করা ঠিক নয়!' 'ভারতকে সমালোচনা করা অকৃতজ্ঞতার শামিল।' ভারত রাষ্ট্রের সমালোচনাকে বর্ণনা করা হয় ভারতবিদ্বেষ হিসেবে, এরকমও বলা হয় যে, 'ভারতের সমালোচনা মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানবাদীদের সহায়তা করে।' এই ধারণা বা যুক্তিসমষ্টিকে বলা যায় ভারত সম্পর্কে একটি বয়ান (ডিসকোর্স)। পাশাপাশি চালু অন্য বয়ানটি হলো, 'ভারত একটি হিন্দু রাষ্ট্র। মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অংশ হিসেবে, মুসলমানদের ধ্বংস করবার জন্যই ভারত বাংলাদেশ বিরোধী নানা তৎপরতা চালাচ্ছে।' বলা হয়, 'ভারতের সাথে বাংলাদেশের সমস্যা প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের সাথে কাফেরদের বিরোধ। তাই বাংলাদেশের অস্তিত্ব যদি টিকিয়ে রাখতে হয় তাহলে মুসলমান পরিচয়টাকে সামনে নিয়ে আসতে হবে। হিন্দু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইসলাম দিয়ে লড়াই করতে হবে।' দুই বয়ান এর মধ্যে আবার অন্তর্গত মিল আছে। দুক্ষেত্রেই কোনো না কোনোভাবে ধর্মীয় পরিচয় মুখ্য হয়ে উঠছে। দুটোতেই আড়াল করা হয় রাষ্ট্র, শ্রেণী এবং আধিপত্যের প্রধান ক্রিয়াশীল দিকগুলো ।

এই দুটো ডিসকোর্সই একেকটি ফাঁদ, এর যে কোনো একটির মধ্যে যদি আমরা পড়ে যাই তাহলে বর্তমানের প্রকৃত ভারত রাষ্ট্রকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না। এই দুয়ের কোনটির মধ্যে আটকে গেলে বাংলাদেশের উপরে যে কারণে ভারতের আধিপত্য তৈরী হচ্ছে কিংবা ভারতের আধিপত্যের কারণে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ যে কারণে হুমকির সম্মুখীন সেটিকে সঠিকভাবে মোকাবেলা করা যাবে না।

প্রথমত: ভারত কোন হিন্দু রাষ্ট্র নয়। কোন রাষ্ট্র মুসলিম কিংবা কোন রাষ্ট্র হিন্দু – রাষ্ট্র সম্পর্কে এভাবে বলা যায় না। যদি কোন রাষ্ট্র তার ধর্মপরিচয় ঘোষণা করে তবুও নির্দিষ্ট সে রাষ্ট্রটিকে ধর্মীয় কোন পরিচয় দিয়ে পুরোপুরি সনাক্ত করা যায় না। ভারত কখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেনি যে এটি একটি হিন্দু রাষ্ট্র, নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ দাবি তার। তারপরও হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে ভারতকে প্রতিষ্ঠার রাজনীতি এখন সেখানে যথেষ্ট শক্তিশালী। ভারতে যখন আদমশুমারী হয় তখন দেখা যায় যে সেখানে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ নিজেদের পরিচয় দেয় হিন্দু বলে। কিন্তু এই ৮০ ভাগের মধ্যে শতকরা প্রায় ১০ ভাগেরও কম উচ্চবর্ণের ও শাসকশ্রেণীর অংশ। এরাই মূলত: ক্ষমতাবান এবং তাদের হাতে ভারতের প্রধান নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। বাকীদের অধিকাংশ মানুষ মূলত: নিম্নবর্ণের অন্তর্গত, তার মধ্যে আবার উল্লেখযোগ্য অংশ মানুষকে ধরা হয় অচ্ছুৎ হিসেবে।

ভারতে মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের দ্বারা যতটা নিপীড়িত, তার চাইতে অনেক বেশী নিপীড়িত এই নিম্নবর্ণের হিন্দুরা এবং অচ্ছুৎ বলে পরিচিত মানুষেরা। ভীষণভাবে অবহেলিত, বঞ্চিত, ঘৃণিত! ভারত এমন একটি দেশ যেখানে শ্রেণী-জাতি নিপীড়নের পাশাপাশি বর্ণ (কাস্ট) নিপীড়ন এখন পর্যন্ত ব্যাপক মাত্রায় জারি আছে। পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিস্তার ঘটছে দ্রুত, অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক নানাবিধ পরিবর্তন ঘটছে, 'ইমারজিং পাওয়ার' বলে স্বীকৃতি মিলছে। কিন্তু জাতপাত নিপীড়নের বর্বরতার শৃঙ্খল থেকে ভারত মুক্ত হওয়া দূরে থাক, এখনো আটকে আছে গভীর খাদে। তীব্র আকারে সেটি জারী আছে ভারতীয় সমাজে বিভিন্ন ভাবে। কোন কোন অঞ্চলে এই বর্ণব্যবস্থার কারণে সৃষ্ট উচ্চবর্ণের দাপট ও নির্যাতন কথিত 'মধ্যযুগীয় বর্বরতা'কে হার মানায়।

বর্ণপ্রথাকে হিসাব করলে তাই ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে কোনভাবেই একক ধর্মের অনুসারি বলা যায় না। হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির বিস্তার এই দগদগে বিভেদকে ঢাকা দিতে পারে নাই। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান। ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষিত পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু মানুষ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সেখানকার অধিকাংশ মানুষই সুবিধাবঞ্চিত, নিপীড়িত। পূর্বাঞ্চলের মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপরই কয়েক দশক ধরে বৈষম্য ও নিপীড়নের পর্ব পার করে ১৯৭১ সালে তারা গণহত্যাসহ বর্বর নির্যাতনের পথ ধরেছিল।

তাছাড়া বাংলাদেশ যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের রাষ্ট্র হতো আর ভারত যদি হতো সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের রাষ্ট্র, কিংবা যদি দুটোতেই একই ধর্মাবলম্বীদের প্রাধান্য থাকতো তাহলে বর্তমানে বাংলাদেশ কিংবা ভারতের অধিকাংশ মানুষ যে আধিপত্য, বৈষম্য, নিপীড়ন, নির্যাতনের মধ্যে বসবাস করছে তার মধ্যে কি কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যেতো? না। কারণ, সুবিধামতো ধর্মীয় পরিচয় কাজে

লাগানো হলেও এগুলো মুখ্যত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং বৈষম্য ও অধিপতি ক্ষমতা প্রশ্ন।

উদাহরণ হিসেবে নেপালের কথাও উল্লেখ করা যায়। ধর্মীয় পরিচয়ের দিক দিয়ে দেখলে নেপাল হলো একটি হিন্দু রাষ্ট্র। তা সত্ত্বেও এই রাষ্ট্র, সেখানকার মানুষ ভারতের নিকট থেকে কোনপ্রকার সুবিধা বা বিবেচনা পায়নি। বরং তার বিপরীতে, ভারতের আধিপত্যের বিরুদ্ধে তাকে বহু লড়াই করতে হয়েছে, এখনো হচ্ছে। নেপালের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাথে কথা বলার যখন সুযোগ হয়েছে, তারা বলেছেন যে, ভারতের আধিপত্যের বিরুদ্ধে পার্শ্ববর্তী সকল দেশের জনগণের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক বৃহৎ জোট গঠন করা দরকার। বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের সমন্বয়ে। কারণ, ভারতের আধিপত্যের কারণে এসমস্ত দেশের জনগণের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা শৃঙ্খলিত হয়ে আছে। তাঁরা বলছেন, এই বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য প্রকৃত অর্থেই একটি বৃহৎ জোট গঠন করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ ১৯৭১ সালে 'ভারতের সহযোগিতা' সম্পর্কে যে প্রবল ডিসকোর্স রয়েছে সেটিও এরকমই ভ্রান্ত। কোন রাষ্ট্র সম্পর্কে এ ধরণের বদ্ধমূল স্থির ধারণা খুবই অযৌক্তিক। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের সহযোগিতামূলক ভূমিকার কারণে তার পরবর্তী ভূমিকা নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না, এটি খুবই বিপজ্জনক অবস্থান। রাষ্ট্র সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে ভারত সম্পর্কে প্রচলিত বদ্ধমূল বিশ্বাসের খপ্পরেই পড়তে হবে।

রাষ্ট্র কোন অনড় কিংবা অপরিবর্তনীয় কোন প্রতিষ্ঠান নয়। রাষ্ট্র যেমন কোন অনড় প্রতিষ্ঠান নয়, তেমনি এটি কোন মহানুভবতারও প্রতিষ্ঠান নয়। ব্যক্তির মহানুভবতা থাকে, দয়া-মায়া থাকে, সংবেদনশীলতা থাকে কিন্তু রাষ্ট্র সংবেদনশীল কোন প্রাণী নয়। রাষ্ট্র এমন কোন প্রতিষ্ঠান নয় যে, তা অন্যের দুঃখে বেদনার্ত হয় কিংবা অন্যের কষ্টে কাতর হয় কিংবা অন্যের জন্য সহানুভূতিশীল হয়। রাষ্ট্র হলো অনেক ধরনের প্রতিষ্ঠান এবং শ্রেণীস্বার্থের সম্মিলিত বহিঃপ্রকাশ। এটি এমন কতগুলো প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে তৈরী যা কোন ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালিত হয় না। ব্যক্তিকে আমরা চোখের সামনে দেখি, যেমন, নেহেরু, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, ইন্দিরা গান্ধী, মনমোহন সিংকে আমরা রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করতে দেখি কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত রুচি, ইচ্ছা, মত দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হয় এটা খুবই হয় শিশুসুলভ নয়তো নির্বোধ চিন্তা।

ব্যক্তি আসে যায়, রাষ্ট্র থাকে এবং ক্রিয়া করে নৈর্ব্যক্তিকভাবে। রাষ্ট্র পরিচালিত হয় নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় দর্শন, নীতি এবং অনেক ধরনের স্বার্থরক্ষাকারী গোষ্ঠীর সম্মিলিত প্রভাবে। ১৯৭১ সালে ভারতের ভূমিকা এগুলোরই বহিপ্রকাশ, তা দিয়ে ভারতের বর্তমান ভূমিকা কে বৈধতা দেয়া যাবে না। ১৯৭১ সালে ভারত নির্দিষ্ট ভূমিকা

রেখেছিল, সেসময় বাংলাদেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ের নানাবিধ মাত্রা ছিল, নানামুখি শক্তিসমাবেশ হয়েছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়ানোর সিদ্ধান্তের বিষয়ে ভারতের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক নানাবিধ বিবেচনা কাজ করেছে। এইসব নানাবিধ বিবেচনা এবং পর্যালোচনামূলক জায়গা থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত তার ভূমিকা নির্ধারণ করেছে।

ভারতের জনগণের সহযোগিতার বিষয়টি সেই রাষ্ট্র থেকে ভিন্নভাবে বিচার করতে হবে। কারণ রাষ্ট্র এবং জনগণ এক নয়। স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে ভারত রাষ্ট্র তার অনেক স্বার্থ বিবেচনা থেকে তার ভূমিকা নির্ধারণ করলেও জনগণের সহযোগিতার বিষয় ছিল ভিন্ন। সেখানে কোন স্বার্থচিন্তা নয়, বরং সেখানে ঠিকই কাজ করেছে সংবেদনশীলতা, মমত্ব ও সংহতি। বাংলাদেশের সীমান্ত পার হয়ে যারা সেসময় পাশ্ববর্তী অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদেরকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছিলেন সেখানকার জনগণ। ভারতের জনগণের সে আন্তরিকতা নিঃসন্দেহে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করতে হবে। বহু ধরনের কষ্ট তারা স্বীকার করেছেন বাংলাদেশের মানুষকে আশ্রয় দিতে গিয়ে।

ভারতের জনগণের এই আন্তরিক সহযোগিতা আর ভারত রাষ্ট্রের নীতি কোনভাবেই এক নয়। এই দুইকে এক করে দেখা নির্বুদ্ধিতা কিংবা এভাবে দেখানো নির্জলা প্রতারণা।

১৯৭১ সালে ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক চিত্র, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও নীতিগত যে অবস্থান ছিল– ২০১১ সালের সাথে তার পার্থক্য বিস্তর। ১৯৭১ সালে ভারত ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক সোভিয়েত ইউনিয়নের বন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ও ইয়াহিয়া খানদের প্রধান সহযোগী যুক্তরাষ্ট্রের শত্রু। ২০১১ সালের মধ্যে ভারত যেমন আভ্যন্তরীণ নীতি পরিবর্তন করেছে তেমনি আন্ত র্জাতিকভাবেও তার অবস্থান এখন ভিন্ন। এখন যুক্তরাষ্ট্র তার প্রধান মিত্র শুধু নয়, এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক সামরিক রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্ত ারের প্রধান খুঁটি এখন ভারত। ১৯৭১ সালে ভারতে হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিবাদী রাজনীতির এরকম কোনো সংগঠিত রূপ ছিল না, এখন তারা রাষ্ট্রক্ষমতার অংশ। হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির দাপট, ও গোঁড়া রক্ষণশীল ('নয়া উদারতাবাদী' বলে পরিচিত) অর্থনৈতিক সংস্কার, যুক্তরাষ্ট্রমুখি সামরিক নীতি মিলিয়ে আভ্যন্তরীণভাবে ভারত রাষ্ট্র এখন তার জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত, এই যুদ্ধেরই সম্প্রসারণ ঘটছে অন্যান্য দেশে তার আধিপত্য সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে।

সম্প্রতি এক বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায় 'অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুভাবেই দক্ষিণ এশিয়া এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হয়ে উঠেছে। ২০০৮ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর ইরাক থেকে সরে দক্ষিণ এশিয়ায় মনোযোগ

কেন্দ্রীভূত করেছেন প্রেসিডেন্ট ওবামা। এই অঞ্চলে ভারত, চীন, পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নানা মাত্রায় ঐক্য ও সমঝোতার প্রধান বিষয় হল, জ্বালানী খনিজ সম্পদ, ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ আর সেইসঙ্গে এগুলোর আমদানি রফতানির জন্য তেল ও গ্যাস পাইপলাইন, বন্দরের উপর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা'। (The Militarization of India, http://www.counterpunch.org/2011/05/27/the-militarization-of-india/)

তাহলে ভারতীয় হাইকমিশনের কী দরকার?

এরকম পরিপ্রেক্ষিতেই ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে। কিছুদিন আগে আনুষ্ঠানিক কথাবার্তার এক পর্যায়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছেন যে, 'বাংলাদেশের ক্ষতি হয় এমন কোন কাজ ভারত করবে না'। মনে হয়, এই উক্তির উপর দাঁড়িয়েই বাংলাদেশের বর্তমান সরকার কিংবা অনেক 'বিশিষ্ট ব্যক্তি' নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন। সীমান্তে বাংলাদেশের নাগরিকদের ওপর গুলি, নির্যাতনের ভয়াবহ এক একটি ঘটনা তৈরি করছে ভারতীয় বাহিনী, তাদের বর্বরতায় ভারতের অনেক সংগঠন ও নাগরিকেরাও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, তাঁদের কেউ কেউ বিএসএফকে নি:শর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলেছেন। কিন্তু সরকারের অবস্থান খুবই নমনীয়, কেউ কেউ বিএসএফ-এর পক্ষে যুক্তিও সাজাচ্ছেন। ভাবটা এমন, মনমোহন সিং তো বলেইছেন যে, 'বাংলাদেশের ক্ষতি হয় এমন কোন কাজ ভারত করবে না', তাহলে আর চিন্তা কী? খুন হতে থাকলেই বা কী?

সীমান্তে হত্যাকান্ড, গুম, নির্যাতন চলছেই, টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে বাংলাদেশকে কিছু না জানিয়ে ভারত একটি নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করে ফেললো, অভিন্ন নদীগুলো নিয়ে ইচ্ছামতো তারা নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে, বাংলাদেশের স্বার্থ বিবেচনা না করেই ট্রানজিটের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে, কোনটিই বাংলাদেশের জন্য কোন নয়! টিপাইমুখ নিয়ে এই চুক্তির তীব্র প্রতিবাদের মুখে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা গওহর রিজভী এবং মশিউর রহমান টিপাইমুখ নিয়ে আলোচনার জন্য ভারত গেলেন। ফিরে এসে বাংলাদেশের জনগণের সামনে বললেন যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'টিপাইমুখ নিয়ে চুক্তি হলে বাংলাদেশের কোন ক্ষতি হবে না। এবং বাংলাদেশের কোন ক্ষতি তারা করবেন না!'

ট্রানজিট বা টিপাইমুখ নিয়ে কিংবা বাংলাদেশের অন্যান্য বিষয়ে ক্ষতি নির্দিষ্ট করবে কে? কোনটিকে ক্ষতি বলা হবে আর কোনটিকে ক্ষতি বলা হবে না তা ঠিক হবে কীভাবে? ক্ষতি টা আসলে কার হচ্ছে? কতটা ক্ষতি তা নির্ধারণ করবে কে? ভারতের প্রধানমন্ত্রী? 'সামান্য ক্ষতি' নিয়ে রাণীর গল্প মনে পড়ে। এক শীতের সকালে রাণী চিন্তা করলেন যে, তিনি আগুন পোহাবেন, হাত পা গরম করবেন, অন্যভাবে। রাণীর ইচ্ছা অনুযায়ী নদীর পাড়ে ধোপাদের যেসব কুড়েঘর ছিল

সেগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হলো আগুন পোহানোর জন্য। ধোপাদের আহাজারি শুনে রাণী অবাক, এর কারণ তিনি বুঝতে অক্ষম। এ সমস্ত ঘর থাকলেই কী আর না থাকলেই বা কী? এগুলোতো সামান্য কুঁড়েঘর। রাণীকে যখন প্রশ্ন করা হয় যে, কেন তিনি এই কাজটি করলেন? তিনি উত্তর দিলেন, এতে সমস্যা কোথায়? এতো 'সামান্য ক্ষতি '!

টিপাইমুখ বাঁধ হলে নদী-নালা, খাল-বিল যদি শুকিয়ে যায় তখনও এরকম কথা বলবার লোক থাকবে যে, এতে তো বাংলাদেশ লাভবানই হচ্ছে, রাস্তা-ঘাট নির্মাণের অবস্থা তৈরী হয়েছে। লোকজন হাঁটাচলা কিংবা গাড়ী চলাচলের জন্য সুবিধা হলো নদী শুকিয়ে যাওয়ার ফলে। হয়তো বলা হবে, নদী-নালা শুকিয়ে যাচ্ছে বটে কিন্তু চাষযোগ্য হয়ে উঠছে বাংলাদেশের জমি! কিংবা ধরা যাক, বন্যা হলে যদি বলা হয় যে, বন্যার ফলে বাংলাদেশ লাভবান হচ্ছে। বাঁধের ফলে নদী শুকিয়ে যাওয়ায় আগে যেখানে নৌকা চালাতে পারতো না মাঝিরা, এখন বন্যার ফলে সেখানে নৌকা চালানো যাবে! অতীতেও নানা ধরনের ধ্বংসাত্মক প্রকল্পের ক্ষেত্রে এরকম ব্যাখ্যা দেওয়া হতো, এখনো হচ্ছে। ক্ষমতায় বসে থাকলে, যে কোনো অপকর্মের কোন না কোন ইতিবাচক ব্যাখ্যা সহজেই দাঁড় করানো যায় এবং জনগণের সামনে তা বুক ফুলিয়ে বলে বেড়ানোও সহজ। তার উপর রিজভী এবং মশিউরের মতো লোকজন যদি সরকারে থাকেন তাহলে তো কথাই নেই।

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী বললেন যে, 'টিপাইমুখ নিয়ে আমাদের বেশি কথা বলা ঠিক নয়। কারণ, এটা ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয়!' বাংলাদেশের দায়িত্ব যদি এধরনের লোকের হাতে থাকে তাহলে অবস্থা যে কত সঙ্গীন তা খুব ব্যাখ্যা করবার দরকার হয় না। যে নদী একাধিক দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় সেটি হলো আন্তর্জাতিক নদী। আন্তর্জাতিক নদীর উপর কোন কিছু করা কোনভাবেই অভ্যন্তরিন বিষয়ের মধ্যে পড়ে না, এই সহজ বিষয়টি যারা বোঝেন না তারাই আছেন পানি সম্পদের দায়িত্বে! বরং এই বক্তব্যের বিপরীতে, বাংলাদেশের জনগণ অভিযোগ করতে পারেন যে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরিন বিষয়ে ভারত হস্তক্ষেপ করছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পানি প্রবাহ ঠেকানোর কারণে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত যে ক্ষতি হচ্ছে তাতে এরকম অভিযোগ খুবই যুক্তিসঙ্গত যে, ভারতই বাংলাদেশের বিষয়ে আগ্রাসী হস্তক্ষেপ চালাচ্ছে।

সরকারের বিভিন্ন মহল থেকে বলা হয়েছে, ট্রানজিট নিয়ে কোন চুক্তি হয়নি। কিন্তু ইতোমধ্যে আশুগঞ্জে ভারতীয় ট্রাক প্রবেশ করানো হয়েছে, বাংলাদেশের তিতাস নদীর প্রবাহ রন্ধ করে আড়াআড়ি রাস্তা বানিয়ে তাদের ভারী মালামাল পার করা হয়েছে। ট্রানজিটের ফি নিয়ে অর্থমন্ত্রী মুহিত বললেন, 'এটা কোন বিষয় নয়। ফি নির্ধারণ করা নিয়ে জটিলতা? এক সপ্তাহের মধ্যে বসে আমরা ঠিক করে

ফেলবো। একটি সেমিনার করে আমরা এটা নির্ধারণ করে নেবো।' ফি নির্ধারণের বিষয়ে মশিউর রহমান বলেছেন, 'বর্তমান ডব্লিউটিও-র নীতি অনুযায়ী এটা করা ঠিক হবে না। ফি নির্ধারণ করা এখন আমাদের জন্য অসভ্যতা।' রিজভী তো বলেই যাচ্ছেন, ভারত বাংলাদেশের কোনো ক্ষতি করবে না।

বাংলাদেশে ভারত নানাভাবেই আছে। তার মধ্যে আছেন নানা জায়গায় এই ধরনের লোকজন। বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা কিংবা মন্ত্রীদের তো বাংলাদেশের স্বার্থ দেখার কথা, তাঁরা তো ভারত সরকারের প্রতিনিধি নন! এই ভদ্রলোকেরা যেভাবে ভারতের পক্ষে কথা বলতে থাকেন তাতে মনে হয় এরা থাকতে বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশন থাকার দরকার নাই। এরাই তো সেই ভূমিকা পালন করছেন। কিন্তু দূতাবাসকে তো কিছু কাজ দিতে হবে। সে কাজ যদি বাংলাদেশের উপদেষ্টা কিংবা মন্ত্রীরা করে দেন তাহলে তারা আর কী কাজ করবে?

ট্রানজিট বিষয়ে সরকার বা কেউ কেউ বলেন যে, 'বিশ্বায়নের এই যুগে ট্রানজিটের বিরোধিতা ঠিক নয়'। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য ভারতের কাঙ্খিত ট্রানজিট কী? এর মানে কি বাংলাদেশের উন্মুক্ত হওয়া না অধীনস্ত হওয়া? আসলে বিশ্বের প্রতিটি দেশ অন্য দেশের জন্য উন্মুক্ত থাকা উচিৎ, সেটাই প্রকৃত বিশ্বায়ন। এমন একটি বিশ্বব্যবস্থা হওয়া উচিৎ যেখানে প্রতি দেশের সাথে প্রতি দেশেরই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকবে এবং চাইলেই এক দেশ অন্য দেশের ভেতর দিয়ে ভিন্ন কোন দেশে যাতায়াত করতে পারে। আমরা চাই, পৃথিবীর তাবৎ দেশ বাংলাদেশে আসুক, বাংলাদেশও পৃথিবীর সব দেশে যাবে। যদি এরকম হয় যে, পৃথিবীর শক্তিধর কয়েকটি রাষ্ট্র বাংলাদেশে আসবে এবং যা খুশি তাই করতে পারবে আর বাংলাদেশ সেসব দেশে যেতে পারবে না, ব্যবসা-বাণিজ্য-ভ্রমণ কিছুই ঠিকঠাকভাবে করতে পারবে না, বরং কাঁটাতারে ঘেরাও হয়ে থাকবে তাহলে তাকে আর যাই হোক উন্মুক্ত হওয়া বলা যাবে না। বাংলাদেশে সেটাই হচ্ছে।

টেবিলের দুপাশে আসলে একই পক্ষ

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যখন কোন আন্তর্জাতিক দরকষাকষি হয় তখন অনেকের মনে হতে পারে যে, টেবিলের এক পাশে বাংলাদেশের প্রতিনিধি/পক্ষ, অন্য পাশে অন্য পক্ষ। কিন্তু প্রায়ক্ষেত্রেই দেখা যায়, দুই পাশে আসলে বসে আছে একই পক্ষ। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যে বা যারা প্রতিনিধিত্ব করেন তারা বাহ্যিকভাবে এদেশের পক্ষ, চেহারা সুরত এ দেশেরই, কিন্তু কার্যত প্রতিনিধি প্রতিপক্ষের, তাদের স্বার্থ দেখাই তার কাজ। দু'একজন যে এর থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করেন না তা নয়। কিন্তু পুরো প্রক্রিয়াটিই এমন যে, তা খুব কার্যকর হয় না।

নির্দিষ্ট বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা আছে এমন বিশেষজ্ঞ লোক আমলাতন্ত্রের মধ্যে আছে, এরকম লোক তৈরিও হয়, কিন্তু সরকারের নীতিগত অবস্থান অনুকূল না হলে তারা কাজ করবে কী করে? তাছাড়া দক্ষতা তৈরি ও তার ব্যবহারের কোনো পরিকল্পিত কাঠামোও নেই। কোন একজন আমলা যিনি যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের অধিকারী তাকে দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায় ভিন্ন কোন বিভাগে, মন্ত্রণালয়ে। যেমন এমন লোক হয়তো আছে যার মেরিটাইম বাউন্ডারি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান আছে, পড়াশুনা আছে। কিন্তু দেখা গেল তার পোস্টিং হলো হয়তো স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে। এরকমই ঘটে। বাংলাদেশের জনগণের অর্থে পড়াশুনা করা, বিদেশে প্রশিক্ষণ নেয়া আমলাদের নিয়ে অনুসন্ধান করলে এরকম চিত্রই পাওয়া যাবে; দেখা যাবে বহুভাবে জনগণের অর্থ এবং সামর্থ্যের অপচয়।

বাংলাদেশে দক্ষতা তাই কোন সমস্যা নয়, সমস্যা থাকলে তা দূর করাও সম্ভব। আন্তর্জাতিক যে কোন বিষয়ে যেমন: টিপাইমুখ, অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন, ট্রানজিট, সীমান্ত হত্যা, বাণিজ্য, ঋণ ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশ মোকাবেলা করতে পারবে না এটি ভাবার কোন কারণ নেই। মোকাবেলা করতে পারবে যদি জনগণের পক্ষে সরকারের একটি স্পষ্ট অবস্থান থাকে, সরকার যদি জনগণের প্রতিনিধি হয়, আমলাতন্ত্রের মধ্যে প্রতিপক্ষের স্বার্থরক্ষাকারীদের অবস্থান যদি আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে।

৫৪ টি নদীর অভিন্ন পানি বণ্টন নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের স্পষ্ট কোন বক্তব্য কিংবা কোন পজিশন পেপার আছে? ট্রানজিট নিয়ে বাংলাদেশের স্বার্থ নিশ্চিত করবার মতো কোন অবস্থানপত্র কি বাংলাদেশ সরকার তৈরি করেছে? টিপাইমুখ নিয়ে এই দেশে যখন প্রতিবাদ-প্রতিরোধ সংঘটিত হচ্ছে, সে সময়ই জানা গেল সিলেট অঞ্চলে হাড়ি নদীর ওপারে ভারত বাঁধ নির্মাণ কাজ প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছে। বিষয়টি এমন নয় যে ভারত রাষ্ট্র কোন এক সকালে হঠাৎ করে কাজে হাত দিয়েছে। ভারতে নদী সংযোগ প্রকল্পের ভয়াবহতা আমাদের সামনে আসছে। এসব বিষয়ে সরকারের কোন ভাবনা বা প্রস্তুতি দেখা যায় না। মনোযোগ ও প্রস্তুতির দশা যদি এই হয়, তাহলে কী নিয়ে প্রতিপক্ষের সাথে বাংলাদেশ দর কষাকষি করবে? কীভাবে হাজির করবে নিজেকে? দেশের জনগণের পক্ষে কী যুক্তি থাকবে? কীভাবে পুরো বিষয়টির মোকাবেলা করা হবে? সেক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের যুক্তি মেনে নেওয়া ছাড়া কী উপায় থাকে? জনগুরুত্বপূর্ণ এসব বিষয় নিয়ে দেশের জনগণের মধ্যে আলোচনা বা ঐকমত্য তৈরির চেষ্টা দূরের কথা, সংসদেও এসব নিয়ে আলোচনা হয় না।

এই অবস্থা তৈরি হয়েছে সরকারগুলোর নীতিগত অবস্থানের কারণেই। বাংলাদেশে যারা সত্যিকার অর্থে উৎপাদনশীল খাতে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে চায়

তাদের জন্য নানা প্রতিবন্ধকতা; অন্যদিকে যারা নদী-নালা, খাল-বিল, জমি-জঙ্গল, রাষ্ট্রীয় সম্পদ দখল-ধ্বংস-লুণ্ঠন করতে চায় তাদের জন্য রয়েছে নানা পৃষ্ঠপোষকতা। অভ্যন্তরিন এবং আন্তর্জাতিক দখলদার লুটেরাদের অনুকূল নীতিমালা ও প্রশাসন ভারতের শাসকশ্রেণীর জন্য খুবই সুবিধাজনক।

ক্ষমতা বলয়ের বাইরে দুইদেশের জনগণের স্বার্থ অভিন্ন

ভারতে শ্রেণীগত গঠন, পুঁজির পুঞ্জীভবন, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে ভারতের অবস্থান, 'ওয়্যার অন টেরর' কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করে ভারতের শাসক শ্রেণীর মধ্যে সুপার পাওয়ার হওয়ার আগ্রহ তৈরী হয়েছে। তার সপক্ষে জাতীয়তাবাদী বিভিন্ন প্রচারণার দাপট ভারতে। প্রচারণার কারণে ভারতে পারমাণবিক বোমা ফাটানোর পর মোহাবিষ্ট একজন দরিদ্র নিপীড়িত ব্যক্তিও উল্লসিত হয়। মানুষ মনে করে ভারত বোমা ফাটিয়ে বৈশ্বিক একটি শক্তিতে পরিণত হলো এবং শাসকশ্রেণীর এই শক্তির অংশীদার তারাও। পাকিস্তানের মধ্যেও একই ধরনের উন্মাদনার বহিঃপ্রকাশ হতে দেখা যায়। সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত, কিন্তু যখন পাকিস্তান বোমা ফাটিয়ে নিজেকে পারমাণবিক শক্তিধর হিসেবে জানান দিলো তখন সেখানকার মানুষ উল্লাস করেছেন। নাম দেয়া হয়েছিল 'ইসলামিক বোমা'। এখন সেই পাকিস্তানের উপরই উপর্যুপরি বোমা হামলা হচ্ছে, দিশেহারা সাধারণ মানুষ। পারমাণবিক ক্ষমতাধর রাষ্ট্র তাদের কোন নিরাপত্তা দিতে অক্ষম।

ভারতের অভ্যন্তরে পুঁজি যত স্ফীত হচ্ছে এবং তার এই স্ফীতির কারণে নতুন নতুন ক্ষেত্র-বাজার দখলের জন্য তাগিদ তৈরী হয়েছে। সংবর্ধন প্রক্রিয়ায় ভারতের সমাজে নিপীড়ন এবং বৈষম্য প্রবল মাত্রায় জারী আছে। যদিও সরকারি পরিসংখ্যানের উপর ভরসা করা কঠিন, তবুও তাদের পরিসংখ্যান যদি হিসেবের মধ্যে নেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে ভারতে যে মাত্রায় বৈষম্য বিদ্যমান, বাংলাদেশও তার খুব কাছাকাছি অবস্থান করছে। অর্থাৎ বৈধ অর্থনীতির পরিসংখ্যানের হিসেবে ভারত এবং বাংলাদেশের বৈষম্যের হার প্রায় সমান সমান। এছাড়া অন্যান্য নিপীড়নের তুলনামূলক চিত্র যা পাওয়া যায় তার মধ্যে বাংলাদেশে শ্রেণী নিপীড়নই প্রধান। অন্যদিকে, ভারতে শ্রেণী, জাতি, বর্ণ এই তিনভাবেই সেখানকার জনগণ নিপীড়িত। আঞ্চলিক, লিঙ্গীয় বৈষম্যও বাংলাদেশে যেমন তেমনি ভারতেও বেশ ভালোভাবেই জারী আছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে এই ভারতের যে আধিপত্যের ধরন দেখা যাচ্ছে তা বাংলাদেশের জন্য অনিবার্য নয়। বাংলাদেশে এখন প্রায় ১৬ কোটি মানুষ বসবাস করছেন। জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর মধ্যে এটি কোন ছোট দেশ নয়। সাধারণভাবে প্রচার হলেও এই দেশটি মোটেও কোন গরীব দেশ নয়। বলা যায়,

গরীবের দেশ। সম্পদ এবং শক্তির দিক থেকে নিজেকে খাটো করে দেখার কোন কারণ নেই। কিন্তু ভিন্ন একটি রাষ্ট্রের আগ্রাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে পেরে ওঠার জন্য শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে আগ্রহ এবং বলের অভাব। মেরুদণ্ডহীনতা আর আত্মমর্যাদা একসাথে থাকতে পারে না।

বাংলাদেশে যেভাবে শাসক শ্রেণীর বিকাশ ঘটছে তাতে তাদের মেরুদণ্ডটি তৈরী হয়নি। তার সমস্ত সিদ্ধান্ত তৈরী হচ্ছে হয় বিশ্বব্যাংক-এডিবি'র অফিস থেকে, আর নয়তো ভারত বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস থেকে। বিশ্বব্যাংক, এডিবি'র উপর নির্ভরশীল এবং ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী যদি অর্থনৈতিক নীতি হয় তাহলে ভারতের শাসক শ্রেণীর আধিপত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর উপায় কী? বিশ্বব্যাংক গোষ্ঠীর নীতি বৃহৎ পুঁজির স্বার্থেই প্রণীত ও পরিচালিত। বিএনপি-জামাত ভারতের বিরুদ্ধে কথা কখনো বলে, কখনো বলে না। কেউ কেউ তাদের কথাবার্তা শুনে ভরসাও করতে চেষ্টা করে। কিন্তু ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, অর্থনৈতিক নীতি, লুণ্ঠন দখল, কমিশনের বিনিময়ে জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তি, ভারতের বৃহৎ ব্যবসা কিংবা বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ সম্পর্কিত আওয়ামী লীগের যে অবস্থান তার সাথে বিএনপি-জামাত জোটের অবস্থানের কোন তফাৎ নাই। বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে বিএনপি আদমজী জুট মিল বন্ধ করে দেয় অন্যদিকে একই সময়ে ভারতের বড় বড় পাটকল গড়ে ওঠে। আওয়ামী লীগের সময়ে স্টিল মিল বন্ধ হয়, ভারতের বৃহৎ কোম্পানি টাটাকে সে জায়গায় বসাতে চেষ্টা করে বিএনপি-জামাত সরকার। বাংলাদেশে ভারতের গাড়ির বাজার তৈরির অর্থসংস্থান করে জামাতের ইসলামী ব্যাংক। আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট উৎসবে প্রধান ভূমিকা দেখা যায় সেই ব্যাংকেরই।

বাংলাদেশ যে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব বলয় বা আয়ত্তের মধ্যেই আছে এই খবর নতুন কিছু নয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রও যে তার ক্ষমতা ও দাপটের সঙ্কটের মধ্যে আছে তা আমাদের বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন সারা বিশ্বে যেমন বিভিন্নভাবে ত্রাস সৃষ্টি করছে তেমনি এই রাষ্ট্রটিও নানা ধরনের ভীতির মধ্যে আছে। কিছু ভীতি আছে বাস্তব। আর কিছু আছে ফ্যান্টম ধরনের, আর কিছু তৈরি করা।

প্রভাব রক্ষায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে চীন একটি ভীতি। ভারত নিয়েও সংশয় বা সতর্কতা আছে যুক্তরাষ্ট্রের। ভারতের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের নানাবিধ চুক্তির অর্থ এই নয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভাবছে যে, ভারতকে নিয়ে যা খুশি তাই করা যাবে। ভারতকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে যথেষ্ট টানাপোড়েন আছে। ভারতের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একীভূত বেশ কিছু প্রকল্প আছে। ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি আছে দখলদারিত্ব, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি প্রশ্নে। কিন্তু পাশাপাশি ভারতের নিজস্ব কিছু

পরিকল্পনা, উদ্যোগ, কর্মসূচিও আছে। সামরিক ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আওতার বাইরে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের নিজস্ব পরিকল্পনা আছে যেখানে তারা যুক্তরাষ্ট্রের খবরদারীর জায়গা দিতে আগ্রহী নয়। ভারত মহাসাগরের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা নিয়ে ভারত তাদের নৌ বাহিনীকেই যথেষ্ট মনে করে। সুতরাং আলাদা করে মার্কিন নৌবহরের আসা নিয়ে জটিলতারও সম্ভাবনা। আপাতত ভারত মহাসাগর নিয়ন্ত্রণের কাজটি যৌথভাবে করার উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে।

'ওয়্যার অন টেরর'-এর নামে প্রকৃত অর্থে সারা বিশ্বব্যাপী 'টেরর' তৈরী করা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে। ভারত এর অন্যতম অংশীদার। সামরিক এই কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে নিজের দেশে এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে ভারতের ফ্যাসিস্ট হিসেবে আবির্ভাবের সব লক্ষণই দেখা যাচ্ছে। কার বিরুদ্ধে এরা যুদ্ধ করবে? সামরিক আগ্রাসন, প্রস্তুতি এবং রাষ্ট্রকে আরও বেশি দমনমূলক করার যে প্রক্রিয়া তার জন্য কৃত্রিম একটি শত্রু বা ফ্যান্টম প্রয়োজন হয়। এই শত্রু আসলে কে? সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো বড় হুমকির অস্তিত্ব কি এখন বিদ্যমান? তাহলে বর্তমানে 'ওয়্যার অন টেরর'বাদীদের হুমকি আসলে কে? তার প্রধান ভীতি আসলে বিশ্বের জনগণ।

'তৃতীয় বিশ্বে'র একজন আক্রান্ত রাষ্ট্রপ্রধান বলেছিলেন যে, সামরিক বাহিনী প্রকৃত অর্থে অন্য কোন দেশ নয় কার্যত নিজের দেশের জনগণকেই শৃঙ্খলিত করে। ভারতের সামরিক বাহিনীর প্রধানের কাজ কী? সারা বছর কার বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করে? পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ কিংবা যে টেনশন সেটি নিশ্চয়ই সারা বছর ধরে থাকে না! কয়েক বছর পর পর হয়। তাহলে, বাকী বছর ভর তারা কার বিরুদ্ধে বাহিনীকে প্রস্তুত করে? অবশ্যই তা নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর কাজ হলো, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে জনগণ জল, জমি, জঙ্গল রক্ষার লড়াই করে; অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ, হত্যা এবং আগ্রাসন চালানো। 'দেশপ্রেমিক বাহিনী' হিসেবে ভারতীয় মিলিটারি সম্পর্কে যেভাবে মিথ তৈরীর প্রচেষ্টা চলে; সিনেমা, নাটক, গান তৈরী হয়; ভারতীয় জনগণের মনে যে ভাব তৈরী করার চেষ্টা চালানো হয় তার বিপরীতে এটিই সত্য যে, যে সমস্ত অঞ্চলের জনগণ নিজ অধিকার আদায়ের জন্য সচেষ্ট কিংবা প্রতিবাদমুখর তাদের দমন-পীড়ন-অত্যাচারের কাজেই নিয়োজিত ভারতীয় সামরিক বাহিনী। আসাম, মনিপুর, ত্রিপুরা, ঝাড়খণ্ড, অন্ধ্র, কাশ্মীর ইত্যাদি কয়েকটি উদাহরণ মাত্র।

দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ওয়্যার অন টেরর'এর নামে বিশেষ মহড়া, যৌথ মহড়ার অর্থ হলো, নির্দিষ্ট দেশের নিজস্ব জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার যে ধরন, জাতীয় রাষ্ট্রের সাবভৌমত্ব ইত্যাদি আর সেভাবে কার্যকর থাকবে

না। এই অঞ্চলে সরকার আছে, থাকবে; কিন্তু তা মূলতঃ পুতুলের মতোই, এ ছাড়া আর কোন ভূমিকা পালন করতে পারবে না। ভারতের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চুক্তি অনুযায়ী ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাও কতটা স্বাধীন সেটাও একটা প্রশ্ন।

এরকম পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব নিয়ে প্রশ্ন তো আরও তীব্র। মার্কিন-ভারত প্রভাব বলয়কে অস্বীকার করা কিংবা তার জাল ছিন্ন করার মতো মেরুদণ্ড এখানকার শাসকশ্রেণীর নেই। অর্থনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে মার্কিন-ভারত আধিপত্যের নানা দিক এখন আর গোপন কোন বিষয় নয়। মূল ধারার রাজনৈতিক দলগুলোর বাহ্যিক নানা ধরনের পার্থক্য, কথাবার্তা, বিরোধিতা ইত্যাদি সত্ত্বেও মূল ইস্যুতে অর্থাৎ মার্কিন-ভারত এজেন্ডা বাস্তবায়নের একে অপরের প্রতিযোগী। এর মধ্যেই বাংলাদেশের জনগণের বসবাস।

২০০১-৬ সময়কালে চারদলীয় জোট যখন ক্ষমতায় ছিল তখন আওয়ামী লীগ তাদের অভিযুক্ত করেছিল 'ভারতের প্রতি নতজানু সরকার' বলে। প্রকৃতপক্ষে সরকার প্রধান বা প্রধান বিরোধী দলীয় নেতা মুখে যেসব কথা বলেন সেগুলোকে যত কম গুরুত্ব দেওয়া যায় ততই ভালো। দরকার হলো, তারা যেসব নীতি-কর্মসূচী গ্রহণ করছে, কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান তৈরী করছে কিংবা কোন কোন প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন করছে এবং কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করছে সেগুলো বোঝা। তার মাধ্যমেই তাদের বুঝতে হবে। কথার সাথে কাজের মিল-অমিল তখন উপলব্ধি করা যাবে। মাঠে-ময়দানে বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়ে তাদের বিচার করা যাবে না এবং তাদের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না।

প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ক্ষমতায় থাকার জন্য কিংবা বিরোধী দলে অবস্থানকালে জনগণের সমর্থন আদায় করার জন্য অনেক সময় লিখিত ভাষ্য কিংবা মনে তাৎক্ষণিক যা আসে তাই তাঁরা বলে যান। অনেক সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে জবাব যা দেন অনেকসময়ই তার কোন অর্থ থাকে না। সরকারী দল আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে অনেক লোক আছে যারা ভারতের টিপাইমুখ বাঁধ এর সমর্থক নয়। ট্রানজিট নিয়ে বিরোধিতা আওয়ামী লীগের লোকজনদের মধ্যেও আছে। কিন্তু যেহেতু তারা সরকারে আছে তাই তারা এই বিষয়গুলো নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করতে পারে না। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী যদি একটু চুপ থাকতেন তাহলে দেখা যেত সরকারের ভেতরের অনেকে টিপাইমুখ কিংবা ট্রানজিট নিয়ে বিরোধী বক্তব্য দিতেন। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে জনগনের স্বার্থ সম্পর্কিত কোন বিষয়ে যদি কোন বিতর্ক তৈরী হয় এবং প্রধানমন্ত্রী সে বিষয়ে যদি কোন অবস্থান গ্রহণ করে ফেলেন, তাহলে সাথে সাথে সমস্ত বিতর্ক বন্ধ হয়ে যায়। কেউ আর সে বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করে না।

যাইহোক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থাৎ সামগ্রিক সাম্রাজ্যবাদী যে প্রক্রিয়া, নীতি কাঠামো সেটা বর্তমান ভারতকে অনুধাবন করতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি কেউ বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য কিংবা দাপট মেনে নেবো কিন্তু ভারতের আধিপত্য মানবো না; মার্কিন দূতাবাসের কথা শুনবো কিন্তু ভারতীয় দূতাবাসের কথা শুনবো না; এটি হওয়ার কোন জো নেই। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুই মিলে অনেকক্ষেত্রেই এক। এই রাষ্ট্র দু'টো একাকার হয়ে গেছে নানাভাবে। নানা ধরনের স্বার্থের কারণে। ভারতের কর্মসূচি দিয়ে যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লাভবান হয় তেমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মসূচিতে ভারত লাভবান হয়। টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণে কিংবা নদী সংযোগ প্রকল্পে অর্থ দিচ্ছে বিশ্বব্যাংক। আবার এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের শাসকদের পরিচালক, পথপ্রদর্শক।

দুই ভারত দুই বাংলাদেশ

ভারত সম্পর্কে এই বিষয়টি হিসেবের মধ্যে রাখতে হবে যে, ভারত বলতে অখণ্ড কোন দেশ নেই, কোন একক সত্ত্বা বলে কোন কিছু নেই। ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বার্থ এবং বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বার্থ অভিন্ন। তাদের নিজেদের নদী রক্ষা করা দরকার, বাংলাদেশের মানুষেরও নদী রক্ষা করা দরকার। তাদেরও বহুজাতিক কোম্পানি, সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য এবং সামরিকীকরণ থেকে মুক্ত হওয়া দরকার, বাংলাদেশের মানুষেরও তাই।

ভারতে প্রতি বছর অসংখ্য কৃষক আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। গত ২০১০ সাল পর্যন্ত প্রায় ২ লক্ষ কৃষক আত্মহত্যা করেছে। বৈশ্বিক বহুজাতিক কোম্পানির আধিপত্য বিস্তার, দেশীয় উন্নয়ন নীতির কারণে কৃষকদের ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং ফলশ্রুতিতে এই আত্মহত্যা। বিশাল সম্পদশালী দেশ, অথচ প্রতিবছর কৃষকদের আত্মহত্যার এই প্রবণতা বাড়ছেই।

ভারতের কৃষকদের যারা শত্রু বাংলাদেশের কৃষকদের শত্রুও তারাই। সুতরাং লড়াইও অভিন্ন হওয়া দরকার। সেজন্য ভারতের শাসক শ্রেণী মানে সেখানকার ১২০ কোটি মানুষের প্রতিনিধি নয়, যেমন বাংলাদেশের শাসক শ্রেণীও ১৬ কোটি মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে না। বাংলাদেশের শাসক শ্রেণী যদি সমগ্র জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতো তাহলে তার চেহারা অন্যরকম হতো। বিদেশী আধিপত্যকারীদের সামনে যেভাবে তারা নতজানু হয় কিংবা মেরুদণ্ডহীনতার পরিচয় দেয়; যদি সমস্ত জনগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতো তাহলে নিজেদের শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী অবস্থান গ্রহণ করতো। জনগণের শক্তিই তাদের মেরুদণ্ড দিতো। ভিন্ন ধরনের একটি রাষ্ট্রের চেহারা বাংলাদেশের জনগণ তখন প্রত্যক্ষ করতো।

এখানে বাংলাদেশে ভারতের অবস্থান ও ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমি ভারত রাষ্ট্রের রূপ ও জনগণের অবস্থার বিভিন্ন দিক সামনে আনার চেষ্টা করেছি। আর সেই সঙ্গে বাংলাদেশে ভারত সম্পর্কে মোহ, ভক্তি ও ঘৃণার দৃষ্টিভঙ্গী অতিক্রম করে এদেশে তাদের বৃহৎ পুঁজির সম্প্রসারণের বস্তুগত দিক, এবং এদেশের শাসকশ্রেণীর অবনত অবস্থানের ভাবগত দিক আলোচনায় এনেছি, সামনে এনেছি ভারতের জনগণের জীবন ও লড়াইএর দিকটিও । বলতে চেয়েছি যে, ভারত রাষ্ট্র ও সেখানকার জনগণ এক নয়। দারিদ্র বঞ্চনার কদর্য চেহারা আর প্রাচুর্যের জৌলুস; মুক্ত চিন্তার পাশাপাশি উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী; কাঠামোর সঙ্গে মিশে যাওয়া সন্তুষ্ট মধ্যবিত্তের পাশে বিভিন্ন প্রান্তে অপমানিত বঞ্চিত কোটি মানুষের অদম্য লড়াই; গণতন্ত্রের চর্চার পাশাপাশি নিপীড়নের বর্বরতা ও প্রায় এক তৃতীয়াংশ ভারতে কার্যত সামরিক শাসন ইত্যাদি বৈপরীত্য নিয়েই ভারত। ভারত আসলে একটি নয়, প্রধানত দুটো।

বর্তমান ভারতের রাষ্ট্র সমাজ ক্ষমতা সহিংসতা দখল আগ্রাসন বঞ্চনা মুখোশ ইত্যাদির অসাধারণ বিশ্লেষক, গভীর সংবেদনশীল লেখক অরুন্ধতি রায় যা দেখতে পান ও যা তাঁর ভাষায় তুলে আনতে পারেন তা 'দুই' ভারতকে বোঝার জন্য অবশ্য পাঠ্য। হৃদয় ও যুক্তি, তথ্য ও বিতর্ক সব মিলেছে তাঁর লেখায়। সম্প্রতি অরুন্ধতি এক লেখায় লিখেছেন, 'আমরা সবাই টাটা স্কাই দেখি, আমরা ইন্টারনেটে ঘুরি টাটা ফোটন দিয়ে, আমরা টাটা ট্যাক্সিতে চড়ে ঘুরে বেড়াই, টাটা হোটেলে থাকি, টাটা চা খাই, টাটা স্টীলের চামচ দিয়ে চা নাড়ি, টাটা বইয়ের দোকান থেকে টাটা বই কিনি। *হাম টাটা কা নেমক খাতা হায়!* আমরা দখল হয়ে গেছি।' পাবলো নেরুদার কবিতা 'স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানি' কবিতা তুলে তার সাথে দেখিয়েছেন ভারতের বিশাল সাম্রাজ্যগুলোকে। বলছেন, 'সবকিছুকে ব্যক্তি মালিকানায় নিয়ে আসার কাল ভারতকে বিশ্বের অন্যতম দ্রুত প্রবৃদ্ধিশীল অর্থনীতির একটিতে পরিণত করেছে। যেকোনো পুরনো ধাঁচের উপনিবেশের মতোই ভারতেরও অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক পণ্য এর খনিজ দ্রব্য। ভারতের নতুন সব মেগা কর্পোরেশন যেমন টাটা, জিন্দাল, এসার, রিলায়েন্স, স্টারলিট তারাই যারা নিজের পেশীশক্তি দিয়ে মাটির গভীর থেকে টাকা তুলে আনছে। এটা যেকোন ব্যবসায়ীর জন্য স্বপ্ন পূরণের মতোই, এমন কিছু বিক্রি করতে পারা যা সে কেনে নাই।...ভারতে কোটি কোটি মানুষের জমি দখল করে রাষ্ট্র তা 'জনস্বার্থে' তুলে দিচ্ছে বৃহৎ কর্পোরেশনগুলোর হাতে। ২০ বছরের বিশাল প্রবৃদ্ধির পর ভারতের মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৬০ ভাগ আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেঁচে আছে। শতকরা ৯০ ভাগ শ্রমিক কাজ করছে অসংগঠিত খাতে।' (অরুন্ধতি রায়: ক্যাপিটালিজম এ ঘোস্ট স্টোরি, *আউটলুক*, ২৬ মার্চ ২০১২)

দ্য ইকনমিস্ট পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যায় প্রচ্ছদ কাহিনীর শিরোনাম দেয়া হয়েছে, 'হাউ ইন্ডিয়া ইজ লুজিং ইটস ম্যাজিক' (৩০ মার্চ ২০১২)। এই পত্রিকা বরাবরই পুঁজিবাদী বৃহৎ করপোরেট শক্তি ও বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী দখলদারদের পক্ষে। তাঁদের উদ্বেগ ভারতের জনগণের প্রতিরোধের কারণে ভারতে প্রবৃদ্ধি ম্যাজিক ঠিকমতো হচ্ছে না, সরকার আপোষ করছে 'উন্নয়ন বিরোধী' দের সাথে, তাতে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হচ্ছে। 'উন্নয়ন বিরোধী' কারা? দুদেশেই এর একটি অভিন্ন প্রচার আছে। যারা মানুষের জীবন জীবিকার পক্ষে দাঁড়ায়, যারা ভুল প্রতিশ্রুতিতে নির্মিত বাঁধের জন্য উচ্ছেদ হওয়া কোটি কোটি মানুষের লড়াইএ শামিল, যারা নির্বিচার রাষ্ট্রীয় হত্যাকান্ড, লক্ষ কোটি মানুষ উচ্ছেদ করে 'কর্পোরেট হাব' বানানোর বিরোধী, যারা জনগণের শিক্ষা ও চিকিৎসা অধিকার নিয়ে সোচ্চার তাদেরকেই, বাংলাদেশের মতোই, ভারতেও 'উন্নয়ন বিরোধী' হিসেবে অভিহিত করা হয়। অরুন্ধতি রায় বলেন, 'মণিপুর ও কাশ্মীরে অনেক উঁচু বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে যাতে জেলার পর জেলা ডুবে যাবে। দুটো অঞ্চলই ভয়ংকরভাবে সামরিকীকৃত যেখানে শুধুমাত্র বিদ্যুৎ সমস্যার প্রতিবাদ করবার কারণেই মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হয় (কয়েক সপ্তাহ আগেই কাশ্মীরে এই ঘটনা ঘটেছে)। কী করে তারা বাঁধ ঠেকাবে?' এই মানুষেরাই 'উন্নয়ন বিরোধী' বলে অভিহিত। বাংলাদেশেও। সামরিকীকৃত অঞ্চল না হলেও ২০০৬ সালে রাজশাহীর কানসাটে বিদ্যুতের দাবি করবার অপরাধে ২০ জন মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, ফুলবাড়ীতে জাতীয় সম্পদ রক্ষার দাবি করতে গিয়ে জীবন দিয়েছেন মানুষ সরকারী বাহিনীর হাতে। আর সামরিকীকৃত পার্বত্য চট্টগ্রামে সহিংসতা নিয়মিত ঘটনা।

ভারতের মতো বাংলাদেশও তাই দুটো। ভারতের মতো সবকিছুই বাংলাদেশে কমবেশি আছে। এখানেও দারিদ্র ও বৈষম্যের পাশে অশ্লীল প্রাচুর্যের প্রদর্শনী চলে। দুদেশেই দারিদ্র বিমোচনের নামে সরকার এনজিও নানা মডেল হাজির করে; দারিদ্রের নামে বিপুল অর্থপ্রবাহে ব্যবসায়ী কনসালট্যান্ট এনজিও মালিক আমলাদের সুখ বাড়ে। দারিদ্র কমেছে দেখানোর জন্য পরিসংখ্যানের প্যাচ তৈরি হয়। মানুষের নারকীয় অপমানের জীবন যেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, তবে অরুন্ধতির ভাষায়, 'দারিদ্র অনেক টাকা আনে, আনে দুএকটা নোবেল পুরস্কারও'। গত কয়েকবছরে ভারতে দুই লক্ষেরক ও অধিক কৃষক ঋণগ্রস্ততার জালে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন। সেদেশেও ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে নিজের অবস্থার পরিবর্তন করতে গিয়ে আত্মহত্যার ঘটনা শোনা যায়। অন্ধ্র প্রদেশে এক কিশোরী ক্ষুদ্রঋণের কিস্তি পরিশোধের জন্য স্কুল ফি হিসেবে বহুকষ্টে জোগাড় করা ১৫০ রুপী দিতে বাধ্য হবার পর আত্মহত্যা করে। কেননা স্কুলে আর পড়াশোনা চালানোর কোন উপায় ছিল না। মৃত্যুর সময় সে নোট লিখে যায়: 'পরিশ্রম করে টাকা রোজগার করবে। কখনো ঋণ নিও না।' এসব ঘটনা আমাদের খুবই পরিচিত। যেমন ক্রসফায়ার গুম এনকাউন্টার।

তবে ভারতের সাথে বাংলাদেশের তফাৎ আছে। ভারতের রঙীন চলচ্চিত্র, আইপিএল, টিভি বাক্সে ঐশ্বর্য আর বিজ্ঞাপনের সুখ সেদেশের জনগণকে যেমন নেশাগ্রস্ত রাখে তা সম্প্রসারিত হয় বাংলাদেশেও। ব্যবসায়িক গ্রুপগুলোর জনসংযোগ মাধ্যম হিসেবে তাদের মিডিয়ার অবিরাম সত্যগোপন সত্যবিকৃতি মিথ্যাচার, খলনায়ককে নায়ক হিসেবে উপস্থাপনের আয়োজনের টার্গেট এখন ভারতের জনগণের সাথে সাথে বাংলাদেশের জনগণও। বাংলাদেশের মানুষ ভারতের মতো একইরকম নানাদলে বিভক্ত একটি ছোট্ট গোষ্ঠীর দানবীয় ক্ষমতা শৃঙ্খলে বন্দী। এখানে বাড়তি হল এটাই যে, বাংলাদেশ একইসঙ্গে ভারতের বৃহৎ দানবের হাতের থাবার নীচে। এদেশের শাসক শ্রেণী, বৃহৎ ব্যবসায়ীরা তার নিজের টিকে থাকার জন্য এই থাবাকে 'আদরের হাত' বলে বিবেচনা করে। এক ভারত এক বাংলাদেশের সঙ্গে এখন একাকার, তাদের মধ্যে কোন কাঁটাতার নাই। কিন্তু অন্য ভারত যেখানে আছে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, সেই ভারতের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বাংলাদেশের মধ্যে যোগাযোগ খুবই কম- মাঝখানে দৃশ্যমান অদৃশ্য অনেকরকম কাঁটাতার। দুদেশের সরকার ও মিডিয়া এই দূরত্ব টিকিয়ে রাখতে, আরও বাড়াতে সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে নিয়োজিত।

দুদেশেই এই আমাদের চাওয়া অভিন্ন। আমরা মানুষের জীবনকে কেন্দ্রে রেখে উন্নয়ন বিচার করি, আর তাই প্রকৃতি পানি মাটি রক্ষাও আমাদের কর্তব্য জ্ঞান করি। আমাদের কাছে শিক্ষা চিকিৎসা অধিকার, ব্যবসায়ীর পণ্য নয়। আমরা নদী, পানি, বন ও খনিজ সম্পদকে আমাদের সবার সম্পত্তি মনে করি; এগুলো কোনোভাবে মুনাফাখোরদের হাতে যেতে পারে না। আমাদের কাছে মানুষের মর্যাদা সবার ওপরে, লিঙ্গ বা ধর্ম বা বর্ণ বা ভাষা বা জাতি নয়। আমরা মনে করি, এই বিশ্বে মানুষের জন্য সম্পদের কোন অভাব নেই, কিন্তু লুটেরা দস্যুদের জন্য সেই সম্পদ মানুষের হাতছাড়া অথবা বিপর্যস্ত। তাদের দখল লোভের জন্যই যুদ্ধ সংঘাত নিপীড়ন আর এই রাষ্ট্রব্যবস্থা। এর বিরুদ্ধে মানুষের ভারত ও মানুষের বাংলাদেশের কণ্ঠ অভিন্ন, জীবন ও মরণ অভিন্ন লক্ষ্যে নিয়োজিত। এটা শ্রেণী সংগ্রাম, এটা জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম, এটা অমানুষের বিরুদ্ধে মানুষের মুক্তির অবিরাম লড়াই।

আশা করি পুরো আলোচনা থেকে এবিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে, বাংলাদেশে ভারতের যে আধিপত্য ও আগ্রাসন দেখছি তার শিকার ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষও। কাজেই মানুষের ভারতের সাথে মানুষের বাংলাদেশের ঐক্য ও সংহতি দুপক্ষের জন্যই অপরিহার্য। এছাড়া কোন দানবের হাত থেকেই আমাদের কারও মুক্তি নাই।

বাঙলার পাঠশালা আয়োজিত 'আনু মুহাম্মদ বক্তৃতামালা-৩: বাংলাদেশে ভারত' শীর্ষক বক্তৃতার পরিমার্জিত রূপ। বক্তৃতার অনুলিখন করেছেন মেহেদী হাসান।

৯ ডিসেম্বর ২০১১

সাম্রাজ্যবাদ ও বাংলাদেশ : বিভিন্ন সরকার অভিন্ন ব্যবস্থা

'মুক্তি আন্দোলন' এই কর্মশালার যে উদ্যোগ নিয়েছে সেজন্য তাঁদেরকে ধন্যবাদ। গত চার মাসে যে আলোচনা হয়েছে তা আমার শোনার সৌভাগ্য হয়নি। ইতোমধ্যে কোন কোন বিষয়ে কী কী আলোচনা হয়েছে তা তাই আমার জানা নেই। নিশ্চয়ই এসব আলোচনার মধ্যে বিভিন্ন মত থাকবে, বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা থাকবে। আশা করি এখানে যারা পাঠচক্রে উপস্থিত আছেন তাঁরা এর মধ্য দিয়ে তাঁদের নিজস্ব চিন্তার একটা কাঠামো দাঁড় করাতে সক্ষম হবেন। কারণ মতের এই যে পার্থক্য এবং বিতর্ক সেগুলোকে সামনে নিয়ে আসা দরকার। অনেক বিতর্ক আছে যা প্রয়োজনীয় বিতর্ক। অনেক সময় সেগুলো ধামা চাপা দেয়া হয়। আমাদের দেশে একটা সংস্কৃতি আছে মতের পার্থক্যকে ধামা চাপা দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার। মতের পার্থক্যকে ধামাচাপা দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হলে কী পরিণতি হয় সেটাও আমরা দেখেছি। দেখা যায় এ ধরনের ঐক্য টেকসই হয় না এবং অপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন পার্থক্যের কারণে আবার ভাঙন আসে। এই ধরনের আলোচনা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে তার মধ্য দিয়ে আমাদের মতপার্থক্যের বিষয়গুলো স্পষ্ট হবে এবং একইসঙ্গে অভিন্ন জায়গায় আন্দোলন সংগঠনগত ঐক্য ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করি।

আজকের আলোচনার বিষয় সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ এবং বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এগুলোকে দেখা এবং পরীক্ষা করা। প্রথমে যেটা দরকার সেটা হল সাম্রাজ্যবাদ বলতে আমরা কী বুঝি সে বিষয়টা পরিষ্কার করা। কারণ সাম্রাজ্যবাদ বলতে আমাদের বিভিন্ন জনের বিভিন্ন রকমের ধারণা আছে, বিভিন্নজন হয়তো বিভিন্নভাবে অনুধাবন করেন। একটা গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় বা রেফারেন্স পয়েন্ট হচ্ছে লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত তত্ত্ব, 'সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর' নামের গ্রন্থ এবং সেখান থেকেই রাজনৈতিক কর্মীদের সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে একটা তত্ত্বায়ন তৈরি হয়। বর্তমান সময়েও সাম্রাজ্যবাদকে পুরোপুরি বোঝার জন্য লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ গ্রন্থটা গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চয়ই, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। যথেষ্ট নয় এই কারণে যে, সময়ের পরিবর্তন হয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন হয়েছে, বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে নানা রকম পরিবর্তন এসেছে।

লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ গ্রন্থ প্রকাশের পর কী কী পরিবর্তন হয়েছে?

আমরা অবশ্যই একটা ধারাবাহিকতা দেখতে পাই; লেনিনের সময়কার সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত যে বিশ্লেষণ সেই বিশ্লেষণ এবং বর্তমান সময়ে সাম্রাজ্যবাদের যে স্বরূপ এ দুয়ের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে। একচেটিয়া পুঁজিবাদের (মনোপলি ক্যাপিটালিজম) যে রূপ, কেন্দ্রীভবনের মাত্রা (কনসেন্ট্রেশনের লেভেল), কিংবা লগ্নী পুঁজির (ফিন্যান্স ক্যাপিটালের) যে ভূমিকা, কিংবা বিশ্বব্যাপী তার যে আগ্রাসন বা সম্প্রসারণ, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে ঐক্য এবং সংঘাত এগুলোর যে তত্ত্বায়ন করেছিলেন লেনিন, তার একটা ধারাবাহিকতা আমরা বর্তমান সময় পর্যন্ত দেখি। সেটা এখন পর্যন্ত অটুট আছে। কিন্তু তার সাথে নতুন অনেকগুলো উপাদান যুক্ত হয়েছে। এই নতুন উপাদানগুলো আমাদের আবার গুরুত্বের সাথে খেয়াল করতে হবে। কারণ এগুলো খেয়াল না করলে আমাদের যে বোঝাপড়া বা আন্দোলন বা সংগঠন সেগুলো আমরা যথাযথভাবে করতে পারব না।

লেনিনের *সাম্রাজ্যবাদ* গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৬ সালে। তার মানে এটার উপর কাজ হয়েছিল তারও কয়েক বছর আগে থেকে। ১৯১৬ সালে যখন এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তখন সারা পৃথিবী দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। একটা হল ঔপনিবেশিক শক্তি, যারা প্রধানত ইউরোপভিত্তিক। আর দুয়েকটি দেশ বাদে বাকী বিশ্ব হল উপনিবেশ। এটাই ছিল সে সময়কার চিত্র। সেই উপনিবেশগুলো কার দখলে থাকবে, কে কীভাবে এই সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করবে তা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে যে সংঘাত বা বোঝাপড়া তার মধ্যে দিয়ে বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী একটি রূপ দাঁড়িয়েছে। এদের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে অনেক ধরনের। ল্যাটিন আমেরিকা দখল করা নিয়ে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘাত হয়েছে। এশিয়া আফ্রিকাতে বিভিন্ন দেশ দখল নিয়ে তাদের মধ্যে সংঘাত হয়েছে। এভাবে সংঘাতের মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়েছে।

ইউরোপে পুঁজিবাদের যে বিকাশ ঘটেছে তার সাথে এই উপনিবেশবাদের একটা সরাসরি সম্পর্ক আছে। উপনিবেশবাদ আর পুঁজিবাদের বিকাশ পরস্পর সম্পর্কিত, দ্বান্দ্বিকভাবে ঐক্যবদ্ধ। আমেরিকা যেভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল, যেভাবে দখলকৃত হল, যেভাবে গণহত্যা হল, কিংবা আফ্রিকা যেভাবে দাসে পরিণত হল- একটি মুক্ত মহাদেশ সম্পূর্ণ দাসে পরিণত হল - কিংবা এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল যেভাবে উপনিবেশে পরিণত হল তার সবগুলোই ইউরোপে পুঁজিবাদ বিকাশের একেকটি শক্ত ভিত্তি বা উপাদান হিসেবে কাজ করেছে।

১৯১৬ সালে লেনিনের এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার এক বছরের মাথায় বিশ্বের পুরনো ভারসাম্যের মধ্যে একটি বড় ধরনের পরিবর্তন হয় রুশ বিপ্লবের কারণে। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব হয় এবং তার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ নতুন একটি ব্যবস্থার

উদ্বোধন ঘটে। এরকম ব্যবস্থার জন্য মানুষ আগেও চেষ্টা করেছে। আমরা প্যারি কমিউনের কথা বলতে পারি। এছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষ সাম্য, মৈত্রী এবং সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে। এমনকি বাংলাদেশে, প্রাচীন ভারতের পূর্বাঞ্চলের কিছু কিছু এলাকায় স্বাধীন সমতাভিত্তিক রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছে। রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা হয়েছে। সফল হয় নাই, কিন্তু চেষ্টা হয়েছে। মানুষের অনেক দিনের লড়াইয়েরই ধারাবাহিকতা হল এই রুশ বিপ্লব। এর ভিত্তি অনেক শক্তিশালী ছিল। সাংগঠনিক ভিত্তি শক্তিশালী ছিল। সেখানে রূপকল্পটা (ভিশন) ছিল খুব পরিস্কার। রাশিয়ার এ বিপ্লব পর্যায়ক্রমে অন্যান্য আরো কয়েকটি রাজ্য যুক্ত করে শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন হিসেবে আবির্ভূত হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের এই আবির্ভাব পুরো বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে একটি নতুন মাত্রা তৈরি করে। ১৯২১ সালের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের আবির্ভাব হল। এরপর ৪০ দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে চীন বিপ্লব হল। পূর্ব ইউরোপের অনেক গুলো দেশ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে নিজেদের দাঁড় করানোর চেষ্টা করল। সব মিলিয়ে একটা সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব তৈরি হল। লেনিন তখন ছিলেন না, কিন্তু লেনিনের এই সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক গ্রন্থ লেখার পরে রুশ বিপ্লব, সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্ভব, চীন বিপ্লব মিলে সমাজতান্ত্রিক যে বিপ্লব হল তাতে পুরো বিশ্বের মধ্যেই ক্ষমতার ভারসাম্য নতুনভাবে বিন্যস্ত হল। পাল্টা ব্যবস্থা, পাল্টা দৃষ্টিভঙ্গী, পাল্টা রূপকল্প, পাল্টা সামরিক শক্তি, পাল্টা মতাদর্শিক একটা লড়াই সারা বিশ্বে জোরদার হল। এটা একটা বড় ধরনের পরিবর্তন, লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ গ্রন্থের পরে।

দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আরেকটি বড় ধরনের পরিবর্তন হয়েছে, সেটি হল ঔপনিবেশিক দেশগুলোর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভাব। এরপর থেকে আমরা 'তৃতীয় বিশ্ব' নামে একটা শব্দ শুনতে থাকলাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেকার শব্দ এটি। তৃতীয় বিশ্ব বলে আগে কোন ধারণা ছিল না। কারণ আগে এই দেশগুলো উপনিবেশ ছিল। যারা এক সময় উপনিবেশ ছিল এবং পরে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হল তারাই তৃতীয় বিশ্ব হিসেবে পরিচিতি লাভ করল। তৃতীয় বিশ্বের এই দেশগুলো কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে - সমাজতান্ত্রিক না পুঁজিবাদী-তা নিয়ে বিশ্বব্যাপী একটা লড়াই ছিল। অনেকগুলো দেশে স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম একাকার ছিল। আবার অনেকগুলো দেশ স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়েই সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করল এবং নয়া উপনিবেশের মর্যাদা (স্ট্যাটাস) পেল।

তৃতীয়ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আরেকটি বড় ঘটনা হচ্ছে কতিপয় বিশ্বসংস্থার আবির্ভাব। বৈশ্বিক অর্থনীতি ও বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পরিচালনার

জন্য কয়েকটা প্রতিষ্ঠান তৈরি হল সে সময়। একটা হল বিশ্বব্যাংক, আরেকটি আইএমএফ। এ সংস্থাগুলো গঠিত হয় যে বৈঠকে সেখানেই একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংগঠন (ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অর্গানাইজেশন) করার প্রস্তাব ছিল। কিন্তু ততদিনে আরেকটি বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে যায়। সেন্টার অব পাওয়ার-মানে বিশ্ব পুঁজিবাদের কেন্দ্র ততদিনে ইউরোপ, বিশেষ করে যুক্তরাজ্য, থেকে যুক্তরাষ্ট্রে চলে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এটা নিশ্চিত হয়েছে। সেকারণেই এই কনফারেন্সটা হল যুক্তরাষ্ট্রে এবং যুক্তরাষ্ট্রই নির্ধারণ করল কী কী সিদ্ধান্ত হবে। এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলো হল যুক্তরাষ্ট্রকেন্দ্রিক।

এই বিশ্বসংস্থাগুলো ক্রমে পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এগুলোর অস্তিত্ব ও ভূমিকা লেনিন পরবর্তী সাম্রাজ্যবাদ বোঝার জন্য অপরিহার্য। এসব সংস্থার মধ্য দিয়েই আপাতঃ স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো একটি নতুন ঔপনিবেশিক কাঠামোয় সম্পর্কিত হল পুঁজিবাদী কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে। বল প্রয়োগের মাধ্যমে নয়, সামরিক বাহিনী দিয়ে নয় বরং একটা সম্মতির ভিত্তিতে, চুক্তির ভিত্তিতে তারা এসব দেশের সাথে যোগ দিল। বিশ্বব্যাংক আইএমএফের যেসব নীতিকাঠামো দিয়ে চলে বাংলাদেশ, সেগুলোর মধ্য দিয়েই 'স্বাধীনভাবে' এই দেশ সাম্রাজ্যবাদী শৃংখলে আটকে যায়।

এই সংস্থাগুলোর সহযোগী হিসেবে কিছু কিছু আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান আছে। যেমন ল্যাটিন আমেরিকায় আছে ইন্টার আমেরিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক। এশিয়াতে আছে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক। আফ্রিকায় আছে আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক। এই প্রতিষ্ঠানগুলোও বিশ্বব্যাংক আইএমএফের সাথে নানাভাবে সম্পর্কিত। আর যুক্তরাষ্ট্র সবগুলো প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই আছে কোন না কোনভাবে। কোথাও উপদেষ্টা হিসেবে, কোথাও পর্যবেক্ষক হিসেবে। সবজায়গায় সে কোন না কোনভাবে সক্রিয়। কারণ যুক্তরাষ্ট্রকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে যে, এটি হচ্ছে কেন্দ্রীয় শক্তি। সুতরাং সবগুলোর মধ্যে যদি কেন্দ্রীয় শক্তি না থাকে তবে বাস্ত বায়নে সমস্যা হবে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র সবকিছুর মধ্যে থাকবে।

জন্মলগ্ন থেকেই বিশ্বব্যাংক এমনভাবে দাঁড় করানো হল যাতে এটা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয়ের সরাসরি অধীনে থাকে। সেই হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই এর নীতিমালা নির্ধারিত হয়। তাছাড়া বিধি অনুযায়ী, বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টকে অবশ্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হতে হয়। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ছাড়া কেউ বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট হতে পারেন না। তখনকার এই সিদ্ধান্ত এখন পর্যন্ত বলবত রয়েছে। আইএমএফের ব্যাবস্থাপনা পরিচালককে অবশ্যই ইউরোপ থেকে হতে হবে। এশিয়া কিংবা ল্যাটিন আমেরিকার কোন জায়গা নেই এখানে। সুতরাং এসব নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এবং

ইউরোপের মধ্যে একটা ভাগাভাগি হয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্র তার মধ্যে লিডিং পজিশনে আছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর যে ভূমিকা এবং তাদের যে কেন্দ্রীয় অবস্থান এটা বর্তমান সময়ের যে পুঁজিবাদী নীতি, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির উন্নয়ন নামে যে সম্প্রসারণ, সেই প্রক্রিয়ার একটি কেন্দ্রীয় প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা তারা পালন করে। বর্তমান সময়েও সাম্রাজ্যবাদী বা পুঁজিবাদী আগ্রাসনের ক্ষেত্রে সামরিক শক্তি একটা ভূমিকা পালন করে। কিন্তু তার বাইরেও সম্মতি, নীতি - মানে পলিসি এবং বিভিন্ন ধরনের চুক্তি এগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যে কাজটা আগে বল প্রয়োগের মধ্য দিয়ে করা হত– সেই একই কাজ এখন চুক্তি, সম্মতি বা ঐ দেশেরই নির্বাচিত সরকার বা কাঠামোর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। সাম্রাজ্যবাদ বলতে যে সামরিক আগ্রাসনের কথা মনে হয় সেটি ছাড়াই সাম্রাজ্যবাদ অনেকক্ষেত্রে তার ভূমিকা পালন করতে পারে। পুঁজির আগ্রাসন, সম্প্রসারণ সেটিও তারা করতে পারে এর মাধ্যমে।

এই যে পার্থক্যগুলো এটি লেনিনের সময়ের পরেকার। সুতরাং এখনকার সাম্রাজ্যবাদ আলোচনা, অনুধাবন এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে অবশ্যই এই পরিবর্তনগুলো বিবেচনায় রেখে করতে হবে। ১৯৯০ সালের পর আরেকটি বড় পরিবর্তন হল- ১৯১৭ সালে যে রুশ বিপ্লব হল, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হল সোভিয়েত রাশিয়ার মাধ্যমে, তার পতন ঘটল। এবং কয়েকটা দেশ ছাড়া বা কোথাও কোথাও ছোট কিছু বাধা ছাড়া বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর পতন ঘটল। এবং এর মধ্য দিয়ে এই প্রথমবারের মতো বিশ্বে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আক্ষরিকভাবে বৈশ্বিক একটা রূপ লাভ করল। কারণ বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদ তার নিজের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারেনি এর আগে, যেটা ১৯৯০ এর পরে করতে পারল। ১৯৯০ এর পরে একচ্ছত্র আধিপত্যের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থাটা দাঁড় করায়। আগ্রাসনও বাড়ে। সে কারণে ১৯৯০ এর পরে আমরা নতুন করে কিছু প্রতিরোধ দেখি যে ধরনটা আগে ছিল না।

এখন সামনে কোন মডেল নাই

রুশ বিপ্লবের আগে লেনিন এবং রুশ বিপ্লবীদের সামনে কোন মডেল ছিল না। বিপ্লবোত্তর সমাজ বা সমাজতন্ত্র কীভাবে গঠন করতে হবে সে বিষয়ে পরিষ্কার বা স্বচ্ছ কোন ধারণা বা মডেল তখন ছিল না। তাদের সামনে একটা দার্শনিক তত্ত্ব ছিল, একটা রূপকল্প ছিল। আপনারা খেয়াল করলে দেখবেন ১৯১৭ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বহু ধরনের পরিবর্তন হয়েছে সে ব্যবস্থার মধ্যে। একই নীতি বা একই চিন্তা নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন অগ্রসর হয়নি। বহুধরনের পরিবর্তন হয়েছে। এমনকি লেনিন জীবিত থাকা অবস্থায়ই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। তাদের সামনে যে অস্বচ্ছতা ছিল তার অনেক কিছু এখন নেই।

এর সমস্যা, সংকট যেমন, সাফল্যের দিকগুলোও তেমনি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু একটা শূণ্যতারও মুখোমুখি হতে হচ্ছে আমাদের। সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব যখন উপস্থিত ছিল তখন মানুষের সামনে একটি চিত্র ছিল। বিপ্লবীরা যে বিষয়টা নিয়ে তাদের সামনে জমায়েত হতেন বা একটা স্বপ্ন নিয়ে লড়াই করতেন তখন, সমাজতন্ত্র বললেই মানুষ সেই স্বপ্ন দেখতে পেতেন। সমাজতন্ত্র বললেই একটা পরিষ্কার চিত্র দেখানো যেত। তখন সামনে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, আফ্রিকা ও পূর্ব-ইউরোপের অভিজ্ঞতা। এখন তা নেই।

সেকারণে অনেকগুলো বিষয় সুনির্দিষ্টকরণের প্রয়োজন আছে। আগেরকার যে অভিজ্ঞতাগুলো তা থেকে শিক্ষা নেয়ার ব্যাপার আছে। সেগুলো পর্যালোচনার দরকার আছে। আমরা সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ বা একটা মুক্ত সমাজ বলতে কী বুঝি সেটা পরিষ্কার করা দরকার আছে। এটা বললেই হবে না যে আমরা সমাজতন্ত্র চাই। মানুষ তা শুনতে চাইবে না। সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন পতন ঘটল, চীন কেন তার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থানের পরিবর্তন করল, এখন আমরা তার (সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন মডেলের) চেয়ে অধিকতর কী শক্তি, কাঠামো বা মতাদর্শ নিয়ে দাঁড়াতে চাই এটা পরিষ্কার বলতে হবে। যেকারণে এখন বিশ্বে এটা নিয়ে অনেক তাত্ত্বিক আলোচনা চলছে, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ চলছে। আমার নিজের যে ধারণা বা আমি নিজে যেভাবে দেখি তাহলো বর্তমানে বিশ্বব্যাপী একটা খুবই ক্রিয়েটিভ বা সৃজনশীল সময় যাচ্ছে - যারা এই বর্তমানকে পরিবর্তন করতে চায় তাদের জন্য। যারা ভেসে যেতে চায় তাদের জন্য নয়।

যারা পরিবর্তন করতে চায় এবং দায়িত্ব বোধ করে তাদের জন্য এটা খুবই ক্রিয়েটিভ বা সৃজনশীল সময়। তাই পুরো জিনিসটা বোঝার জন্য তাকে অনেক চিন্তাভাবনা, মেধা এবং মনন প্রয়োগ করতে হবে। এবং নিজেদের বিকল্প ব্যবস্থা এবং সাংগঠনিক কাঠামো এবং রূপকল্প বা ভিশনকে মানুষের সামনে আনার জন্য যোগ্যতা ও দক্ষতা নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। একটা বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে আমরা বাংলাদেশে আছি। বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অবস্থানটা কি? বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সাম্রাজ্যবাদকে কীভাবে পাচ্ছি বা সাম্রাজ্যবাদ এখানে কীভাবে উপস্থিত কিংবা আধিপত্যবাদের কোন ধরনের আগ্রাসন বা টানাপোড়েন আছে কিনা তা আলোচনা দরকার।

সংখ্যাগরিষ্ঠ বিশ্ব: রাষ্ট্র আছে রাষ্ট্র নাই

'তৃতীয় বিশ্ব' বলতে বিশ্বের যে অংশকে বোঝায় তাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিশ্ব বলাই ঠিক। আমরা তৃতীয় বিশ্ব না বলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দেশও বলতে পারি। কারণ অধিকাংশ মানুষ এসব দেশেই বসবাস করে, আফ্রিকায়, ল্যাটিন আমেরিকায়,

এশিয়ায়। এসব দেশ নিজের একটা শক্তিশালি অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরি করতে পারে নাই। যেসমস্ত দেশ এক সময় উপনিবেশ ছিল, তার অনেকগুলো দেশে জাতীয় অর্থনীতি বলতে যা বোঝায়, সার্বভৌমত্ব বলতে যা বোঝায় সেটা অনুপস্থিত। যেখানে রাষ্ট্র কীভাবে কাজ করে সেটাও একটা পর্যালোচনার বিষয়। লেনিনের দৃষ্টিতে বা মার্কসীয় দৃষ্টিতে আমরা যখন রাষ্ট্র বলি সেটা একটা সার্বভৌম শক্তির নাম। 'শ্রেণী দ্বন্দ্বের অমীমাংসেয়তার ফল', 'শ্রেণী নিপীড়নের হাতিয়ার' এইসব কিছুই আমরা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মধ্যে পাই। কিন্তু যেটা পাই না, সেটা হল রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব। কিন্তু নিপীড়নের যন্ত্র হিসেবে রাষ্ট্রকে যথেষ্ট সক্রিয়ভাবে পাই।

তাহলে রাষ্ট্র বলতে মার্কস লেনিন যে রাষ্ট্রকে বুঝিয়েছেন বাংলাদেশ পুরোপুরি সেই রাষ্ট্র না। বাংলাদেশ একই সঙ্গে নিপীড়নের যন্ত্র, আবার অধস্তন- আরেকটা বৃহৎ রাষ্ট্রের বা পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার কাছে। সে নিজে নিজের নীতি বা পলিসি নির্ধারণ করে না। এই রাষ্ট্রের নির্বাচিত সংস্থা জানেনা যে, সে কী নীতি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। পানি মন্ত্রণালয় জানেনা যে পানি নীতি কীভাবে প্রণীত হচ্ছে। পানি নীতি প্রণয়নে পানি মন্ত্রণালয়ের কোন ভূমিকা নেই। জ্বালানী মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা হচ্ছে বিদেশী যেসব কোম্পানী এখানে কাজ করতে চায় তারা কী কী চায় সেটা ভালোভাবে বুঝে তাদের (বিদেশী কোম্পানীর) স্বার্থ অনুযায়ী কাজ করা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় খোঁজে যে বিশ্বব্যাংক বা এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক কী চিন্তা ভাবনা করছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় খোঁজে তাদের (বিশ্ব ব্যাংক ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক-এর) কী কী প্রকল্প আছে। তারপর যে নির্বাচিত সংস্থা, (সংসদের) তার নিজের থেকেও কোন স্বাধীন চিন্তা নেই। যাকে বলে "নিজের মাজার জোর" সেটাও নেই। এবং সে মনে করে না যে জোর থাকাটা সম্ভব।

শাসকগোষ্ঠী মনে করে তাদের যদি ক্ষমতায় থাকতে হয়, বস্তুগতভাবে যদি লাভবান হতে হয় এবং নিজের নিরাপত্তা যদি নিশ্চিত করতে হয় তাহলে তাকে বৃহত্তর একটি কাঠামোর অধস্তন বা সাবঅর্ডিনেট হিসেবে কিংবা বাস্তবায়নকারী সংস্থা (ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্সি) হিসেবে কাজ করতে হবে। সুতরাং এখানে উপলব্ধিতে আনা দরকার যে, এই রাষ্ট্র অবিকল সেই (মার্কস ও লেনিনের ভাবনার) রাষ্ট্র না। সমাজের বৃহৎ মালিকদের প্রতিনিধিত্বসহ রাষ্ট্রের কিছু উপাদান সেখান থেকে পাই ঠিক, কিন্তু কিছু বাড়তি বৈশিষ্টও আছে যেটা মনোযোগের সাথে খেয়াল করতে হবে। বিষয়টা শুধু আলাদাভাবে বাংলাদেশের জন্য সত্য এরকম না। সারা পৃথিবীতে বহু রাষ্ট্রের এই ধরন তৈরি হয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থানের কারণে আবার একটি বাড়তি উপাদান আছে, সেটা হল- ভারত। ভারত এই দেশকে ঘিরে রয়েছে। সারা পৃথিবীতে যুক্তরাষ্ট্রের যে অবস্থান, দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের অবস্থান সেরকম। যুক্তরাষ্ট্র তার

নিজের জন্য সারা পৃথিবীতে যে অবস্থান তৈরি করেছে ভারতের অবস্থান হচ্ছে তাই। ভারতকে আমাদের দেশের কেউ কেউ সাম্রাজ্যবাদী দেশ বলেন। কেউ কেউ আধিপত্যবাদী বলেন। কেউ কেউ সম্প্রসারণবাদী বলেন। ভারতের ক্ষেত্রে কোন পরিচয়ের (টার্মটা) ব্যবহার সঠিক হবে সেটি সুনির্দিষ্টভাবে নিশ্চিত হবার জন্য ভারত কি করছে, ভারত কীভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথে, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত এবং দক্ষিণ এশিয়ায় তার ভূমিকাটা কি সেটা বোঝা দরকার।

ভারতকে ঠিকমতো বুঝতে হলে ভারতের শ্রেণী গঠন (ক্লাস কম্পোজিশন), ভারত কীভাবে বেড়ে উঠল, ভারতে কীভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান (বিজনেস হাউজ), শিল্প (ইন্ডাস্ট্রি) গড়ে উঠল, বিশ্বপুঁজির সাথে কীভাবে সে সম্পর্কিত এগুলোকে বোঝা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে সেন্টার ফর সাউথ এশিয়া, সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ আছে। ইউরোপে সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ আছে। বাংলাদেশের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হল সেন্টার ফর ইন্ডিয়া স্টাডিজ খোলা। মানে ভারতকে বোঝার জন্য আলাদা অধ্যয়ন কেন্দ্র করা দরকার এবং তার উপর বিশেষভাবে মনোযোগ দেয়া দরকার। যেমন, ভারত কোন দিকে যাচ্ছে, ভারতের মধ্যকার শাসক শ্রেণী কোন দিকে যাচ্ছে, ভারতের মধ্যে যে লড়াই সে লড়াইয়ের ধরনটা কেমন হচ্ছে, এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সে দ্বন্দ্বটা কী ধরনের; বাংলাদেশের মতো দেশের ভবিষ্যত বোঝার জন্য ভারতের এই বিষয়গুলো বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর ওপর বাংলাদেশের অনেক কিছু নির্ভর করে।

নতুন বাংলাদেশের পুরনো মডেল

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে, ১৯৭২ সালে ভিন্ন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার পরে এখানে বিপুল সম্ভাবনা ও প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল। বাংলাদেশের অবস্থা তখন এমন ছিল যে, বাংলাদেশের মানুষ নিজেদের গায় গতরে খেটে, বিনা অর্থে যে কোন ধরনের কাজ করার জন্য প্রস্তুত ছিল। সেই সময়ে স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের যদি বলা হত তোমাদের গ্রামে গ্রামে গিয়ে নিরক্ষরতা দূর করতে হবে, কিংবা বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় কেন্দ্র তৈরি করতে হবে, গাছ লাগাতে হবে; যে কোন ধরনের স্বেচ্ছাশ্রমের জন্য সে সময় লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ে পাওয়া যেত।

যেমন ১৯৫৯ এর বিপ্লবের পর জানুয়ারি মাসেই কিউবা ঘোষণা করল যে, আমরা নিরক্ষরতা দূর করব। সেখানে ব্রিগেড তৈরি হল। লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ে সে ব্রিগেডে যোগ দিল। সারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তারা ছড়িয়ে পড়ল। তাদের টার্গেট দেয়া ছিল ডিসেম্বরের মধ্যে সবাইকে অবশ্যই লিখতে এবং পড়তে পারতে হবে, এবং এটা সম্ভব। একজন মানুষকে লিখতে পড়তে শেখানোর জন্য এক বছর

অনেক সময়। যদি সম্মিলিত প্রচেষ্টা নেয়া হয় এবং এর পক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলা যায় তবে খুবই সম্ভব। ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে তারা প্রথম পর্বের কাজ শেষ করল। সফল ভাবে প্রথম পর্ব শেষ করার পর তারা পুনরায় শিক্ষা ক্যাম্পেইন শুরু করল। এখানে টাকা পয়সার ব্যাপার নেই। রাজনৈতিক রূপকল্প (ভিশন) এবং সমাবেশকরণের (মবিলাইজেশনের) মধ্য দিয়ে এটা সম্ভব।

বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে প্রত্যাশার স্তরটা এরকমভাবে তৈরি হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেটা কাজ করে নাই। কারণ যারা ক্ষমতায় ছিলেন, রাজনৈতিক দলে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে এই রূপকল্পটা (ভিশনটা) ছিল না। তাদের তখন মনোযোগ ছিল কিভাবে তাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠা করা যায়, ধন উপার্জন করা যায় সেদিকে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যেও ১৯৭৩-৭৪ সালে একটা পরিবর্তন ঘটে যায়। যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধী ছিল ও পাকিস্তানের পক্ষে ছিল। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক কী হবে? আবার, যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগী হিসেবে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধী ছিল। তাদের সাথেও এ রাষ্ট্রের সম্পর্ক কী হবে সেটা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল।

প্রাথমিক পর্যায়ে বিশ্বব্যাংক বিরোধী একটা অংশ ছিল এই দেশের শাসক শ্রেণীর মধ্যে। যেমন তাজউদ্দীন আহমেদসহ আরো অনেকে বিশ্বব্যাংকের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ছিলেন। সেই সময়ে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ছিলেন রবার্ট ম্যাকনামারা। বিশ্বব্যাংক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত, কিন্তু আপনারা লক্ষ্য করবেন, বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট অনেকেই কোন না কোনভাবে প্রতিরক্ষা কিংবা যুদ্ধের সাথে যুক্ত ছিলেন। রবার্ট ম্যাকনামারা ভিয়েতনাম যুদ্ধের সাথে যুক্ত ছিলেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সচিব ছিলেন। ১৯৭৩ সালে তিনি বললেন, বিশ্বব্যাংক এখন দারিদ্র্য বিমোচন করতে চায়। তিনি বললেন, সারা পৃথিবীতে দারিদ্র্য বেড়ে যাচ্ছে এতে তারা খুবই দু:খিত। সুতরাং এখন প্রধান মিশন হল দারিদ্র্য বিমোচন করা। এই যে ১৯৭৩ সাল থেকে শুরু হল দারিদ্র্য বিমোচন-এর আর শেষ নেই। ইরাক যুদ্ধের সাথে জড়িত উলফভিচকেও বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট করা হল, কিন্তু তাকে নিয়ে এত প্রতিবাদ উঠল যে তাকে শেষ পর্যন্ত সরিয়ে দেয়া হল।

রবার্ট ম্যাকনামারা ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে এসেছিলেন। বাংলাদেশী নীতিনির্ধারকদের সাথে তার প্রথম সভা তার জন্য খুবই অবমাননাকর ছিল। বিশ্বব্যাংকের প্রতি এখনকার কর্মকর্তাদের এতই নতজানু অবস্থা যে সেই ঘটনাটা স্মরণ করলে এখন একটা ভালো অনুভূতি হয়। সভায় রবার্ট ম্যাকনামারা বললেন, 'আমরা এখন যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ বাংলাদেশকে সাহায্য করতে চাই। তোমাদের কী কী দরকার, কী লাগবে তোমরা বল।' তৎকালীন অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন তখন

বললেন, 'আমাদের যুদ্ধে অনেক ক্ষতি হয়েছে। একমাত্র যে সাহায্য তোমরা করতে পারো সেটা হল গরু। আমাদের অনেক গবাদী পশু নষ্ট হয়েছে। কৃষকদের অনেক গরু দরকার হালচাষের জন্য। তোমরা যদি কিছু গরু সাপ্লাই দিতে পারো তাহলে খুব ভালো হয়।' সেই সভা থেকে ম্যাকনামারা সিগনাল পেলেন যে তাদের জন্য পরিবেশটা অনুকূল নয়।

বিশ্বব্যাংক যেখানেই যায় তারা প্রথমে গিয়ে খুব প্রশংসা করে পিঠে হাত বুলানোর মত। আপনারা খুব ভালো করছেন, খুব ভালো হচ্ছে তবে আরেকটু কাজ করতে হবে, আরেকটু পুনর্গঠন (রিফর্ম) করতে হবে, এই করতে হবে, সেই করতে হবে এভাবেই অগ্রসর হয়। ১৯৭৩ সালে আমাদের প্রথম যে পরিকল্পনা হয়- প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা- সেটাকে পরিকল্পনা কমিশন ও সরকার 'সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা' বলে আখ্যায়িত করল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, সেসময় বিশ্বব্যাংকের যে নথিপত্র প্রকাশিত হয় তাতে এই পরিকল্পনার উচ্ছসিত প্রশংসা করা হয়। খুবই ভালো পরিকল্পনা, খুবই ভালো একটা কাজ হয়েছে এসব বলে তারা। তারপরই বলল তাদের আসল কথা- কিন্তু কিছু রিফর্ম দরকার।

১৯৭৩ সালের মধ্যেই পুরো চিত্রটা পাল্টে যায়। শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, সবাই আমাদের বন্ধু। আমরা সবার কাছ থেকে সাহায্য নেব। সবাই আমাদের বন্ধু মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও আমাদের বন্ধু! তার কাছ থেকেও সাহায্য নেয়া যাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সাহায্য নেয়া মানে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ তাদেরকেও আনতে হবে। বাংলাদেশকে তাদের সদস্য হতে হবে। আর সদস্য হওয়া মানে তাদের সাথে একের পর এক চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। ১৯৭৩ এর মধ্যেই এসব শুরু হয়ে গেল। পাকিস্তান আমলে এই অঞ্চলে কৃষি ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের যে স্টাডি ছিল সেটি তারা এখানে কার্যকর করল। তথাকথিত সমাজতন্ত্রের বাগাড়ম্বরের (রেটরিকের) মধ্যে খুব কার্যকরভাবে পাকিস্তান আমলে বিশ্বব্যাংকের কৃষি উন্নয়নের মডেল অন্তর্ভুক্ত হলো আইএমএফের যে সংস্কার নীতি ক্রমে অর্থনীতির মূল নীতিকাঠামোর মধ্যে ঠাঁই করে নিল।

১৯৭৪ সালে আমাদের মুদ্রার মান কমতে থাকে। ১৯৭৪ সালে একবার কমানো হল। ১৯৭৫ সালে মুদ্রার মানে চরম ধ্বস নামল। অনেক পাঁচশ টাকার নোট অকার্যকর হয়ে যায়। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা সব ক্ষেত্রে আস্তে আস্তে বিশ্বব্যাংক আইএমএফ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক জায়গা পেয়ে যায়। বিনিয়োগের সিলিংও বাড়তে থাকল। প্রথমে ১০ লাখ, তারপর ২০ লাখ এবং ১৯৭৫ এর মে মাসের মধ্যে তিন কোটি হয়ে গেল। কৃষি ক্ষেত্রে কার্যত কোন পুনর্গঠন হলনা। ১৯৭২ সালে যে ভূমি সংস্কার করা হয় সেটি আসলে ১৯৫০ এর সংস্কারটিকে আবার নতুন করে বহাল করা। তিন বছরের মাথায় আবার আমরা সামরিক শাসনের মধ্যে প্রবেশ করলাম,

১৯৭৫ সালে। তার মানে পাকিস্তানের যে সামরিক শাসনের অভিজ্ঞতা তা আমাদের এখানে আবারও শুরু হল। প্রথমে জিয়া, পরে এরশাদ। সামরিক শাসনের সময়, বিশেষত আশির দশকে এরশাদের সময়ে, বাংলাদেশের গতিমুখ যা নির্ধারিত হল সে অনুযায়ীই এখন বাংলাদেশ চলছে।

৭০ দশকে অন্যান্য দেশে

৭০ দশকের প্রথম দিকে চিলিতে নির্বাচনের মাধ্যমে বিপ্লব করবার চেষ্টা দেখা গেল। নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের দায়িত্ব পেলেন কমিউনিস্ট পার্টির ড. সালভেদর আলেন্দে। তার সাথে অন্যরাও ছিলেন। প্রসঙ্গত বলি, ১১ সেপ্টেম্বর তারিখটা মনে রাখবেন, এবং বারবার অন্যদের বলবেন। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের কথা বারবার বলা হয়, আর ১৯৭৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের কথা ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এই দিনেই অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ এবং পিনোশেটের নেতৃত্বাধীন চিলির সামরিক বাহিনী চিলির প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের ওপর বোমাবর্ষণ করে একজন নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে উৎখাত করে। পিনোশেটের সেনাবাহিনী যখন প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ ঘেরাও করে ফেলে এবং বোমাবর্ষণ করতে থাকে, তখন আলেন্দে তাঁর বাহিনী নিয়ে যথাসম্ভব প্রতিরোধ করতে থাকেন। একপর্যায়ে ধরা পড়ার আগ মুহূর্তে, রেডিওতে একটি ভাষণ দিয়ে আলেন্দে আত্মহত্যা করেন।

তারপর চিলিতে যা হয়েছিল সেটা একটা ভয়ঙ্কর পর্ব, একটা নারকীয় পর্ব। লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্যাতন করা হয় বছরের পর বছর ধরে। অসংখ্য নারী পুরুষ তরুণদের হত্যা করা হয়, নয়তো অকথ্য নির্যাতন করা হয়। অনেকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। কয়েকবছর আগের ইন্দোনেশিয়ারও একই অভিজ্ঞতা আছে। সুকার্ণোর সময় এটা হয়েছিল। গণতান্ত্রিক বা প্রগতিশীল পরিচয়ের সবাইকে হত্যা করা হয়। এদের সংখ্যা প্রায় ১০ লাখ হবে। বহুদিন ধরে সিআইএ তাদের তালিকা তৈরি করেছিলো।

এই সত্তরের দশকেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বের মানুষকে উদ্দীপ্ত করবার মতো লড়াই হয় ভিয়েতনামে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রভাব, তার ছাপ বাংলাদেশেও এসে লাগে। বিশ্বব্যাপী মানুষের স্বপ্ন তৈরির ক্ষেত্রে ভিয়েতনাম যুদ্ধ একটা বড় ধরনের ভূমিকা পালন করেছে। সেই ভিয়েতনাম যুদ্ধ শেষ হয় ১৯৭৫ সালে, দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিজয়ের মাধ্যমে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দানবীয় শক্তি-যার সাথে পাল্লা দেয়ার মতো কোন শক্তি তখন ছিল না, তার সাথে লড়াই করল লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা অপুষ্টিতে ভোগে। শিশু কিশোররা পর্যন্ত এই লড়াইয়ে অংশ নিল। এবং তারা বিজয় অর্জন করল। নাকানিচুবানি খেয়ে, অপমানিত হয়ে মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম ত্যাগ করল। এই অপমান তাদের জন্য হজম করা খুব কঠিন ছিল।

৮০ দশক: নতুন ধনিক শ্রেণী

আশির দশক পৃথিবীর বহু দেশে বহুভাবে একটি প্রতিক্রিয়ার দশক। বাংলাদেশে জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসন, পাকিস্তানে জেনারেল জিয়াউল হক। আশির দশক হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের রেগানের সময়। সারা দুনিয়ায় মার্কিন আগ্রাসনমূলক তৎপরতা তখন অনেক বৃদ্ধি পায়। যুক্তরাজ্যে ছিল মার্গারেট থ্যাচার। সেই সময় নিওলিবারেল ইকনমিক পলিসি- মানে সবকিছু বাজারের জন্য, মুনাফার জন্য ছেড়ে দিতে হবে; সবকিছু হচ্ছে পুঁজির জন্য, বাজার ছাড়া কর্পোরেট জগত ছাড়া আর সবকিছু অর্থহীন- এই অর্থনৈতিক নীতি এবং দর্শন বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করে।

৮০ দশকে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম নিয়ে সক্রিয় হয়ে উঠে। এর অধীনে বাংলাদেশে জাতীয় প্রতিষ্ঠান, গণ পণ্য (পাবলিক গুডস) গুলোকে পাইকারিভাবে বাজার পণ্য ও ব্যক্তি মালিকানাধীন করার তৎপরতা শুরু হয়। ব্যক্তি মালিকানাধীন পুঁজির (প্রাইভেট ক্যাপিটালের) বিকাশের জন্য, দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্র বিদেশি কোম্পানির হাত তুলে দেবার রাস্তা তৈরির জন্য বিভিন্ন নীতি ও প্রতিষ্ঠান শুরু হয় আশির দশকেই। রাষ্ট্রীয় খাতের বৃহৎ শিল্প ক্রমান্বয়ে সংকট জর্জরিত হতে থাকে, আমদানিমুখি হয়ে পড়ে অর্থনীতি, বিশিল্পায়ন দেখা যায়। এসব নীতির কল্যাণে দুর্নীতি ও চোরাই টাকার ব্যাপক বিস্তার ঘটে। ব্যাংকঋণ লোপাটকারীরা আশির দশকে নতুন ধনিক শ্রেণীর ভিত্তি তৈরি করে। এই দশকেই আবার ল্যাটিন আমেরিকার কোন কোন দেশে আমরা দেখি পাল্টা প্রতিরোধ। ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া, পেরুতে অভ্যুত্থান শুরু হয়। এই দেশগুলোতে পাল্টা আরেকটা লড়াইও শুরু হয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। আশির দশকে যেমন সাম্রাজ্যবাদীরা আগ্রাসী ছিল, তেমনি তার বিরুদ্ধে পাল্টা আরেকটা লড়াইও শুরু হয়।

ভারত ও পাকিস্তানের ভিন্ন যাত্রা

ভারতে আশির দশক পর্যন্ত পাবলিক সেক্টর খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের অবস্থান বুঝতে গেলে আরও আগের কিছু বিষয় এখানে আনতে হবে। ভারত এবং পাকিস্তান একই সাথে স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু দুই দেশের যাত্রাপথ শুরু থেকেই ছিল ভিন্ন। পাকিস্তান জন্মলগ্ন থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বশ্যরাষ্ট্র হিসেবে নিজের অবস্থান তৈরি করে। কার্যত যুক্তরাষ্ট্রের পকেটের একটি রাষ্ট্র ছিল পাকিস্তান, আর সেই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল নতুনভাবে

আবির্ভূত সাম্রাজ্যবাদী কেন্দ্র শক্তি। পাকিস্তান, তুরস্ক এবং শাহেন শাহর ইরান নিয়ে একটি আঞ্চলিক ব্লক তৈরি হল। তাদের প্রধান কাজ ছিল, যে কোন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রতিহত করতে ভূমিকা পালন করা। পাকিস্তানে স্বাধীন উন্নয়ন নীতি, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং গণতন্ত্র দাঁড়াতে না পারার প্রধান কারণ তারা যুক্তরাষ্ট্রের হাতিয়ার হিসেবে নিজেদের ব্যবহার করতে দিয়েছে। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই সামরিক শাসন এবং সামরিক শাসনের মাধ্যমে যেখানে যাওয়ার পাকিস্তান সেদিকেই অগ্রসর হয়।

পাকিস্তানে দুটো সামরিক শাসন পর্ব বিশেষভাবে খেয়াল করবেন। একটা হল ১৯৮০ এর দশকে জিয়াউল হকের আরেকটা হল ১৯৯৯ সালে পারভেজ মোশাররফের নেতৃত্বে সামরিক শাসন। এই দু'জন সামরিক শাসকের পাকিস্তানের ক্ষমতা দখলের সাথে আফগানিস্তানে মার্কিনী আগ্রাসনের প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে। আফগানিস্তান এবং মধ্য এশিয়াকে লক্ষ্য করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জিয়াউল হককে সামনে আনে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ সমর্থন নিয়ে এই সামরিক শাসক নিজ দেশে কট্টর ইসলামপন্থীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, সবরকমভাবে শক্তিশালী করে তাদের। পাকিস্তানে ভয়ঙ্কর নিপীড়নমূলক আইন ও বিধিব্যবস্থা চালু হল।

সেসময় মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ'র প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও অর্থায়নে আইএসআই এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনী মুজাহিদীনদের ট্রেনিং দিয়ে আফগানিস্তানে পাঠানোর কাজ করতে লাগল। মুজাহেদিন নেতাদের হোয়াইট হাউজে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে, আমেরিকার পূর্বপুরুষদের উত্তরসুরী হিসেবে তাদের অভিহিত করা হল। তাদেরকে মহিমান্বিত করার জন্য যা যা করার দরকার সবই করা হল সেসময়। এরপর আবার ৯০ দশকের মাঝামাঝি তৈরি করা হল তালেবানদের। আপনাদের খেয়াল থাকবে আশ্চর্যজনকভাবে খুবই কম সময়ে তালেবানদের উত্থান হয়েছে। দেড় দুই বছরের মধ্যে তারা সংগঠিত হল, বিকাশ লাভ করল এবং মুজাহেদিনদের উচ্ছেদ করল। মুজাহেদিনরা সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষমতায় গেল, আবার মুজাহেদিনদের উচ্ছেদ করে তালেবানদের ক্ষমতায় আনল একই যুক্তরাষ্ট্র। তালেবানদের ধ্বংস করে হামিদ কারজাইকে নিয়ে আসা হল। সব ক্ষেত্রেই নাটের গুরু যুক্তরাষ্ট্র। আর এসব ক্ষেত্রে পাকিস্তান ব্যবহৃত হয়েছে একটি খুঁটি হিসেবে। আফগানিস্তানের মত আজ তাদের অবস্থাও ঠিক একই ভাবে বিপর্যস্ত। মধ্য এশিয়াকে টার্গেট করে এ দুটি দেশকেই ধ্বংস করে এগিয়ে গেল যুক্তরাষ্ট্র।

পাশাপাশি ভারত কিন্তু রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীল একটা অবস্থা তৈরি করেছে। যেহেতু পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের সাথে গেল, ভারত গেল সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে। ভারতের পাবলিক সেক্টরকে উন্নত করার জন্য, ভারতের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য তারা সোভিয়েত

ইউনিয়নের কাছ থেকে অনেক ধরনের সাহায্য পেল। পাওয়ার, এনার্জি, স্টিলের মতো বিভিন্ন খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে গেল তারা। এখনো ভারতের এনার্জি সেক্টরে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানই হচ্ছে প্রধান। ভারতে তখন পাবলিক সেক্টর শক্তিশালী হওয়ায় প্রাইভেট সেক্টরেও শক্তিশালী কিছু গ্রুপ দাঁড়িয়ে গেল, যেমন টাটা ও বিড়লা। পাবলিক সেক্টর যেদেশে শক্তিশালী না হয়, সেই দেশে প্রাইভেট সেক্টরও একটা উৎপাদনশীল ভিত্তি নিয়ে দাঁড়াতে পারে না। কারণ দুটোই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এমন কোন দেশ নেই যেখানে প্রাইভেট সেক্টর খুব ভালোভাবে কাজ করছে আর পাবলিক সেক্টর খুব দুর্বল। পুঁজিবাদী দেশে প্রাইভেট সেক্টরকে বিকশিত করার জন্য অবশ্যই একটি শক্তিশালী পাবলিক সেক্টর লাগবে। ভারতে এই ভিত্তিটা তৈরি হয়েছিল আশির দশক পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন নিয়ে।

নব্বই দশকে মনমোহন সিং যখন অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু করলেন ততদিনে ভারতে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো ও বেসরকারি খাত দাঁড়িয়ে গেছে। যখন প্রাইভেটাইজ কর্মসূচি শুরু হল, তখন ভারতের বৃহৎ পুঁজি তৈরি করা একটি ভিত্তিকে নিজেদের আয়ত্তে আনতে সক্ষম হল। টাটার মতো প্রতিষ্ঠান ভারতে দাঁড়াতে পারতনা যদি বাংলাদেশের মত নীতিসংস্কার তারা শুরু থেকে গ্রহণ করত। বাংলাদেশ যেসব নীতি গ্রহণ করেছে - যেমন বাংলাদেশের কোন সম্পদের ওপর তার নিজের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না, নিজে স্বাধীনভাবে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না, বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানী যা খুশী তাই করবে, এই নীতি যদি ভারতেও থাকত তাহলে ভারতে টাটার মতো কোন প্রতিষ্ঠানও দাঁড়াতে পারতনা। মানে প্রাইভেট সেক্টরে এরকম বড় কোন প্রতিষ্ঠান দাঁড়াতে পারতনা। ভারতে এই টাটা-বিড়লা দাঁড়ানো সত্ত্বেও সেখানে এখন পর্যন্ত শক্তিশালী একটা পাবলিক সেক্টর আছে।

ভারত: এই অঞ্চলে বিশ্বপুঁজির কেন্দ্র

এ রকম একটা উন্নয়ন ধারার মধ্য দিয়ে ভারতে পুঁজি বিকশিত হয়েছে, পুঁজির পুঞ্জীভবন ঘটছে, পুঁজির একটা ক্ষুধা তৈরি হয়েছে। পুঁজির একটা চাহিদা যখন তৈরি হয় পুঁজি তখন সম্প্রসারিত হতে চায়। তার তখন বাজার দরকার হয়। পাশাপাশি এবং কাছাকাছি দেশের যেসব বাজার আছে প্রথমে সেগুলো দখলে আনা তার দরকার হয়। সেজন্য বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, পাকিস্তান ভারতের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একেকটা জায়গা। এই পুঁজির চাহিদা পূরণের জন্য পাশের এই দেশগুলি তার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে হবে। এখন সোভিয়েত ইউনিয়ন নেই। কাজেই ১৯৯০ এর দশকে ভারতের অর্থনীতি যেভাবে পুনর্গঠিত হল তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তার সম্পর্ক ক্রমে ঘনিষ্ঠ হতে লাগল। যেমন, ১৯৯৫ সালের মধ্যে

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র বেশ কিছু চুক্তি হল, পারমাণবিক চুক্তি হল। এই অঞ্চলকে ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে কৌশল তার আঞ্চলিক কেন্দ্র হল ভারত।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ভারতকে কেন্দ্র করেই এই অঞ্চলে তার পরিকল্পনা সাজিয়েছে। সুতরাং শুধু ভারতের পুঁজি নয় অন্য দেশের বহুজাতিক কোম্পানী যখন এ অঞ্চলে পুঁজি বিনিয়োগ করে তখন তারাও ভারতকে কেন্দ্র হিসেবে ধরে নিয়েই পুঁজি বিনিয়োগ করছে। ভারত তাই এই অঞ্চলে এখন বিশ্বপুঁজিরও কেন্দ্র। আশপাশের দেশের বাজারকে লক্ষ্য করে ভারতে শিল্প কারখানা গড়ে তোলা হচ্ছে। আর এসব পণ্য চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে ভারত থেকে।

যেমন ভারতের পণ্য হিসেবে যেসব পণ্য আমরা দেখি তার অনেকগুলোই ভারতীয় নয়। সুইডিশ, জার্মান, নরওয়ে, জাপান প্রভৃতি দেশের মোবাইল তৈরি হচ্ছে ভারতে। সেগুলো চলে আসে আমাদের দেশে। অনেক বিদেশী গাড়ি কোম্পানী ভারতে যৌথভাবে গাড়ি কারখানা খুলেছে। সেসব গাড়িও আসছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশে এখন যেসব বিদেশী বিনিয়োগ হচ্ছে তার সাথে কোন না কোনভাবে ভারতের সম্পর্ক আছে। যেমন টাটা তো সরাসরি এসেছিল। এখন আবার টাটা ঘোরাঘুরি করছে। সেই পুরনো প্রকল্পগুলি তারা আবার দাঁড় করার চেষ্টা করছে। এশিয়া এনার্জি ফুলবাড়িতে যে কয়লা উত্তোলনের উদ্যোগ নিয়েছিল সে কয়লা তারা ভারতেই রফতানি করতে চেয়েছিল। তাদের প্রকল্প ছিল শতকরা ৮০ ভাগ কয়লা রপ্তানি হবে। রপ্তানি হবে কোথায়-ভারতে। মার্কিন কোম্পানী ইউনোকাল এখান থেকে গ্যাস উত্তোলন করে ভারতে রপ্তানি করতে চাইল।

পাট শিল্প তো বিপর্যস্ত, বড় কারখানাগুলো শেষ করা হল। রইল কাঁচা পাট। তাও রফতানি হবে ভারতে। বাংলাদেশে পাটের কারখানা নেই, কিন্তু ভারতে আছে। সেখানে নতুন নতুন কারখানা তৈরি হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে কাঁচা পাট যাবে সেসব কারখানায়। আমাদের বলা হল তোমরা গ্যাস দিয়ে কি করবা? তোমাদের গ্যাসের কি দরকার? তোমাদের গ্যাস ভারতে গেলে সেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে সে বিদ্যুৎ তোমরা কিনবা। মানে কারখানা ও শিল্পভিত্তি হবে ভারতে আর এখান থেকে কাঁচামাল হিসেবে গ্যাস যাবে। পণ্য কিনবা। এটাই হল বিশ্বপুঁজির ডিজাইন। মানে বাংলাদেশ থেকে কাঁচামাল ভারতে যাবে। সেখানে সেটা প্রক্রিয়াজাত হবে। তারপর আমরা সেটা কিনব। কিন্তু সবগুলো তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে তারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। আবার তারা নতুনভাবে চেষ্টা করছে। ১৯৯০ এর পরে ভারত এভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে অবিচ্ছেদ্য হয়ে গেল।

এখন পাকিস্তানের কি অবস্থা? পাকিস্তান তো যুক্তরাষ্ট্রের সাথেই ছিল। অনেকের ধারণা, পাকিস্তান পরিপূর্ণভাবে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে আর

বিনিময়ে পাকিস্তানের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছে যুক্তরাষ্ট্র। এখনো কেউ কেউ টেলিভিশন টকশোতে বলেন বাংলাদেশকে যদি তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হয়, আবার কেউ কেউ ভারতের রেফারেন্স দিয়ে বলেন বাংলাদেশকে যদি ভারতের আগ্রাসন থেকে রক্ষা পেতে হয়, তবে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক ভালো রাখতে হবে। এরকম কথা যারা বলে তারা হয় নির্বোধ - কিছুই জানেনা বোঝেনা, অথবা যুক্তরাষ্ট্রকে প্রভু জেনেই সেভাবে চিন্তা করে। আবার যারা বলে যুক্তরাষ্ট্রের হাত থেকে রক্ষার জন্য আমাদের ভারতের সাহায্য নিতে হবে তারাও আহাম্মক ছাড়া আর কিছু নয়। পাকিস্তানের অবস্থাই তাদের জ্ঞানচক্ষু খোলার জন্য যথেষ্ট।

নিরাপত্তাঃ সন্ত্রাসী যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তি

আপনারা বঙ্গোপসাগরের চিত্রটা এখন জানেন। সেখানে ঘন ঘন যুক্তরাষ্ট্র আসছে, ভারত এবং মায়ানমারও সেখানে আছে। চীন আছে মায়ানমারের পেছনে। আবার মায়ানমারের সাথে ভারতও আছে। মায়ানমারের সাথে আবার যুক্তরাষ্ট্রও আছে। সব মিলিয়ে বঙ্গোপসাগর নিয়ে তাদের অনেক রকম পরিকল্পনা জল্পনা কল্পনা আয়োজন আছে। যুক্তরাষ্ট্র বলছে, আমরা বঙ্গোপসাগরে উপস্থিত থাকতে চাই বাংলাদেশকে নিরাপত্তা দেয়ার জন্য।

কার হাত থেকে যুক্তরাষ্ট্র আমাদের নিরাপত্তা দেবে? ভারতের হাত থেকে? যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন আগের অবস্থায় থাকত এবং ভারতও সোভিয়েত ব্লকে অবস্থান করত তবে তারা যুক্তি খাড়া করতে পারতো। কিন্তু এখন তো সোভিয়েত ইউনিয়ন নেই। ভারত এখন এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠতম পার্টনার বা অংশীদার, এবং এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে নেতা হিসেবেই অভিহিত করে। সেখানে ভারতের হাত থেকে রক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে সমর্থন দেবে এই চিন্তা তো আহম্মকী ছাড়া আর কিছু নয়। পাকিস্তানে এই যুক্তিই ১৯৫০ থেকে আজ অবধি রয়ে গেছে যে, ভারতের হাত থেকে বাঁচার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যেতে হবে। এখন অবস্থাটা দাঁড়াচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের বোমা ভারতের ওপর পড়েনা সেটা পাকিস্তানের ওপরই পড়ে। পাকিস্তানী আর্মি আজ সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত অবস্থায়। কারা আছে, কারা পরিচালনা করছে, সিআইএ কোথায় আর 'র' কোথায় সেগুলো চিহ্নিত করা মুশকিল। আর পাকিস্তানের রাজনৈতিক ব্যবস্থারও কোন ঠিক নেই। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল। মাঝে মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র সেখানে তালেবান খোঁজার কথা বলে, লাদেনের কথা বলে বোমা হামলা চালাচ্ছে।

বস্তুতঃ ওসামা বিন লাদেন কখন কোথায় থাকবে সেটা নির্ভর করে পেন্টাগন কী চায় তার ওপর। আগামী সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র কোন অঞ্চলে বোমা মারবে বা কোথায় সে আগ্রাসন চালাবে সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ওসামা বিন লাদেনকে সেখানে

পাওয়া যাবে। যুক্তরাষ্ট্র যদি মনে করে আমি অমুক দেশে আক্রমন চালাব তাহলে সেখানে ওসামা বিন লাদেন আছে সেটা প্রচারিত হবে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। লাদেন বেঁচে আছেন না মরে গেছেন তা আমরা কেউ জানি না। কিন্তু তার নামে গল্পটা সম্পূর্ণরূপে পেন্টাগনই নিয়ন্ত্রণ করে। মাঝে মধ্যে দেখি অজ্ঞাত কেউ টিভি স্টেশনে লাদেনের ভিডিও টেপ রেখে গেছে। লাদেনকে খোঁজার জন্য সারা বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্র লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়োজিত করেছে, বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করছে, কিন্তু ভিডিও টেপটা যখন আল জাজিরা বা অন্য কোন টিভি স্টেশনে পৌঁছে যায় তখন কোন গোয়েন্দা তাদের ফলো করে না। সবাই চোখ মুখ বন্ধ করে বসে থাকে আর তারা ক্যাসেটটা দিয়ে চলে যায়। ক্যাসেটটা যখন বাজে সে টাইমিংটা আবার খুব গুরুত্বপূর্ণ- কখন তার বক্তৃতা প্রচারিত হচ্ছে।

যেমন বুশ যখন দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচিত হয় তখন নির্বাচনের ঠিক দুই দিন আগে লাদেনের বক্তৃতা প্রচারিত হয়। লাদেন বললেন, আমরা যুক্তরাষ্ট্রকে ধ্বংস করে ফেলব। যেহেতু লাদেনের হাত থেকে বুশ ছাড়া আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না- কারণ বুশই তো একমাত্র যুদ্ধ করতে চায় এবং পারে- কাজেই তাকে ভোট দাও। দেখা গেল এতে করে প্রায় ১০ ভাগ ভোট বেড়ে গেল। এই লাদেনের খোঁজে একের পর এক আফগানিস্তানে বোমা পড়ছে। আর পাকিস্তান আছে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থার মধ্যে। যারা সরকার ও দেশ চালায় তারাও সম্পূর্ণ পরাভূত এবং আত্মসমর্পিত। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে ভারতের অবস্থা আরো শক্তিশালী হয়েছে, এবং বিশ্বপুঁজিবাদের কেন্দ্র হিসেবে গোটা দক্ষিণ এশিয়া তার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

দারিদ্র ও লড়াই

যে ভারত গুছিয়ে একটি শক্তিশালী পাবলিক সেক্টর তৈরি করল সেই ভারতের এখন অবস্থাটা কী? সারা পৃথিবীর মধ্যে এখন সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ধনী ভারতে বাস করে। এর আগে ছিল জাপানে। এখন ভারতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ ধনী। কিন্তু সবচেয়ে বেশি গরিব মানুষ কোথায় বসবাস করে? সেটাও ভারতে। এত উন্নয়ন হল, পুঁজিবাদের এত বিকাশ ঘটল, 'শাইনিং ইন্ডিয়া' বলে বিজেপি স্লোগানও তুলেছিল। সেই ভারতে প্রায় ৪০ ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে। দারিদ্র সীমার উপরে যারা আছে তাদের জীবন যে খুব সম্মানজনক তাও নয়। ধরেন আমরা এখানে যারা উপস্থিত আছি তারা সবাই দারিদ্র সীমার উপরে। কিন্তু কজন বলতে পারবেন তার সন্তানের মান সম্মত লেখাপড়া এবং অসুস্থ হলে ভালো চিকিৎসা করানোর মতো খরচের সামর্থ্য আছে?

চিকিৎসা এবং শিক্ষার খরচ বহনের মতো আয় যদি কেউ করতে না পারে তাকে তো স্বচ্ছল মানুষ বলা যায় না। ২ থেকে সর্বোচ্চ ৫ ভাগ মানুষ হয়তো

বলতে পারবে তার সন্তানের লেখাপড়ার খরচ এবং চিকিৎসা খরচ বহন করতে পারছে। আয় মানে পেশাগত আয়। যা সবাই জানে। চুরি ডাকাতি বা দুই নম্বরী না। আমাদের সমাজে যে ৫ ভাগ লোক এ খরচ বহন করতে পারে তারা নানা অস্বচ্ছ উপায়ে এ আয় করে থাকে, চুরি ডাকাতি করে। তাহলে বোঝা যায় বাংলাদেশের মত ভারতেও আসলে ৮০ ভাগ লোক নিদারুণ খারাপ অবস্থায় আছে।

যারা সুপার পাওয়ার হতে চায়, যার হাতে পারমাণবিক বোমা আছে সেই ভারতের অবস্থাটা কী চিন্তা করুন। যে কারণে ভারতের ভেতরকার লড়াই আবার গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যখন বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করব, ভারত একরম একটি ভয়ঙ্কর শক্তি হয়ে যাচ্ছে তাকে মোকাবেলা করব কীভাবে, তখন আমাদের পাশাপাশি এটাও দেখতে হবে যে, ভারতের ভেতরেও একটা লড়াই চলছে। বিভিন্ন রাজ্যে ৫০ ভাগের বেশি মানুষ প্রান্তিক। অরুন্ধতী রায়ের সর্বশেষ লেখাটা হয়ত আপনাদের পড়া আছে- 'ওয়াকিং উইথ দা কমরেডস'। ঐ লেখার মধ্যে পাওয়া যায় ভারত বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানী এবং দেশীয় কোম্পানীকে জায়গা দেয়ার জন্য অপারেশন গ্রিনহান্টের নামে সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিএসএফ, এলিট ফোর্স, কোবরা, স্করপিয়নসসহ ভারতের যত আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আছে তারা নির্বিচারে মানুষ হত্যা করছে, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে। যেটা ১৯৭১ সালে পাকিস্তান করেছিল। এখন ভারতের ভেতরে সেটা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে আবার পাল্টা প্রতিরোধও তৈরি হচ্ছে সেখানে।

এরকম একটা পরিপ্রেক্ষিতে আজ বাংলাদেশ দাঁড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের উন্নয়ননীতিসহ আরো যেসব বিষয় বললাম তার পরিপ্রেক্ষিতে এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে, গত দুই তিন দশকে যে ধরনের পলিসি শিফটগুলি হয়েছে সেগুলোর একটি নির্দিষ্ট ফলাফল বা গন্তব্য আছে। যেমন ধরেন ইরাক। আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি ইরাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গিয়ে বোমা মারল, বোমা মেরে গণহত্যা করল। তারপর ইরাকের তেল ক্ষেত্র তারা দখল করল। ইরাকের সামরিক বাহিনীসহ সবকিছু তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসল। এর মাধ্যমে পুরো মধ্যপ্রাচ্যের ওপর তারা নিয়ন্ত্রণ আরোপের চেষ্টা করল।

কিন্তু আধিপত্য ও দখলের জন্য বাংলাদেশে তাদের কোন বোমা মারতে হয় নাই। যদিও সামরিক চুক্তি আছে এরকম যে, আজকে যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন সৈনিক বাংলাদেশে কাউকে জঙ্গি বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য হুমকি আখ্যায়িত করে গুলি করে হত্যা করে, তাহলে চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার সেই মার্কিন সৈনিকের কোন বিচার করতে পারবে না। বাংলাদেশ সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এরকম চুক্তি করেছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন সেনা অন্য কোন দেশে অপরাধ করে যদি বাংলাদেশে আসে, বাংলাদেশে যদি কোন অপরাধ করে তবে

বাংলাদেশ আইন অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারবে না বা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টে হস্তান্তর করতে পারবে না। কারণ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ক্রিমিনাল রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঐ ক্রিমিনাল কোর্টের মেম্বার হয়নি আজো। চিন্তা করে দেখুন সবচেয়ে বড় ক্রিমিনাল সেই ক্রিমিনাল কোর্টের সদস্য হয়নি। তাহলে ওখানে গিয়ে আপনি কার বিচার চাইবেন, কার বিরুদ্ধে বিচার চাইবেন?

যুক্তরাষ্ট্র: দখলদার কিন্তু সংকটগ্রস্ত

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার কেন্দ্রীয় শক্তি এবং সন্ত্রাসী যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সর্বশেষ অবস্থা কী? দুটো দিক তার মধ্যে এখন পরস্পরবিরোধী অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। অর্থনৈতিকভাবে এটি খুবই বিপর্যস্ত। অর্থনৈতিক সুপারপাওয়ার হিসেবে দাঁড়ানোর আর কোন সম্ভাবনা যুক্তরাষ্ট্রের নেই। ইতিহাসের অন্যতম অর্থনৈতিক ধ্বস আমরা কিছু দিন আগে দেখলাম যুক্তরাষ্ট্রে। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ঋণগ্রস্ত দেশ এখন তারা। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি এখন চীন এবং মধ্যপ্রাচ্যের ওপর নির্ভরশীল। চীন এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো যদি যুক্তরাষ্ট্রের ওপর থেকে সমর্থন তুলে নেয় তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি বলতে কিছু থাকবে না। অন্যদিকে এরকম একটা দেশের হাতেই বিশ্বের সবচেয়ে বড় পারমাণবিক মারণাস্ত্র মজুদ আছে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় সামরিক শক্তি হচ্ছে তারা। সারা পৃথিবীতে যত সামরিক বাজেট আছে তার ৬০ ভাগ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের একার।

পুরো যুক্তরাষ্ট্রের যে মিলিটারি বাজেট তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের দিক থেকেও ভয়ঙ্কর একটা চিত্র দেখায়। মিলিটারি বাজেট, সিকিউরিটি এগুলোও এখন বড় বিনিয়োগের ক্ষেত্র। সেজন্য ইরাকে যত মার্কিন সৈন্য আছে ঠিত তত সংখ্যায় যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন ধরনের প্রাইভেট সিকিউরিটি সার্ভিস, কনস্ট্রাকশন সার্ভিস জাতীয় কোম্পানী আছে যারা কনসালটেন্সিসহ নানা জাতীয় কাজ করে। তাদের টিকে থাকবার জন্যই দরকার যুদ্ধ এবং ধ্বংস। এটি হল বিশ্ব পুঁজিবাদের একটা ভয়ঙ্কর চিত্র, যেখানে যুদ্ধ ছাড়া পুঁজিবাদ টিকতে পারে না। যুদ্ধ তার লাগবেই।

যুদ্ধ তার অস্তিত্বের জন্য দরকার

যুক্তরাষ্ট্রের জন্য যুদ্ধ অতএব জরুরী। শুধু নিজে যুদ্ধ করলেই চলবে না, সারা পৃথিবীতেই একটা যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রাখতে হবে। যেমন পাকিস্তান ইন্ডিয়া নিজেরা চাইলেও সেখানে কোনদিন তারা শান্তি স্থাপন করতে পরবে না। কারণ কাশ্মীর খুবই একটা লোভনীয় ব্যবসার জায়গা। আমরা যখন কাশ্মীরের দিকে তাকাই তখন গণহত্যা, রক্তাক্ত চিত্র দেখি। কিন্তু গ্লোবাল বিজনেসের দিক থেকে তাকালে দেখা যায় কাশ্মীর ইস্যু হল খুবই একটা লোভনীয় ব্যবসার কেন্দ্র। বাণিজ্য

কেন্দ্র। বিরাট অস্ত্রের বাজার হল কাশ্মীর ইস্যু। ভারত এবং পাকিস্তানের যে বিরাট সামরিক বাজেট এবং সামরিক সম্প্রসারণ সেটা হচ্ছে এই কাশ্মীরকে কেন্দ্র করেই। এখন বাংলাদেশ মায়ানমার এসব দেশেও আস্তে আস্তে এ সামরিক সম্প্রসারণ ঘটবে। এ অস্ত্র ব্যবসার কারণে কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারত পাকিস্তানের লড়াই থামবে না। থামলেই বিশাল একটা অস্ত্র বাণিজ্য শেষ হয়ে যাবে।

ভারত এই বছর তার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় মিলিটারি বাজেট ঘোষণা করেছে। সুতরাং এই মিলিটারি বাজেটের যৌক্তিকতা তৈরি হবে কোথায়? তৈরি হবে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধে। পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ ছাড়া সে কিভাবে অস্ত্রখাতে ব্যয় যুক্তিযুক্ত করবে জনগণের কাছে? তোমাদের শিক্ষা দিতে পারব না, চিকিৎসা দিতে পারব না। তোমাদের শিক্ষা এবং চিকিৎসার টাকা আমাদের কাছে নাই। কিন্তু মানুষ হত্যা করার জন্য টাকা আছে। সরকারের অবস্থান হল, ৪০ ভাগের বেশি মানুষ ভারতে না খেয়ে থাকলেও আমরা এই টাকা বোমা আর অস্ত্রের পেছনে খরচ করব। কারণ আমাদের নিরাপত্তা দরকার। পাকিস্তান আমাদের যেকোন সময় আক্রমণ করতে পারে। এই ভয়টা তৈরি না করলে তো এই বাজেট করা যায় না, যুক্তি তৈরি করা যাবে না। পাকিস্তানেও একই অবস্থা। সেখানেও একইভাবে দারিদ্র্য আছে- তার চেয়ে বেশি হবে। সেই পাকিস্তান হচ্ছে বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম আর্মির দেশ। আর সেখানেও পারমাণবিক বোমা আছে।

পারমাণবিক বোমা নিয়ে দুই দেশের সরকারই খুশী। কিন্তু পাকিস্তানের লাহোরে যদি বোমা পড়ে তাহলে ভারত কি করে তার থেকে রক্ষা পাবে?। দেশ দুটো এত কাছাকাছি যে, যে কোন একটি দেশ যদি অপর দেশে বোমা ফেলে তাহলে দুই দেশকেই ভুগতে হবে। কারণ সীমান্ত অনুযায়ী তো আর বোমার ফলাফল কাজ করবে না- যে, এটা পাকিস্তানের সীমানা আমি এখানেই থাকব ভারতের মধ্যে ঢুকবনা। তাতো হবে না। পাকিস্তান যদি দিল্লী বা অন্যান্য জায়গায় বোমা মারে সেটাও পাকিস্তানে যাবে। এরকম একটা ভয়ঙ্কর অস্ত্র নিয়ে তারা আনন্দিত, গর্বিত এবং লোকজনের মধ্যে এমন একটা উন্মাদনা তৈরি করে যে, এটমিক বোমা ফাটাবার পরে লোকজন মিষ্টি বিতরণ করে। যাদের নিজেদের জীবন জীবিকার ঠিক নেই তারা রাস্তায় মিষ্টি খাচ্ছে। গর্বটা কী? যে, আমাদের ভারতে পারমাণবিক বোমা আছে। কিংবা আমাদের পাকিস্তানেও বোমা আছে। মানে কিভাবে মাথা এবং চেতনাকে অবশ করে ফেলা হয় এগুলো হচ্ছে তার উদাহরণ।

বাংলাদেশের 'উন্নয়ন' নীতি: দখলের পথ

বাংলাদেশের যে 'উন্নয়ন' নীতি- যেমন ধরুন তেল গ্যাস বা কয়লা এসব খাত দখল এবং নিয়ন্ত্রণ নেয়ার জন্য বহুজাতিক কোম্পানী তৎপর কিংবা সমুদ্রের গ্যাস

ব্লক নেয়ার জন্য তারা আসছে। এসব কাজের নীতিকাঠামো তো একদিনে হয়নি। কোন নির্দিষ্ট সরকার একাও এটা করেনি। ক্রমান্বয়ে একের পর এক এসেছে। আশির দশকে বিশ্বব্যাংক ফিজিবিলিটি স্টাডি করেছে এনার্জি সেক্টরে। ফিজিবিলিটি স্টাডি করে তারা বলেছে যে, এনার্জি সেক্টরে উন্নয়ন করতে হলে সবচেয়ে ভালো হবে এই খাতে বিদেশী কোম্পানীকে যুক্ত করা। তখন পর্যন্ত কিন্তু এসব খাতের শতকরা একশ ভাগ মালিকানা ছিল বাংলাদেশ সরকারের হাতে। আস্তে আস্তে তাদের পরামর্শ অনুযায়ী নীতি প্রণীত হয়েছে। প্রথমে এরশাদ শুরু করল হরিপুর তেল ক্ষেত্র দিয়ে। কিন্তু জনপ্রতিরোধের কারণে এরশাদ ওখানে পারলনা। না পারার পর নব্বই দশকে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় এসেও ঐ একই কাজ করল। নীতি বা পলিসিগুলির কথা চিন্তা করুন।

যেমন ধরা যাক, আদমজী পাটকল। বিশ্বব্যাংক ১৫শ কোটি টাকা ঋণ দিল। সেই ঋণের টাকায় আদমজী পাটকল বন্ধ হল। এটা শুধু অর্থনৈতিক বিষয় নয়, এর একটা রাজনৈতিক মাত্রা আছে। সাম্রাজ্যবাদ ও শাসক শ্রেণীর লক্ষ্য হল যে, যেখানে বৃহৎ ইন্ডাস্ট্রি, যেখানে বৃহৎ সংখ্যক শ্রমিকদের সমাবেশ এরকম কোন প্রতিষ্ঠান যেন বাংলাদেশে না থাকে। শ্রমিক শ্রেণীর লড়াইয়ের জন্য একটা বড় জায়গা ছিল আদমজী। সুতরাং এরকম প্রতিষ্ঠানগুলো যেন না থাকে। এর বদলে ছোট ছোট প্রাইভেট কোম্পানী হবে। শ্রমিকরা হবে অস্থায়ী। এখন ছোট ছোট যেসব পাটকল হচ্ছে সেখানে শ্রমিকদের দিন ভিত্তিক মজুরী দেয়া হয়। তারা কোন স্থায়ী কর্মচারী নয় এবং সেখানে কোন ট্রেড ইউনিয়ন করতে দেয়া হয় না। শ্রমিকরা কাজ করবে আর দিন শেষে ৫০, ১০০ টাকা নিয়ে চলে যাবে। কিন্ত অধিকার আদায়ের জন্য কোন আন্দোলন করতে পারবে না, সেটা করার জন্য কোন জায়গা এবং সুযোগ থাকবে না। যেকারণে গার্মেন্টেসেও স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ এবং ট্রেড ইউনিয়ন এসব বিষয় যতদিন সম্ভব ঠেকিয়ে রাখা হচ্ছে। সব অস্থায়ী দিনমজুর।

আদমজী পাটকল নিয়ে এই যে নীতি এটি প্রথমে বিএনপি সরকারের সময় চুক্তি হয়েছে। তারপর আওয়ামী লীগ সরকার সেটা বাস্তবায়ন করেছে। তারপর আবার চারদলীয় জোট সরকার এসেছে এবং তারা আদমজী পাটকল বন্ধই করে দিয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে আর কোন সরকার প্রধান আর কোন কাজ করে বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে এরকম উচ্ছসিত প্রশংসা পায়নি, যেটা ২০০২ সালে বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে খালেদা জিয়া পেয়েছিলেন। সেই একই সময় আমরা দেখলাম ভারতে পাটকল হচ্ছে। চারদলীয় জোট সরকার তো এমনিতে ভারত বিরোধী সরকার হিসেবে পরিচিত। কিন্তু কী কারণে তাদের সময়ে ভারতের বাজার সম্প্রসারণ, ভারতের স্বার্থ এবং সুবিধা অনুযায়ী চুক্তি হতে কোন অসুবিধা হয়নি? কেন? কারণ কী?

কারণটা একদিকে হচ্ছে শ্রেণীস্বার্থ, অন্যদিকে ভারতের স্বার্থ এবং বিশ্বব্যাংক আইএমএফ-এর স্বার্থের মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। বিশ্বব্যাংক যে নীতি দিচ্ছে সে অনুযায়ী যদি বাংলাদেশের শিল্পায়ন ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা বিদ্যমান শিল্প কারখানা যদি বন্ধ হয়ে যায় বা জাতীয় সক্ষমতাও যদি হারিয়ে যায় তবে প্রথম লাভবান হবে ভারত। যদি বাংলাদেশের অবস্থান এরকম হয় কাঁচামাল উৎপাদন কর আর গ্যাস রপ্তানি কর, শিল্প হবে অন্যত্র তাতে প্রথম লাভবান হবে ভারত। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা যদি পুরোপুরি বাজারের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়, তাতে এসবদিকে তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী খাত থাকার কারণে লাভবান হবে ভারত। সেজন্য আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা সব জায়গায় ভারত আছে প্রবলভাবে।

অনেকে বলেন বাংলাদেশে যদি ভারতের ট্রানজিট হয় তাহলে বাংলাদেশে ট্রান্সপোর্টের অনেক বিকাশ হবে। কোন ট্রান্সপোর্টের বিকাশ হবে? এখানে যত গাড়ি চলে সবই তো ভারতের। ট্রানজিট বা ট্রান্সশিপমেন্ট যেটাই হোক এখান দিয়ে যে গাড়ি চলবে সেগুলো তো ভারত থেকেই আসে। কাজেই বিকাশ হলে তো ভারতের পরিবহণ খাতেরই বিকাশ হবে। এখন আবার ছোট গাড়ি ন্যানো আসছে। খুবই ভীতিকর অবস্থা।

বিএনপি বা জামায়াত তো বিশ্বব্যাংকের বিরোধী নয়, তারা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের বিরোধী নয়; তারা স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্টের বিরোধী নয়, তারা পিআরএসপির বিরোধী নয়। এসবগুলোর সাথে তারা আছে। আপনি যদি এগুলোর সাথে থেকে বলেন আপনি ভারত বিরোধী তাহলে সেটা ভাওতাবাজি ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ এই সবগুলোর সাথে জড়িয়ে আছে ভারতের বৃহৎ পুঁজির স্বার্থ। এদের এইসব নীতি এখানে ভারতের বৃহৎ পুঁজির বাজার বিকাশেরই কাজ করে। ভারতের এই আধিপত্য ধরে রাখার ও তার আরও সম্প্রসারণের জন্য সামরিক এবং রাজনৈতিক যেসব কর্মসূচী দরকার তাও ভারত গ্রহণ করছে, যেসব বাধা আসবে সেগুলিও মোকাবেলা করবে। সহিংসতার সম্ভাবনা সেখানেই।

আমাদের শাসক শ্রেণীর বৃহৎ দলগুলোর মধ্যে মারামারি কাটাকাটি আছে, কিন্তু উন্নয়ন নীতির যেসব বিষয় বললাম সেসব বিষয়ে তারা সবাই একমত। আমাদের সুশীল সমাজ সব সময় বলে যে, খালেদা জিয়া আর শেখ হাসিনা যদি এক সাথে বসে একটা ঐকমত্যে আসেন তাহলে বাংলাদেশের জন্য খুব ভালো হবে। সুশীল সমাজের ভদ্রলোকেরা কেউ কেউ আগে দেনদরবারও করেছেন দুজনকে এক টেবিলে বসানো যায় কিনা।

আসলে কী হয়? তাদের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ থাকা অবস্থায়ই আমাদের এই দশা। যদি দুজনের মধ্যে ঐক্য হয় তাহলে কি ভয়ঙ্কর অবস্থা হবে ভেবে

দেখুন। কারণ দেশ পরিচালনার নীতির ক্ষেত্রে তাদের ঐক্য তো যথেষ্টই আছে। যেমন পিআরএসপি একদল করলে আরেক দল এসে বাতিল করেনা। প্রডাকশন শেয়ারিং কনট্রাক্ট বা গ্যাস নিয়ে বিদেশি কোম্পানির সাথে জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তি একদল করেছে আরেক দল এসে বাতিল করেনি। নতুন করে যোগ করেছে কেবল। জালিয়াত এশিয়া এনার্জিকে এক দল অনুমোদন দিয়েছে আরেক দল এসে তাদের বহিষ্কার করেনি- বরং গুলি করেছে প্রতিবাদী মানুষের ওপর। সুতরাং জাতীয় স্বার্থবিরোধী সব নীতির ক্ষেত্রে, সরকার নির্বিশেষে, একটা পরিষ্কার ধারাবাহিকতা দেখা যায়।

লড়াইএর পথ

ভারতের আধিপত্য থেকে যদি আমাদের বাঁচতে হয় সেই লড়াইটা অবশ্যই বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি, ডব্লিউটিও কিংবা সামগ্রিকভাবে সাম্রাজ্যবাদী যে আধিপত্য সেই আধিপত্য বিরোধী লড়াইয়ের সাথে যুক্ত করেই করতে হবে। ভারতীয় বৃহৎ পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াই না করে বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই করা যাবে না। কারণ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই করতে গেলে ভারতীয় বৃহৎ পুঁজি অবশ্যই আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে। তাকে মোকাবেলা করতে হবে। কেউ যদি বলে ভারত আমাদের বন্ধু, যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই করছি সেখানে ভারত আমাদের সহায়তা দেবে- এটাও আরেক মূর্খতা। আবার কেউ যদি বলে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই করব এটাও আত্মঘাতি একটা অবস্থা। এখন অনেকে বলতে পারেন এতো ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। কী করে সম্ভব এই দুইটার বিরুদ্ধে এক সাথে লড়াই করা? আমি বলি, খুবই সম্ভব।

খুবই সম্ভব এই কারণে যে, ভারতীয় রাষ্ট্র বা ভারতীয় শাসক শ্রেণী মানে ভারতের পুরো একশ কোটি মানুষ নয়। সমগ্র পরিস্থিতির এটি হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। ভারতের জনগণও যুদ্ধ করছে তার শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে। এভাবে লড়াইয়ের যে একটা স্পেস তৈরি হচ্ছে, তাতে বাংলাদেশের জনগণ যখন ভারতের আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করবে দুইএর মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপিত হবার সম্ভাবনা থাকবেই। আর বাংলাদেশের যারা শাসক শ্রেণী তাদেরকে আপাতদৃষ্টিতে যতই দমনমূলক আর শক্তিশালী মনে হোক, বাংলাদেশের মানুষের বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন এবং খন্ড খন্ড সাফল্য থেকে আমরা বুঝতে পারি - জনগণ যদি ঠিক জায়গাটা ধরতে পারে, লক্ষ্যটা যদি পরিষ্কার হয়, শত্রুকে যদি পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করতে পারে তাহলে জনগণের শক্তির পক্ষে এই শাসক শ্রেণীকে পরাভূত করা মোটেই কোন কঠিন কাজ নয়।

তাহলে এতটুকু বলে আমি থামি। তারপর আপনাদের কাছ থেকে প্রশ্ন শুনবো।

প্রশ্নোত্তর

এনজিও প্রসঙ্গ

প্রশ্ন: বাংলাদেশে এনজিওর বিকাশ। সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ থেকে রক্ষার বা পরিত্রানের যে রাস্তা সে সম্পর্কে কোন পরিষ্কার ধারণা আমরা পাইনা যেখানে এই এনজিওর এত বিকাশ ঘটছে।

প্রশ্ন: সাম্রাজ্যবাদ আধিপত্যবাদ মোকাবেলার জন্য যেখানেই কাজ হচ্ছে সেখানেই এনজিওর বিকাশ হচ্ছে। এনজিওর মাধ্যমে মোকাবেলা করা হচ্ছে। তাহলে ভবিষ্যতে কি এনজিওগুলো সাম্রাজ্যবাদের বিকল্প হিসেবে আবির্ভূত হবে?

আনু মুহাম্মদ: এনজিও সম্পর্কে, এনজিওর উদ্ভব ও বিকাশ এবং সমাজ রাজনীতিতে এর তাৎপর্য্য আলোচনার জন্য আলাদা একটি আলোচনা অনুষ্ঠান দরকার। বাংলাদেশের বয়স আর এনজিওর বয়স একই। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই, কারণ ৭০ এর দশক থেকেই এর শুরু। রবার্ট ম্যাকনামারা বক্তৃতার কথা বলেছি। তারপর থেকেই এনজিও খাতে ফান্ডিং বাড়তে লাগল। এর সূত্র ধরেই বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের এনজিওর বিকাশ ঘটতে লাগল। ক্রমে একটি এনজিও মডেলের আবির্ভাব ঘটলো। এই মডেল অনুসন্ধান করেই আমি আশির দশকে (১৯৮৮) *বাংলাদেশের উন্নয়ন সংকট এবং এনজিও মডেল* নামে একটা বই লিখেছিলাম, এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ২০০০ সালে। এই গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ আছে। অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন এরপর হয়নি।

এনজিওর যাত্রা যেভাবে শুরু হয়েছিল, পরে তার মধ্যে কিছু পরিবর্তন আসে। যেমন ৭০ দশকে যখন তারা যাত্রা শুরু করে তখন কাছাকাছি ধরনের জনবল অর্থবলই ছিল সবগুলি এনজিওর মধ্যে। পরবর্তীকালে পুঁজিবাদী ব্যবসার মধ্যে যেমন একচেটিয়াকরণ (মনোপোলাইজেশন) হয়, এনজিওগুলির মধ্যেও তেমন একটা একচেটিয়াকরণ হয়েছে। এখন প্রায় ৯০ ভাগ সম্পদ (রিসোর্স) হচ্ছে মাত্র কয়েকটা এনজিওর কাছে। করপোরেট এনজিও হিসেবে তারা একটা নতুন ধরন নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। ধরেন ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক। গ্রামীণ ব্যাংক একটি ব্যাংক হলেও তারা একটি এনজিও মডেলে কাজ করে। গ্রামীন ব্যাংক, ব্র্যাক, আশা এগুলোকে করপোরেট এনজিও হিসেবে অভিহিত করতে পারি। এসব প্রতিষ্ঠান সামাজিক কাজ ও তার প্রতিশ্রুতি নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল, কিন্তু এখন তারা তার চেয়ে অনেক বেশি নিয়োজিত ব্যবসায়িক কাজে। এই ব্যবসায়িক তৎপরতায় তাদের অন্যতম সহযোগী বহুজাতিক পুঁজি।

আরেকটা বড় ধরনের পরিবর্তন হল অন্যান্য কাজের তুলনায় এনজিওগুলোর মাইক্রোক্রেডিটে (ক্ষুদ্রঋণ) বেশি বেশি যুক্ত হওয়া। এনজিওর মধ্যে এখন যারা প্রধান, তারা সবাই ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে কাজ করছে। সারাদেশেই ক্ষুদ্রঋণের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। মানুষজন গ্রামে নিজেরা নিজেরা সমিতি ক্লাব করেও ক্ষুদ্রঋণের ব্যবসা করছে। সন্দেহ নেই, ক্ষুদ্রঋণ গ্রামীন অর্থনীতিকে অনেক বেশি বাজারীকরণ করেছে, বাজারের সাথে অনেক বেশি সংযুক্ত করেছে। করপোরেট এনজিওগুলির ব্যবসা বাণিজ্যও এর মাধ্যমে অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। যেমন গ্রামীণ ফোনের যাত্রা শুরু হয়েছে গ্রামের গরিবদের, কৃষকদের সাহায্য করবে এই কথা বলে। ঐ কথা বলে তারা রাষ্ট্রের কাছ থেকে অবকাঠামোগত সুবিধা নিয়েছে। লাইসেন্স ফি দেয় নাই। গরীবদের নাম করে এলো টেলিনর- বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানী, গ্রামীণ ফোন নামে বৃহত্তম মোবাইল কোম্পানি, গ্রাহকদের শতকরা ৯০ ভাগ শহুরে। এরপর ফরাসী ডেনন, দই কোম্পানী- এবারও গরীবের কথা বলেই।

গরিব মানুষের পুষ্টির অভাব তৈরি হয়েছে তার ভাতের অভাবের কারণে। কিংবা মূল খাদ্যের অভাবে। সেই খাদ্যের কোন যোগান নেই, সংস্থান নেই। কয়েকটা টাকা যোগাড় হলে ঐ গরিব লোকটা কি দই কেনার জন্য যাবে, না চাউল কিনবে? কিন্তু এই যে গরিবের নামে পুষ্টির নামে স্লোগান তাতে বিদেশী কোম্পানী সহযোগে ব্যবসাটা বাড়বে। গরিবদের কথা বলে অনেক ধরনের সুবিধা তারা রাষ্ট্রের কাছ থেকে নিচ্ছে। গরিবদের দই পাবার ব্যবস্থা তারা করবে তা কিন্তু নয়। এ দই ঢাকার বিভিন্ন দোকানে পাবেন। ঢাকার যারা মধ্যবিত্ত তাদের ছেলে মেয়েরা বা তারা নিজেরা ঐ দই খাবে। এর মধ্য দিয়ে আরেকটি ঘটনা ঘটবে। সেটি হল বগুড়ার যে দই শিল্প, অনেক ছোট ছোট দই কারখানা সেগুলো আর পরে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ তারা ফরাসী এই দই কারখানার সাথে প্রতিযোগিতায় পারবে না। তার মানে এরা মাইক্রোক্রেডিট বা এনজিও তৎপরতার মধ্য দিয়ে বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের কাজ করছে, বহুজাতিক পুঁজির ক্ষেত্র তৈরি করছে।

বাংলাদেশ হচ্ছে এখন একটা ইউনিক মডেল, যেখানে করপোরেট এনজিওগুলি বিশাল ক্ষমতার জায়গায় আছে। বাংলাদেশে শাসক শ্রেণীর মধ্যে এই বড় বড় এনজিওগুলির 'মালিকেরাও' এখন অন্তর্ভূক্ত ধরতে হবে। গ্রামীণ ব্যাংক হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে এখন সবচেয়ে বড় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান, ব্র্যাক হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এনজিও। এরকম বড় প্রতিষ্ঠান আগে আদমজীকে বলা যেতো। এখন এনজিও হচ্ছে আমাদের দেশে সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান। যে এনজিও এখন আন্তর্জাতিক এনজিও হয়ে যাচ্ছে। টাটা আন্তর্জাতিক কোম্পানী হচ্ছে একভাবে, আর ব্র্যাক আন্তর্জাতিক কোম্পানী হচ্ছে আরেকভাবে। ব্র্যাক আফগানিস্তানে যেতে চায়। ইরাকে যেতে চায়। আমি জানি ইরাকে যখন বোমা বর্ষণ শুরু হল তখনই ব্র্যাক রাস্তা

খুঁজতে শুরু করল ইরাকে যাওয়ার কোন প্রজেক্ট পাওয়া যায় কিনা। সুতরাং এই এনজিওগুলি গ্লোবাল যে ক্যাপিটাল তাদের কাছে একটা খুবই কমফোরটেবল ইনস্টিটিউশন।

এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশ্বপুঁজি মানুষের কাছে বিকল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপস্থিত করতে চায়। ক্ষুদ্রঋণ হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সবচেয়ে ভালো পথ, এটা বললে তাদের জন্য খুব সুবিধাজনক হয়। বিশ্বব্যাংকের কাগজপত্রের মধ্যে, পাঠ্যবইয়ে ক্ষুদ্রঋণকে মহিমান্বিত করা হয়। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, দারিদ্র্য থেকে মুক্তির পথ সম্পর্কে কিছু একটা তো তাদের বলতে হবে, মাইক্রোক্রেডিটের কথা তাদের জন্য খুব সুবিধাজনক ও নিরাপদ। এখন যুক্তরাষ্ট্রেও ক্ষুদ্রঋণের ব্যবহার হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে তো দারিদ্র্য, বেকারত্ব, বৈষম্য বড় আকার ধারণ করেছে। অর্থাৎ দারিদ্র্য যেখানে আছে ক্ষুদ্রঋণ সেখানে থাকবে, এবং ক্ষুদ্রঋণ যেখানে আছে দারিদ্র্যও সেখানে থাকবেই। ক্ষুদ্রঋণ যদি কোথাও দারিদ্র বিমোচনের মডেল হয়, তাহলে সেখানে দারিদ্র্য থেকে আর উদ্ধার পাবার কোন সম্ভাবনা নেই। তার মানে এই এনজিও জগৎটা বাংলাদেশে পুঁজিবাদী সম্পর্ক ও বাজার বিকাশের ক্ষেত্রে একটা বড় মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু পুঁজিবাদের উৎপাদনশীল ভিত্তি বিকাশের ধারা তার এগিয়ে নেবার লক্ষণ নেই। অর্থকরী বাণিজ্যেই তার প্রধান ভূমিকা।

অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যে আমরা আবার বিভিন্ন ধরনের এনজিও দেখতে পাচ্ছি তার অবস্থান আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করবো? এগুলোর বৈশিষ্ট্য কী? উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়ায় বিভিন্ন ধরনের গ্রুপ দেখি আমরা, যারা পরিবেশ নিয়ে, জেন্ডার নিয়ে, বহুজাতিক সংস্থার বিরুদ্ধে কাজ করছে। কিছু সংগঠনের মূল আগ্রহ হচ্ছে, বা তাদের লড়াইয়ের মূল জায়গাটা হচ্ছে তাদের দেশের মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীগুলো অন্যান্য দেশে গিয়ে কী অপকর্ম করে সেটা তাদের দেশের জনগণকে দেখানো। জানানো যে, এই মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীগুলো তোমাদের নাম করে অন্য দেশে গিয়ে এই এই সর্বনাশগুলি করছে। ঐসব দেশে যারা এধরনের কাজগুলো করে তারা কিন্তু বিদেশী সাহায্য দ্বারা পরিচালিত না, তারা কোন বহুজাতিক সংস্থা বা মূলধারার আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকেও চাঁদা নেয় না। তারা তাদের নিজেদের দেশের, মতাদর্শিকভাবে মেলে এরকম ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর কাছ থেকে চাঁদা দিয়ে চলছে, খুবই গরীবানা হালে।

কিন্তু বাংলাদেশে যখন কোন একটা এনজিও কাজ করে তখন তো সে বিদেশী সাহায্য নিয়ে কাজ করে। যখন সে বিদেশী সাহায্য নিয়ে কাজ করে তখন তথাকথিত ডোনার সংস্থা, তাদের এজেন্ডা বা কর্মসূচী, তার দ্বারা পরিচালিত হয়। সুতরাং কেন্দ্র দেশে অনেক স্বাধীন গ্রুপ আছে যারা সাধারণত এনজিও নামে

পরিচিত, কিন্তু এনজিও বলতে আমরা যে ধরনের চিত্র দেখি আমাদের দেশে -মানে পুঁজিবাদের দোসর হিসেবে কাজ করে, কোন কোন ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালনকারী, কোন কোন ক্ষেত্রে সরাসরি রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে কাজ করে- তাদের সাথে তুলনা করা যাবে না। বরং দুইএর ভূমিকা বিপরীত।

তার মানে এখানে একটা জটিল ব্যাপার আছে। পুঁজিবাদী কেন্দ্র দেশে যারা এসব তৎপরতায় আছে তারা আবার অনেকক্ষেত্রে কোন না কোন বাম দল যেমন গ্রিন পার্টি বা সোশালিস্ট পার্টি বা অন্যান্য দলের কর্মী। তারা সামাজিক কাজের অংশ হিসেবে এগুলো করে। ১৯৯০ এর দশকের শেষভাগে আমরা আন্দোলনের একটি নতুন সূত্রপাত দেখলাম যেখানে বিশ্বব্যাংক বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এসবের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদ হল। লোকজন আন্দোলন করতে গিয়ে মারাও গেলেন। আরেকটা সমাবেশে দেখলাম দক্ষিণ কোরীয় একজন কৃষক আত্মহত্যা করলেন এদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে। আরেকটা সমাবেশে ইতালীর এক যুবক গুলি খেয়ে মরলেন। এইভাবে যারা সমাবেশ করছে তারা প্রচলিত এনজিও ঘরানা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আবার ঐখানে যারা হলের মধ্যে সমাবেশ করছে তাদের মধ্যে আপনি আরেকটি এনজিও গ্রুপ পাবেন। আরেকটা এনজিও গ্রুপ আছে যাদেরকে বিশ্বব্যাংক খুব খাতির করে, বলে 'লেট আস এনগেজ।' 'আসেন আমরা বিতর্ক করি, আলোচনা করি। আলোচনার মধ্য দিয়ে সমাধান করি।' ঐটা কিন্তু আরেকটা অফিসিয়াল এনজিও গ্রুপ। যারা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের বা এডিবির পলিসির একটু সমালোচনা করে সমাধানের একটা রাস্তা দেয়। এই যে হলের ভেতরের গ্রুপ এবং বাইরে যারা পুলিশের সাথে মারামারি করছে, ঢিল মারছে দুইটা কিন্তু এক নয়। বাইরে যারা কাজ করছে তাদের মধ্যে আমরা বিভিন্ন পলিটিক্যাল গ্রুপও দেখি। তাদের ব্যানার ট্যানারও দেখি। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর, ইউরোপেও বিভিন্ন মাত্রায় এ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হবার পরে আবার একটা ধরন তৈরি হয়েছে যার আমরা প্রকাশ দেখছি এ ধরনের লড়াইয়ের মাধ্যমে। এবং শেষ পর্যন্ত তাদের একটা রাজনৈতিক ভাষা, একধরনের ডিসকোর্স তৈরি হচ্ছে।

যখন এই ধরনের কর্মসূচিগুলো তৈরি হয় তখন আমার বিবেচনায় দুটো বিষয়ে সতর্ক হওয়া দরকার । একটা হচ্ছে 'পার্টির নেতৃত্বে আন্দোলন হচ্ছে না সুতরাং তাকে খারিজ করতে হবে' এ দৃষ্টিতে দেখা ঠিক হবে না। আসলে বহু ধরনের আন্দোলনের মধ্য দিয়েই চিন্তা ও সংগঠন একটা পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায়। যেখানে পার্টি একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। কিন্তু পার্টির বাইরে কিংবা পার্টির সাথে সম্পর্কিতভাবে বহু ধরনের আন্দোলন যদি একটা সমাজে তৈরি না হয় সে সমাজ কিন্তু বিপ্লবের দিকে যেতে পারে না। রাশিয়া চীনসহ কোন দেশেই উদাহরণ নেই

যে একটি একক পার্টির নিয়ন্ত্রণেই সবকিছু হয়েছে। বরং পার্টির বাইরেও অনেক ধরনের আন্দোলন তৈরি হয়েছে। সুতরাং প্রতিষ্ঠিত মতাদর্শ, প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রকে প্রশ্ন করছে, আঘাত করছে এরকম সব আন্দোলনকেই আমাদের হিসেবের মধ্যে রাখতে হবে, খারিজ করা যাবে না। এটা হল এক নম্বর। আর দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক মতাদর্শিক স্থুল দিশা ছাড়া ঐ আন্দোলনগুলির ওপর সম্পূর্ণরূপে ভরসাও করা যাবে না যে, এর মাধ্যমেই একটা বড় কিছু হয়ে যাবে। এই দুটো বিষয়ই মনে রাখা দরকার।

ইসলামপন্থীদের সাথে ঐক্যের প্রসঙ্গ

প্রশ্নঃ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ে ইসলামপন্থীদের সাথে বামপন্থীদের কোন ঐক্যবদ্ধ লড়াই সম্ভব কিনা।

উত্তর : ইসলামপন্থী আন্দোলনের যে প্রসঙ্গটা এসেছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ। সবকালে সবদেশে আমরা দেখি যে, শ্রেণী সংগ্রাম হোক বা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই হোক, সেই লড়াইগুলোর মধ্যে সংস্কৃতি ধর্ম বিভিন্নভাবে ভাষা পেতে পারে। মেক্সিকো বা ল্যাটিন আমেরিকায় যে আন্দোলনগুলো হচ্ছে সেখানে দেখি তাদের সংস্কৃতি বা আদিবাসী সংস্কৃতি বা এথনিক মিথ ব্যবহার করে তারা অনেক শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। মিথ থেকেই তারা শক্তিসঞ্চয় করেছেন। আফ্রিকাতেও আমরা এ ধরনের অভিজ্ঞতা পাই। ল্যাটিন আমেরিকাতে আরেকটি বড় ঘটনা তৈরী হয়েছে লিবারেশন থিওলজির মাধ্যমে। কিউবা, নিকারাগুয়া এবং সবশেষে ভেনিজুয়েলা, বলিভিয়ায় যে রূপান্তরগুলি হচ্ছে সেখানে চার্চেরও একটা ধারা পাই সরাসরি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সরাসরি নিজের অবস্থান যারা ঘোষণা করে।

তারা বলে ঈশ্বর হচ্ছেন জনগণের প্রভু, জনগণের প্রভু যদি হয় তাহলে অবশ্যই পুঁজিবাদের শত্রু। ঈশ্বর কখনো পুঁজিবাদকে সমর্থন করতে পারেন না। ঈশ্বর কখনো সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করতে পারেন না। সুতরাং যদি কেউ ঈশ্বরের এবাদত করতে চায়, উপাসনা করতে চায় তাহলে অবশ্যই তাকে পুঁজিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। এটা চার্চের একটি নির্দিষ্ট ধারার বক্তব্য যা তৈরি হয়েছে ল্যাটিন আমেরিকায়। বিশেষত যারা 'লিবারেশন থিওলজি' নামে পরিচিত। তাহলে ধর্মের ভাষা দিয়েও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী একটা লড়াই হতে পারে। ধর্মের ভাষা দিয়ে শ্রেণী সংগ্রামও হতে পারে। তবে এসবই নির্ভর করে ধর্মের ব্যাখ্যার ওপর। মুক্তিযুদ্ধের সময় আল্লার নাম বলে মানুষ জবাই হয়েছে আবার আল্লার নাম বলে মানুষ নির্যাতকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জীবনও দিয়েছে।

আল্লাহর নাম বলে লড়াই করার চেষ্টা হয়েছে। সুতরাং এক আল্লাহই বহুভাবে উপস্থিত হতে পারেন। মানে ধর্মের বহুরকম ভাষা তৈরি হতে পারে।

এখন বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বা সারা পৃথিবীতে যে ইসলামপন্থী গ্রুপগুলি আছে সেটার পরিস্থিতি কী? আমরা আল কয়েদা বা ওসামা বিন লাদেন নামে যা যা দেখি, যাকে যুক্তরাষ্ট্র তাদের জন্য নিরাপত্তা হুমকি হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং তাকে সামনে রেখে সারা দুনিয়াকে নরক বানাচ্ছে। এই পরিস্থিতির তিনটা দিক আছে। প্রথমত, আসলেই কিছু কিছু ইসলামপন্থী গ্রুপ সক্রিয়ভাবে কাজ করছে যারা সাম্রাজ্যবাদকে গ্রহণ করেনা। সাম্রাজ্যবাদকে তারা কিভাবে গ্রহণ করেনা, সেটা অবশ্য খেয়াল করা দরকার। তারা সাম্রাজ্যবাদ বলতে কী বোঝায়- সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদ, তার যে মানুষ ও পরিবেশ বিধ্বংসী চরিত্র সেটার বিরোধিতা করে, না খ্রিস্টান ও ইহুদীদের বিরোধিতা করে- সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এটার একক কিংবা অভিন্ন বৈশিষ্ট সবগুলোর মধ্যে নাই। এর মধ্যে বিভিন্ন ধরন আছে।

দ্বিতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়া থেকে আরেকটি ইসলামপন্থী ধারা আমরা পাই, যাকে আসলে তৈরী করা হয়েছে। তারাই মেনুফ্যাকচার করছে। জনগণকে জুজুর ভয় দেখানোর জন্য তারা একটি গ্রুপ তৈরি করছে বা তার প্রচার করছে। এই জুজুর ভয়ের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণতো এখন একটা আতঙ্কগ্রস্ত জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। কারণ সারাক্ষণ যদি আপনি জনগণকে আতঙ্কিত করতে থাকেন যে ইসলামী সন্ত্রাসীরা সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করেছে, তারা দুর্ভেদ্য, সব জায়গা থেকে আক্রমণ করতে পারে, তাহলে সম্ভাব্য আক্রান্ত জনগোষ্ঠী তো এক ধরনের মনোবৈকল্যে ভুগবেই। কখন কোন দিক থেকে কে বোমা মারে তার তো ঠিক নেই। চারদিকে আতঙ্ক। এর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে একটা প্রচণ্ড প্যাথলজিক্যাল ঘৃণা তৈরি হচ্ছে। মুসলিম পোশাক, মুসলিম নাম, দাড়ি দেখলেই তাদের মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হয়ে বর্ণবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এটা প্রধানত যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানুফ্যাকচারিং মিডিয়া থেকে হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের শাসক শ্রেণীর জন্য এটা দরকার। কারণ তার তো একটা শত্রু দরকার। সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পরে তার সামনে দৃশ্যমান এবং উপস্থাপন করার মত শত্রু নেই, যাকে দেখিয়ে নিজের সমস্ত অপকর্ম সে জায়েজ করতে পারে। তাদের যে মিলিটারি অবকাঠামো ও বিনিয়োগ তার যৌক্তিকতা কী, যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন না থাকে? কী কারণে তুমি মানুষকে ক্ষুধার্ত রেখে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত রেখে এত অস্ত্র বানাচ্ছ, এত বোমা মজুদ রাখছ, মিলিটারির পেছনে এত টাকা খরচ করছ তার তো একটা কারণ বা যুক্তি জনগণকে দেখাতে হবে। সেজন্য তারা এই কাল্পনিক শত্রু খাড়া করে জনগণকে ধোকা দিচ্ছে। সুতরাং এর প্রধান ভুক্তভোগী হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ। তারপর হচ্ছে সারা দুনিয়ার মানুষ।

তৃতীয় দিকটি হল বিভিন্ন দেশে-এখন বাংলাদেশেও এটা আমরা দেখেছি যে, রাষ্ট্র কীভাবে তার নিজের নিরাপত্তা বলয় তৈরি করার জন্য এই ধরনের জিনিসগুলি তৈরি করছে। যেমন বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরে র‍্যাবের মহাপরিচালক বললেন যে, বাংলাদেশে কোন জঙ্গী নেই। জঙ্গীর কোন হুমকি নেই। তার কয়েক দিনের মধ্যেই হঠাৎ করে দেখা গেল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকজন আসা শুরু হল এবং "সিকিউরিটি থ্রেট" হিসেবে সরকার নানান কিছু বলতে থাকল। ফলে বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক ও জাতীয় চুক্তি শুরু হয়ে গেল।

আমি একটা বিষয় উন্মুক্ত রাখতে চাই। ইসলামপন্থী গোষ্ঠীর সাথে বা ইসলামপন্থী রাজনীতির সাথে বামপন্থীদের কোন ধরনের সমঝোতা বা আলোচনা হতেই পারে না এটা আমি মনে করি না। হতে পারে কিন্তু সেরকম গোষ্ঠী বাংলাদেশে কোথায় যারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বা শোষণ লুণ্ঠন বিরোধী পরিষ্কার অবস্থান নিয়েছে? এখন ইসলামপন্থী গোষ্ঠী যারা, যারা এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান-তাদের মধ্যে প্রকৃত ইসলামপন্থী গ্রুপ আর ম্যানুফ্যাকচারড গ্রুপ এ দুয়ের মধ্যে একটার সাথে আরেকটা একাকার হয়ে যাচ্ছে। যেমন, বাংলা ভাইয়ের মতো লোকের উদ্ভব। গত সরকারের জ্যামাতী মন্ত্রী বললেন যে, বাংলা ভাই বলতে কারো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু দেখা গেল বাংলা ভাই মানুষ জন ধরে ধরে মারছে। বিশেষ করে যারা বাম এবং সর্বহারা তাদের মারছে, তাদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। সেসময় নিজামী একটা কথা বললেন, 'ওরা যাদেরকে মারছে (মানে বাংলা ভাইরা), তাদেরকে তো মারার দরকারই ছিল। সেজন্য মারছে।' তার মানে সরকার তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে বাংলা ভাইদের দিয়ে। আবার একসময় সেই সরকার বাংলা ভাইদের ওপর থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিল। তাদের ধরপাকড় করল। বিচার করল, হত্যা করল। কিন্তু তাদের কথা আমরা শুনলামনা, তাদের কাছ থেকে জানতে পারলামনা আসলে কী ঘটেছিল। লুৎফুজ্জামান বাবরের সাথে কী কী মিটিং হল, কী কী কথা হয়েছিল। পুরো ঘটনাটা এখন পর্যন্ত একটা রহস্য হয়েই থাকল। ফাঁসি টাসি হয়ে শেষ হয়ে গেল। এখানে বাবর বা যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের কী ভূমিকা ছিল তা জানা গেলনা।

যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস কয়দিন আগেও বলেছে যে, ঢাকা এয়ারপোর্টে একটা হামলার সম্ভাবনা আছে। কিংবা মার্কিন দূতাবাসে কে যেন ফ্যাক্স পাঠিয়ে বলল বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া হবে দূতাবাস। এরকম একেকটা কথাবার্তার পরে বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদের পক্ষে বা ফ্যাসিবাদের নতুন নতুন পদক্ষেপ আসে সরকারের পক্ষ থেকে। একটা চুক্তি হয়, একটা বাহিনী হয়। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই বিএনপির সময় র‍্যাব গঠিত হল নিরাপত্তার (সিকিউরিটির) কথা বলে। প্রথমে অপারেশন ক্লিন হার্ট, ক্রসফায়ার, এনকাউন্টার চলতে শুরু করল। এসব

চলার মধ্য দিয়ে এখন ভয়ঙ্কর ব্যাপার হচ্ছে মানুষের মধ্যেও এখন একটা এরকম ধারণা তৈরি হয়েছে রাষ্ট্র যত ফ্যাসিবাদী হবে সিকিউরিটি তত বেশি নিশ্চিত হবে। রাষ্ট্র কাউকে ধরে যদি বলে সে সন্ত্রাসী তাহলে সে সন্ত্রাসী। তাকে যদি হত্যা করা হয় তাহলে সেটা ঠিক আছে। তাকে হত্যা না করলে সন্ত্রাস যাবে না, নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে না। জনগণের মধ্যে এরকম যে চিন্তা এটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। সরকার যা করছে তাতো তার স্বার্থে করছে। কিন্তু জনগণের মধ্যে যে একটা সম্মতি তৈরি হয়েছে এটা আরও ভয়ঙ্কর। ভারতেও এটা ব্যাপকভাবে হচ্ছে। বলা যায় গ্লোবাল ফ্যাসিজমের একটা অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ভূমিকা পালন করছে।

যাই হোক, বাংলাদেশের ইসলামপন্থী রাজনীতির ওপর এক সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিপূর্ণ সমর্থন ছিল। আইউব খানের সময়, ১৯৭১ সালে। এই যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সেটাই ইসলামপন্থীদের মধ্যে বিপ্লবী চিন্তার বিকাশটা এখানে ঘটতে দেয়নি। মওলানা ভাসানীর কথা চিন্তা করেন। ভাসানী তো ইসলামের একটা ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। যে ব্যাখ্যা ছিল শোষণের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সাম্যের পক্ষে। কিন্তু ভাসানী কোন ধারা তৈরি করতে পারেননি। তিনি একাই ছিলেন। তার অনুসারীরা পরে এটি ধরে রাখতে পারেননি। আলাদা কোন ধারা হিসেবে দাঁড় করাতে পারেনি। তার ফলে যেটা ল্যাটিন আমেরিকায় সম্ভব হয়েছে লিবারেল থিওলজির মধ্য দিয়ে- একটা ব্যাপক ঐক্য - সেটা বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। কিন্তু তারপরও আমি একটা জায়গা রাখতে চাই। হয়নি মানে যে হবে না তা নয়। হতে পারে। যারা ইসলামপন্থী রাজনীতি করেন তাদের মধ্যে একটা বড় পরিবর্তন হতে পারে- নতুন কোন ধারার মধ্য দিয়েও তা আসতে পারে। শোষণের, লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে তারা দাঁড়াতে পারে। সে সম্ভাবনাটা রাখতে চাই। কিন্তু এখন পর্যন্ত তার কোন লক্ষণ দেখছি না।

কাশ্মীর ও যুক্তরাষ্ট্র-ভারত-ইসরাইল অক্ষ

আমার মতে কাশ্মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণের বিষয়ে সব বামপন্থীরাই বলেন। কাশ্মীরে দমনপীড়নে ভারতকে সমর্থন করে এরকম বাম তো দেখিনাই। বিরোধিতার মাত্রা হয়ত একটু এদিক সেদিক থাকতে পারে। আরেকটা হল যুক্তরাষ্ট্র ভারত এবং ইসরাইল অক্ষ শক্তি। মধ্যপ্রাচ্যে সৌদি আরব যুক্তরাষ্ট্রের আরেকটি ঘুঁটি ইসরাইল তো যুক্তরাষ্ট্রের খুব ভালো একটা ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে কাজ করছে। ইসরাইল এখন তার নিজের দেশের জনগণের ওপরও একটা ভয়ঙ্কর দানব হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। খোঁজ খবর নিলে দেখবেন যে, ইসরাইলে বাম রাজনীতি আছে, গণতান্ত্রিক রাজনীতি আছে, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিও আছে। মাঝে মধ্যে তারা একটু শক্তিশালী অবস্থায় আসে। যখনই তারা একটি শক্তিশালী হয় তখনই একটা

বোমা টোমা ফাটে। ফলে বাম এবং র‍্যাডিক্যালরা ইসরাইলে দাঁড়াতেই পারে না। ইসরাইল এখন এমন দানব হয়েছে যে, বিভিন্ন দেশে গুপ্ত ঘাতক হিসেবে অন্ত র্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য তাদের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদকে রীতিমত ভাড়া করা হয়। ইরানের শাহানশা মোসাদকে ভাড়া করেছিল খোমেনিকে খুন করার জন্য। এভাবে বিভিন্ন দেশে মোসাদের বাহিনী বিভিন্ন অপারেশনের সাথে যুক্ত থাকে, বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কর্মতৎপরতা নস্যাতের জন্য। সারা বিশ্বে খুনি হিসেবে মোসাদ খুব কুখ্যাতি এবং মার্কিন প্রশাসনের কাছে খুব সুখ্যাতি অর্জন করেছে।

যুক্তরাষ্ট্র, ভারত এবং ইসরাইলের এই অক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে রাশিয়া এবং চীনকে আপনি স্থায়ী কোন অবস্থান পালনকারীর ভূমিকায় আশা করতে পারেন না। রাশিয়া এবং চীনের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের একটা দ্বন্দ্ব আছে। রাশিয়া আবার চেষ্টা করছে নিজের মতো করে দাঁড়াতে। একটি জাতীয়তাবাতী চেতনা সেখানে দাঁড় করার চেষ্টা চলছে। তারা পৃথিবীর দুটি বড় শক্তির একটি ছিল একসময়। এখন তার কোন খবর নেই। অতীতের গৌরবের কথা ভেবে বর্তমানকে নিয়ে তারা অনেকটা লজ্জিত। এখন আবার ঐ ধরনের ক্ষমতাবান অবস্থায় ফিরে যাবার একটা তাগিদ তৈরি হয়েছে। আবার চীন- তার মধ্যে সুপার পাওয়ার হওয়ার জোর গতি দেখা যাচ্ছে। সুতরাং তাদের দুজনের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা দ্বন্দ্ব আছে। কিন্তু তারা এই দ্বন্দ্বকে একটা বৈরি পর্যায়ে নিয়ে যাবে না। তারা একটি সমঝোতার মধ্য দিয়ে যাবে। মাঝে মধ্যে তাদের মধ্যে সেটা নিয়ে দর কষাকষি হতে পারে। কিন্তু কোন বৈরি পর্যায়ে যাওয়ার মতো অবস্থা এখনই হয়নি। কারণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পর্যায় কোন দ্বন্দ্বের মধ্যে যাওয়ার মত অবস্থান চীন বা রাশিয়া নিচ্ছেনা। তারা সবাই এখন বিশ্ব পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যেই আছে।

চীন সম্পর্কে গত বছর যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ধ্বসের সময় তাদের প্রধান মুখপত্র ইকনোমিস্ট পত্রিকায় লিখেছিল, 'সত্তর দশকে আমরা বলতাম একমাত্র পুঁজিবাদই চীনকে বাঁচাতে পারে। এখন আমরা বলি কেবল মাত্র চীনই পুঁজিবাদকে বাঁচাতে পারে।' চীনের যে প্রবৃদ্ধি এবং তার যে নিরবতা- মানে কোন ধরনের দ্বন্দ্বে সে যাচ্ছেনা, কিংবা মিলিটারি পাওয়ার হিসেবেও দাঁড়াচ্ছেনা এবং যুক্তরাষ্ট্রের যে বৈশ্বিক কৌশল সেটার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিচ্ছে- চীনের রাজনৈতিক ভূমিকা এবং নিরবতা এই দুইটাই কিন্তু অনেকখানি বিশ্ব পুঁজিবাদকে রক্ষা করছে। তা না হলে এদের অভ্যন্তরীণ সঙ্কট আরো তীব্র আকার ধারণ করতো। সুতরাং এই চীন এবং রাশিয়ার কাছ থেকে এটা এখন আশা করা যায় না যে, তারা সাম্রাজ্যবাদ এবং পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়াবে।

জাতীয় সম্পদ রক্ষা আন্দোলন

প্রশ্ন: তেল গ্যাস নিয়ে আন্দোলনের কারণে আপনার ওপর হামলা হয়েছে। তেল গ্যাস দুর্নীতির সাথে কারা জড়িত। বিশ্বব্যাপী এসব বিষয়ে নানা কথা শোনা যায়।

উত্তর : প্রথমে শেভ্রন বিষয়ে বলি। বহুজাতিক কোম্পানীর সাথে যেসব চুক্তি হয়, লেনদেন হয়, চেক হস্তান্তর হয় তার সবকিছু তো আর দেখা যায় না। আর সবকিছু তো টাকার লেনদেনে হয় না, নানা বিষয় থাকে। যেমন এখানে একটা চুক্তি হল তার বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রে কেউ একটা সুবিধা পেল। কিংবা সুইস ব্যাংকগুলো আছেই সব ক্রিমিনালদের টাকা রাখার জন্য। সেখানে টাকা জমা হলে তার খবর তো আর কারো পক্ষে রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা যেটা বুঝতে পারি সেটা হল কী কারণে এই চুক্তিগুলো হয় এবং এই চুক্তিগুলো রক্ষার জন্য কারা কারা প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকে। এগুলো থেকে আমরা ধারণা করতে পারি। মার্কিন কোম্পানী শেভ্রন তেল কোম্পানী এখন যে গ্যাস ব্লকগুলোতে আছে সেখানে প্রথমে ছিল অক্সিডেন্টাল। সেটাও ছিল মার্কিন কোম্পানী।

অক্সিডেন্টাল থাকাকালেই ১৯৯৭ সালে মাগুরছড়ায় বিস্ফোরণ হল। এ বিস্ফোরণে যে পরিমাণ গ্যাস ধ্বংস হয়েছে তাতে আড়াইশ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন সম্ভব। তার ক্ষতিপূরণের টাকা এখনো আসে নাই। সেই ক্ষতিপুরণের টাকা যাতে না দিতে হয় সেজন্য তদন্ত কমিটির ফাইল হারিয়ে গেল। দুই বছর গেল। এরপর পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান বদল হল। নতুন চেয়ারম্যান আসলেন। তিনি ফাইল কেবিনেট খুলে দেখেন ঐ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট। এগুলো হারিয়ে যায় এভাবেই, থাকলেও বলে নাই। এরপর অক্সিডেন্টাল তার এই ব্যবসা বিক্রি করল আবার আরেকটি মার্কিন কোম্পানী ইউনোকলের কাছে। এই যে বিক্রি হল, কে তাদের বিক্রি করার অনুমতি দিল? ক্ষতিপূরণের টাকা দেয় নাই, কিন্তু কেনাবেচা হল। অক্সিডেন্টাল ভালো লাভ করে দেশ থেকে চলে গেল। অনুমতিটা কে দিল? পেট্রোবাংলাকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলে বিক্রির অনুমতির বিষয়ে আমরা কিছু জানি না।

এই যে না জানা, জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের সাথে চুক্তি হচ্ছে, এক কোম্পানী আরেক কোম্পানীর কাছে বিক্রি করছে, ক্ষতিপূরণের টাকা না দিয়ে চলে গেল, খোঁজ খবর নাই - ব্যাপার কী? তারপর যখন নতুন সরকার এল তখন ক্ষতিপূরণের বিষয়ে কথা বলার জন্য ইউনোকলকে ডাকার কথা। সেসময় জ্বালানী সচিব ছিলেন এই এখনকার উপদেষ্টা তৌফিক এলাহী চৌধুরী। যার কারণে ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়া গেলনা, কিংবা অক্সিডেন্টাল ইউনোকলের কাছে ব্যবসা বিক্রি করতে পারলো। সংসদীয় কমিটি ইউনোকলের সাথে চুক্তিটা দেখতে চাইল। কিন্তু বাধা

দিলেন এই তৌফিক এলাহী চৌধুরী। তারপর সরকার পরিবর্তন হল। নতুন সরকার এলো। চারদলীয় জোট সরকারের সময় জ্বালানী প্রতিমন্ত্রী হলেন মোশাররফ হোসেন। তিনি ময়মনসিংহের এমপি। মোশাররফ হোসেন সেই ব্যক্তি -আশির দশকে এরশাদের সময় কাফকো চুক্তি, হরিপুর তেলক্ষেত্রে চুক্তির সময় তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ছিল। বিএনপি প্রথম বার যখন ক্ষমতায় এল তখন তার বিরুদ্ধে মামলা করল। বিএনপি সেই সময় এরশাদের বিরুদ্ধে খুব সিরিয়াস ছিল। সেজন্য এরশাদের যারা সাঙ্গপাঙ্গ ছিল তাদের বিরুদ্ধে বিএনপি মামলা করল। মামলায় মোশাররফের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হল। তার বায়োডাটায় নতুন একটি বিষয় যোগ হল যে, সে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত এবং দণ্ডিত।

এই দুর্নীতি যে একটা যোগ্যতা হিসেবে কাজ করে সেটা বোঝা গেল চারদলীয় জোট ক্ষমতায় আসার পর যখন তাকে জ্বালানী প্রতিমন্ত্রী করা হল। যাকে বিএনপি সরকারই দুর্নীতির দায়ে দণ্ডিত করল, সেই বিএনপি সরকারই আবার তাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিল, আর মন্ত্রী থাকলেন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া- তার সময়ে নাইকো এল। এশিয়া এনার্জি তো পুরো জ্বালানী মন্ত্রণালয় ধরে অগ্রসর হল। এই যে বহুজাতিক কোম্পানী, তাদের এখানে আগমন, তাদের চুক্তি এবং চুক্তির যেসমস্ত শর্ত তার সবকিছুই ছাড়া আর কীভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে। এখন কত হাজার কোটি টাকা যে দূর্নীতি হয়েছে এটা আমি সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারব না। তবে বাংলাদেশে যেভাবে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো লোকজন কেনে- আমলাদের যে দামে কেনা হয়, আমলা কিনতে গেলে বিদেশে সফর দিয়ে ভালো কাজ হয়, কনসালটেন্টদের কয়েক লাখ টাকা দিলে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও কয়েক লাখ টাকা করে কেনা যায়- তাতে খুব বেশি টাকা তাদের লাগে না আসলে। এখন হয়ত চাহিদা কিছুটা বাড়ছে।

সর্বশেষ যে দুর্নীতি হয়েছে সেটা আমরা সুনির্দিষ্টভাবে দেখি এই সরকারের সময়। একটি পুরনো কম্প্রেসার মেশিন কেনার কাজ বিনা টেন্ডারে শেভ্রনকে দেয়া হয়েছে। এর দাম ৫৫ মিলিয়ন ডলার। এই ৫৫ মিলিয়ন ডলারের অর্ধেক টাকা যদি ঠিক জায়গামত খরচ করা হত তাহলে বাংলাদেশে গ্যাস সঙ্কট, বিদ্যুৎ সঙ্কটের এরকম চেহারা থাকতো না। দুর্নীতি ছাড়া তো এর আর কোন কারণ নেই। এখন এই কাজগুলি সারা দুনিয়াজুড়ে যে কোম্পানীগুলি করে- সেই কোম্পানীগুলি তো বিশ্ব পুঁজির প্রতিনিধিত্ব করে একটা ইনস্টিটিউশনাল গ্রুপ হিসেবে। তাদের এই কাজগুলি তো শান্তিপূর্ণভাবে, বিনা বাধায়, বিনা প্রতিবাদে করতে পারে না। বিনা বাধায় করতে পারে না বলেই তো তারা নির্যাতন নিপীড়ন, সামরিক শাসন, স্বৈরশাসন, বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করে। তার সাথে ইদানীংকালে যেটা গ্রহণ

করছে সেটা হচ্ছে সন্ত্রাস কিংবা নিরাপত্তা। এই নিরাপত্তার ব্যাপারটা বা আতঙ্কের ব্যাপারটা আগেও ছিল।

যেমন ধরুন আশির দশকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রেগান বললেন নিকারাগুয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটা সিরিয়াস থ্রেট। আপনরা যদি ম্যাপ দেখেন তবে ম্যাপে যুক্তরাষ্ট্রের পাশে নিকারাগুয়াকে খুঁজেই পাবেননা। কিন্তু তারপরও সে বলছে নিকারাগুয়া হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য থ্রেট। নিকারাগুয়ায় তখন বিপ্লব হয়েছিল ওর্তেগার নেতৃত্বে, সেটাই অপরাধ। মার্কিন জনগণকে বলা হল, নিকারাগুয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ চালাবে এবং মার্কিন জনগণের নিরাপত্তা বিনষ্ট করবে, সুতরাং নিকারাগুয়ার এই সন্ত্রাসীদের ধ্বংস করার জন্য বাজেট দিতে হবে। কন্ট্রা নামে একটা কাউন্টার রেভ্যুলশনারী ফোর্স দাঁড় করানো হল, সেজন্য কংগ্রেস থেকে অনুমোদন নিয়ে তাদের টাকা দেয়া হল। কন্ট্রা বাহিনীর কাজ হল নিকারাগুয়ার স্কুলে ও হাসপাতালে বোমা মারা, বিভিন্ন ধরনের অন্তর্ঘাত চালানো। যেটি এর আগে কিউবাতে করেছে সেই একই কাজ তারা নিকারাগুয়াতে করতে থাকল। এরকম বাহিনীর পেছনে তারা টাকা খরচ করে। আতঙ্কটা তাদের একটা প্রধান অবলম্বন। কারণ সোভিয়েত ইউনিয়ন যতদিন ছিল ততদিন একটা সুবিধা ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন যাবার পর আতঙ্কটাই হল তাদের প্রধান অস্ত্র। 'এরা ভয়ঙ্কর এদের হাতে যাতে পরমাণু অস্ত্র না যায়', আপনি চিন্তা করেন একটা কনফারেন্স হল পরমাণু বিষয়ে। এর মূল এজেন্ডা হল আল কায়েদাসহ অমুক তমুকের হাতে যাতে পরমাণু অস্ত্র না যায়। রাষ্ট্রের হাতে পরমাণু শক্তি আছে। এখন ব্যক্তির হাতে পরমাণু অস্ত্র চলে যেতে পারে এরকম একটা ভয় যোগ করল তারা। যেকোন সময় যেকোন ব্যক্তির হাতে পরমাণু অস্ত্র চলে যেতে পারে, হামলা চালাতে পারে। তাহলে তার জন্য এখন কি করতে হবে? নতুন নতুন সামরিক ঘাঁটি করতে হবে। নতুন নতুন বোমা বানাতে হবে। নতুন নতুন ফ্যাসিবাদী বিধান তৈরি করতে হবে। এই জায়গাটাই তারা তৈরি করছে। উন্নয়ন, শান্তি আর গণতন্ত্রের নামে সন্ত্রাসের বিস্তার।

বিশ্বব্যবস্থায় ফ্যাসিবাদী প্রবণতা ও লড়াই

সারা পৃথিবীতে বিশ্ব পুঁজিবাদের কাঠামোতে এই যে ফ্যাসিবাদের আবির্ভাব, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এটা একটা শক্তির নিদর্শন। আসলে এটা তাদের দুর্বলতার নিদর্শন, সঙ্কটের নিদর্শন। ফ্যাসিবাদী রূপ ছাড়া, একটা ভয়ঙ্কর রূপে আবির্ভাব ছাড়া তাদের অস্তিত্ব এখন আর তারা টিকিয়ে রাখতে পারছে না। যত তারা ফ্যাসিবাদী রূপ নেবে তাকে প্রতিরোধ করার জন্য মানুষের প্রতিরোধ শক্তিও ততই সহিংস আকার ধারণ করে। যেটা এখন ভারতে হচ্ছে। ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, বনে জঙ্গলে মাওবাদী হিসেবে যারা পরিচিত, তার পেছনে বিশাল জনগোষ্ঠী জড়িত আছে। যারা মাওবাদী রাজনীতি হয়ত করে না কিন্তু তারা সমর্থন দিচ্ছে। কারণ

তাদের জীবন এখন এমন জায়গায় গেছে যে, বেঁচে থাকার জন্য তাদের এখন প্রধান অবলম্বন হচ্ছে অস্ত্র হাতে নেয়া। অস্ত্র হাতে নিলে তবু কিছুদিন লড়াই সংগ্রাম করে বেঁচে থাকা যাবে।

ভারতকে একটি বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা হয়। শ্রেণী, লিঙ্গ তো বটেই ধর্ম ও জাত বৈষম্য ও নিপীড়নে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্র এটি। রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ব্যবস্থা এখন আরও বিস্তৃত হয়েছে। অরুন্ধতী রায়ের হিসেব মতে ভারতের এক তৃতীয়াংশ এখন সামরিক শাসনের অধীনে। তাহলে আমরা যে তাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলি এটাতো একটা মিথ আসলে। এক তৃতীয়াংশে সামরিক শাসন চললে সেটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয় কী করে? মাওবাদী রাজনীতি, মাওবাদী দর্শন তো অভিন্ন বিষয় নয়। এর মধ্যে আবার বহুরকম ভাগ আছে, মতপার্থক্য আছে। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে একটা রেভ্যুলেশনারী গ্রোথ তো অনিবার্য। এটা করতেই হবে, কিন্তু তার রূপ নির্ভর করবে দেশের বিদ্যমান অবস্থা ও পরিবেশের উপর।

আপনি প্রশ্ন করলেন বাংলাদেশে যদি কোন দেশপ্রেমিক শক্তি ক্ষমতায় যায় তাহলে এসব চুক্তি বাতিল করতে পারবে কিনা। চুক্তি বাতিলের পক্ষে প্রধান একটা যুক্তি হচ্ছে, এই চুক্তিগুলো হচ্ছে গোপনে। চুক্তিগুলো যেহেতু গোপন সেহেতু এতে জনগণের কোন দায়দায়িত্ব নেই। আন্তর্জাতিকভাবে আইনগত একটা ধারা আছে, অডিয়াস ডেট বলে, উত্তর আমেরিকাতে এটা শুরু হয়। এর মূল কথা হল, কোন সরকার যদি এমন চুক্তি করে যে সম্পর্কে জনগণ জানেনা সেটার কোন দায়দায়িত্ব জনগণ গ্রহণ করবে না। সুতরাং তারা সেটাকে অস্বীকার করতে পারে। নীতিগতভাবে এটাই হল অবস্থান। বাংলাদেশে যারা দেশ চালায় তারা যদি নিজেদের কোন স্বার্থ দ্বারা আবদ্ধ না থাকে তাহলে এগুলো বাতিল করা কোন সমস্যা নয়। এমনকি চুক্তির মধ্যেই এমনসব ধারা আছে যেমন অনেক বহুজাতিক কোম্পানীর মধ্যে কৃত চুক্তিতে এমন ধারা আছে যেগুলো ধরেই তাকে বাতিল করা যায়। তারা এমন অনিয়ম করে, দুর্নীতি করে যে ওগুলো ধরেই বাতিল করা সম্ভব। যেটা ভেনিজুয়েলায় হুগো শ্যাভেজ করেছেন। বহুজাতিক কোম্পানী লন্ডনে ভেনিজুয়েলার বিরুদ্ধে মামলা করেছে। সেখানে তাদের মোকাবিলা করতে হয়েছে। সেখানে ভেনিজুয়েলা জিতেছেও।

ভেনিজুয়েলা যেটি করেছে সেটা হল বহুজাতিক কোম্পানী যেসব অনিয়ম করেছে সেগুলোকে ধরেই আইনগত পথে তা বাতিল করেছে। এখনকার সাম্রাজ্যবাদ তো বিভিন্ন ধরনের নীতি চুক্তির মধ্যে টিকে আছে এবং তার ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন আছে। সুতরাং তাকে আইনগতভাবে মোকাবেলা করতে হলে এসমস্ত দিক যথেষ্ট মনোযোগের সাথে খেয়াল করতে হবে। এসব জায়গায় যথেষ্ঠ পরিপক্কতা না আনলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই করা যাবে না।

সাম্রাজ্যবাদীরা বোমা ফেলছে আর আমি 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই' বলে মিছিল বের করলাম এটাই শুধু সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই না। এখন প্রত্যেকটা মন্ত্রণালয়, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ উপস্থিত আছে। কোন না কোন চুক্তির মাধ্যমে, কোন না কোন অর্থ সংস্থানের মাধ্যমে, কোন না কোন কনসালটেন্টের মাধ্যমে তারা আছে। ঐ জায়গাগুলি যদি না বুঝি এবং বলি যে, আমি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই করব, সাম্রাজ্যবাদ খারাপ তাহলে এর কোন অর্থ হবে না।

বামপন্থীদের দুর্বলতা

একজন যে প্রশ্ন করলেন বামপন্থীরা যখন ম্যাচ্যুরিটি অর্জন করে তখন বিক্রি হয়ে যায় বা অন্য দিকে চলে যায়। কথাটা এভাবে বললে হবে না। ম্যাচিউরিটি অর্জন করছে মানে কী? কেউ হয়ত শরীর স্বাস্থ্যে উন্নতি করেছে। কিংবা এটাকে এভাবে বলা যায় ম্যাটেরিয়াল বেনিফিট পাওয়ার আকাঙ্খাটা তৈরি হল। ধরেন একজন বামপন্থী রাজনীতি করত। এরপর আমলা হল। তারপর নিজেকে আস্তে আস্তে ঐটার সাথে এডজাস্ট করল। আমলা মানে কী? যতক্ষন পর্যন্ত ইয়ং থাকে ততদিন সে স্বাধীন থাকে। সিনিয়র হলে পরে তার আর চিন্তার কোন স্বাধীনতা থাকে না। থাকলে সে আমলা হিসেবে কাজ করতে পারবে না। কারণ তাকে তো সব সময় অর্ডার ফলো করতে হবে।

একজন বামপন্থী যখন এইপথে যায় কিংবা ব্যবসা বাণিজ্য করল কিংবা যখন কনসালটেন্সিতে গেল এটা হঠাৎ করে হয় না। আমরা যদি খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাব, অনেক ধরনের দূর্বলতা বা স্ববিরোধিতা তার মধ্যে আগেই ছিল। এগুলি তার মধ্যে ধীরে ধীরে বিকশিত হতে হতে এক পর্যায়ে সে পুরোপুরি শত্রুপক্ষের হয়ে যায়। যেমন 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাক যাক ধ্বংস হোক' এইসব শ্লোগান মিছিল যা হয়, এসব শ্লোগান যদি একজন সত্যিকার অর্থে বোঝে, এর সাথে যদি কেউ আদর্শগতভাবে একাত্ম হয়, এর অর্থ যদি কেউ বোঝে, তাহলে সে পরবর্তী জীবনে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার কাজে বা সেরকম পেশায় কী করে যায়? তার মানে তার রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা সমস্যা আছে। সাংস্কৃতিকভাবে তার পরিবর্তন ঘটেনি বা বিষয়গুলি তার কাছে পরিষ্কার না। তার কাছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বলতে একটা অদৃশ্য জিনিস মনে হচ্ছে। কংক্রিট জিনিসটা তার সামনে পরিষ্কার না।

কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তো সুনির্দিষ্টভাবে বা কংক্রিটলিই আছে। এখন তেল গ্যাস কয়লা বা জাতীয় সম্পদ নিয়ে যে আন্দোলনটা হচ্ছে, এ আন্দোলনটা কংক্রিটলি সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে বিরোধিতা করছে। এটা তো কংক্রিট বিষয়। কংক্রিটলি আপনি যখন লড়াই করেন তখন আপনাকে কংক্রিটলিই ইকুইপড হতে হবে তাকে মোকাবেলার জন্য। আবার শত্রুকেও জনগণের সামনে কংক্রিটলি

আনতে হবে। তখন সে বুঝতে পারবে কার বিরুদ্ধে, কেন, কীভাবে লড়াই করবে, এ লড়াইয়ের মধ্যে তার পরবর্তী প্রজন্মের কী স্বার্থ জড়িত আছে এবং সেখানে তার আদর্শের (ইডিওলজিক্যাল) এবং তৃপ্তির (স্যাটিসফিকশনের) জায়গাটা কোথায়। রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে বা নাগরিক হিসেবে সে কী কারণে এ কাজটা করবে এই জায়গাগুলো পরিষ্কার হতে হবে। পরিষ্কার হয়ে সে যখন আসবে তখন কিন্তু সে আর এশিয়া এনার্জি বা শেভ্রনের মতো কারও স্বার্থের সাথে যুক্ত হতে পারবে না। যদি যায়ও সে নিজেই আসলেই অস্থিরতায় ভুগবে। কারণ সে নিজে জানে এটা কি ধরনের কাজ। ঠিকই, অনেক ধরনের দূর্বলতা, সাফল্য বাম আন্দোলনের আছে- দুর্বলতাই বেশি- তা না হলে বাংলাদেশের এ অবস্থা কেন?

এনজিও বহু দেশে আছে। ল্যাটিন আমেরিকায়ও আছে। বিদ্যমান ব্যবস্থা থাকবে আর এনজিও করা যাবে না এভাবে বললে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এনজিও তো এই ব্যবস্থা বা পুঁজিবাদেরই অংশ এখন। এখনকার ক্যাপিটালিজম উইদাউট এনজিও আপনি কোথাও পাবেননা। এনজিও হল তার একটা হাত বা শাখা প্রশাখা। যার মাধ্যমে সে মানুষের মধ্যে যোগাযোগ করে, সমর্থন তৈরি করে, ভিত্তি তৈরি করে বা লিঁয়াজো করে। সুতরাং বর্তমান জামানায় এনজিওর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে তার শেকড় পুঁজিবাদকে মোকাবেলা করতে হবে। সরকারের মধ্যে যেমন সরকার বিরোধী লোক পাবেন, আর্মির মধ্যে বিদ্রোহ করার লোক পাবেন আবার এনজিওর মধ্যেও এরকম এনজিও বিরোধী লোক পাবেন যারা আধিপত্য বিরোধী লড়াই করতে চায়। যেমন হুগো শ্যাভেজ আর্মি থেকে বের হয়ে এসে আরেকরকম অবস্থান নিয়েছেন। সুতরাং যারা এনজিওতে চাকরি করেন বা পেশাগতভাবে গেছেন তারা যে সবাই শত্রুপক্ষ হয়ে গেছে এটা ভাবা ঠিক নয়। কাজের অভাবে দেশের অনেকে চাকরি বাকরি করছে। তার যদি রাজনৈতিক দর্শন, আন্দোলনের বুঝ থাকে তাহলে সেও হয়ত সেখানে কোন না কোন ভূমিকা পালন করতে পারবে। যেভাবে ভূমিকা পালন করে একজন সরকারি কর্মচারি, যেভাবে ভূমিকা পালন করে একজন পুলিশ, যেভাবে ভূমিকা পালন করে সামরিক বাহিনীর কোন কোন ব্যক্তি। করেনা? নানান ভাবে সব দেশেই করে। সুতরাং কংক্রিটলি মুক্তির আন্দোলনের পথে তারাও ভূমিকা পালন করতে পারে।

এখন এর বিকাশ কীভাবে হবে এটা দীর্ঘ আলোচনার বিষয়। পরিষ্কার একটা সমাধান হয়ত আপনাদের বলে দিতে পারব না যে, এখন এই এই কাজ করলে আমরা মোটামুটি মুক্তির লড়াই এগিয়ে নিতে পারবো। কিন্তু যতটুকু বলতে পারি সেটা হল সাম্রাজ্যবাদের যে রজ্জু, অস্থি, মজ্জা ছড়ানো ছিটানো সেটা সম্পর্কে আমাদের অনেক প্রস্তুত হতে হবে। এখনকার সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের দুর্বলতার জায়গাটা কোথায় সেটা ভালো করে আমাদেরই বের করতে হবে। আমি লেনিনের

সাম্রাজ্যবাদ বইটির কথা বললাম কারণ এর মধ্যে একটা কেন্দ্রীয় লড়াইয়ের ধারাবাহিকতা আছে। কিন্তু শুধু ঐ বই পড়ে আমি বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের যোগ্যতা অর্জন করবনা।

এখনকার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে বর্তমান সময়ের সাম্রাজ্যবাদকে পুরোপুরি আমাদের বোঝাবুঝির মধ্যে আনতে হবে। সেটার জন্য যতটা যোগ্য হওয়া দরকার, যেভাবে কাজ করা দরকার তার জন্য বাংলাদেশের লেফট পলিটিক্স এখনো পুরোপুরি প্রস্তুত নয়, কিন্তু আমি সম্ভাবনা দেখি। কারণ এখন যে লড়াইগুলো হচ্ছে তা অতীতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হয়নি। যেমন আগে আমরা ৬০ এবং ৭০ দশকে ভিয়েতনামে মার্কিন বোমা বর্ষণের বিরুদ্ধে লড়াই করতাম, মিছিল করতাম। বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদ কীভাবে আছে সেটা কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে, সুস্পষ্টভাবে রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে আসে নাই। সেই রাজনৈতিক কর্মীদের কি দোষ দেয়া যাবে তারা যদি পরবর্তীকালে অন্য দিকে চলে যায়? এখন এই কাজটা অনেক বেশি সুনির্দিষ্ট ও বিস্তৃত।

তরুণ প্রজন্ম ও মানুষের লড়াইএর পথ

এখনকার তরুন প্রজন্মের মধ্যে অনেক ধরনের ঝোঁক আছে। তাদের মধ্যে এই ঝোঁকটাও আছে যে তারা নতুনভাবে যোগ্য হতে চায়- সেটা সাংগঠনিক কাঠামো, লড়াইয়ের ধরন কিরকম হবে বা লড়াইকে আপনি কিভাবে সম্প্রসারণ করবেন, আমরা কয়েকজন মিলে তো লড়াই করলে হবে না, ঐক্য দরকার, ঐক্যের ধরনটা কেমন হবে, কী কী শর্তের উপর ভিত্তি করে ঐক্য হবে, বা জনগণ কিভাবে আসবে আন্দোলনের সাথে সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। যেমন ধরেন আওয়ামী লীগের সাথেই তো লোক বেশি। বিএনপির পেছনেই তো লোক বেশি। সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ তো আওয়ামী লীগ আর বিএনপির পেছনে। তাইনা? 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' শ্লোগান দিচ্ছি আমরা আর সব মজদুর হল আওয়ামী লীগ আর বিএনপির পেছনে। তারা কেন আমাদের সাথে আসবে? আমরা যদি বলি আসেন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে লড়াই করি সে নানা অজুহাত দেখাবে, আসবে না। চাচা এক সময় বলছিল, বাবা এক সময় স্বপ্ন দেখছিল, মামা আছে আওয়ামী লীগের সাথে- নানা কারণে সে আসবে না। বিএনপি জামায়াতের লোকজনও তাই। তো কী হলে সে আসবে?

একটা অভিজ্ঞতা শুধু বলে আজ শেষ করি। সেটা হল ফুলবাড়ী গণঅভ্যুত্থান। ফুলবাড়ী আন্দোলনে দেখা গেল লক্ষ নারীপুরুষ একসাথে আসছে। অন্যান্য অঞ্চল থেকেও লক্ষ লক্ষ নারীপুরুষ আসছে। এর মধ্যে ধরেন ৫ ভাগ ছিল যারা হয়ত বাম রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। ৯৫ ভাগ হল সাধারণ মানুষ যার মধ্যে আওয়ামী লীগ বিএনপি সবাই আছে। তারা এই আন্দোলনে যখন আসল তখন

তাদের নেতারা কিন্তু আন্দোলনের বিরুদ্ধে। আওয়ামী লীগের নেতা এখনকার এমপি ফিজার সে তখন ঐ এশিয়া এনার্জির সাথে জড়িত ছিল; এখনো আছে, যেহেতু কোম্পানীগুলির সাথে তার সম্পর্ক ভালো সেই ভরসায় তাকে প্রতিমন্ত্রী বানানো হয়েছে। সংস্কার পন্থীদের মধ্য থেকে একমাত্র সেই লোক যে প্রতিমন্ত্রী হয়েছে। এই লোক তখনো ছিল।

তো নেতারা হচ্ছে সবাই আন্দোলনের বিরুদ্ধে আর কর্মী সমর্থক সবাই আন্দোলনের পক্ষে চলে এসেছে। লাখ লাখ নারী পুরুষ সবাই। কিংবা বিএনপি নেতারা, বিএনপি চারদল তখন ক্ষমতায়। তারা তো গুলি করার জন্য যা যা করার দরকার তা তা করেছে। কিন্তু তাদের সমর্থকরাও আন্দোলনের মধ্যে ছিল। তাহলে বোঝা যায় সুনির্দিষ্টভাবে যদি আন্দোলন হয়, সাধারণ মানুষের জীবনের সাথে যদি তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে, সে যদি আন্দোলন সম্পর্কে পরিষ্কার থাকে, তার স্বার্থকে যদি এর সাথে যুক্ত দেখে বা জড়িত দেখে বা জড়িত করতে পারে তাহলে সে আন্দোলনে আসবে, আপাতদৃষ্টিতে আওয়ামী লীগের বিরোধিতা না করেও। আসলে সে আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করছে কিন্তু তা সে জানেনা। কারণ আওয়ামী লীগের নেতাদের যে কেন্দ্রীয় স্বার্থ সে স্বার্থটা বহুজাতিক কোম্পানীর স্বার্থের সাথে যুক্ত। কিন্তু জনগণ যখন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীর বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে তখন মনে করে নিজেদের স্বার্থেই তারা দাঁড়িয়েছে। সে স্বার্থটা যে আওয়ামী লীগের অস্তিত্বের বিরোধী সেটা আস্তে আস্তে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পরিষ্কার হচ্ছে। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় তারা বুঝতে পারবে তার রাজনীতিটা কী হওয়া উচিত। রাজনীতিই যে ভিন্ন হওয়া উচিত সেটা পরিষ্কার হবে। বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামাত সব দলের লোকই বুঝবে। কিন্তু আন্দোলনের আগে যদি আপনি বলেন এখানে বামপন্থী ছাড়া কেউ থাকতে পারবে না, যারা কেবল সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ বিরোধী তারাই কেবল থাকবে তাহলে আপনি এ আন্দোলনের সাথে কয়জন লোক পাবেন? তার মানে সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ এবং বিপ্লব বলে গেলেই হবে না, মানুষের সামনে সুনির্দিষ্টভাবে নির্দিষ্ট করণীয় উপস্থিত করতে হবে।

গ্রামের সর্বহারা দরিদ্র মজুর কৃষক মানুষকে যদি আপনি একত্রিত করতে চান তাহলেও নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে। আপনি যে কৃষি নীতি, জিএমও, পানি নীতি বললেন তার কোন কিছুই সরকার প্রণয়ন করে না। এগুলো প্রণীত হয়। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ তারা এসব নীতি প্রণয়ন করে আর বাংলাদেশ সরকারের কাজ হল এগুলো বাস্তবায়ন করে যাওয়া। বহুজাতিক কোম্পানীর স্বার্থকে জায়েজ করার জন্য নীতিটা ঐভাবে তৈরি হয়। সেজন্য এখন কোন আন্দোলন দাঁড় করাতে গেলেও এগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট করে জানতে হবে। যারা আন্দোলনে আসবে এবং এগুলোর বিকল্প কী করা যায় সে সম্পর্কেও সুনির্দিষ্ট করে মানুষকে জানাতে হবে।

ভারতের কোন কোন জায়গায় এ জাতীয় কাজ হয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশে কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে কিন্তু এ বিষয়গুলো পরিষ্কার হয়নি এখনো। সবখাতেই যে এ বিষয়গুলো হচ্ছে তা বোঝাতে হবে। শিক্ষা খাতে এখন যে চুক্তি হচ্ছে তাতে সম্পূর্ণভাবে তাকে একটি বাজারে পরিণত করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য খাতেও তাই। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কৃষি ক্ষেত্রে অনেক ধরনের চুক্তি হচ্ছে, নীতি তৈরি হচ্ছে যে বিষয়ে সক্ষম পর্যালোচনা বাম রাজনীতির মধ্যে হচ্ছে না। এটা ছাড়া আমরা অগ্রসর হতে পারব না। সুনির্দিষ্ট আন্দোলন করতে হলে, জায়গা তৈরি করতে হলে শত্রুর যে সুনির্দিষ্ট তৎপরতা সেটাও চিহ্নিত করতে হবে।

আমাদের বাম আন্দোলনের মধ্যে এরকম মানুষজন আছে যাদের ভাব হচ্ছে এরকম যে, 'আমি বিপ্লব করতে চাই কিন্তু কংক্রিটলি কোন কাজ করতে চাইনা'। বিপ্লব করতে হলে তো আপনাকে কাজের এক ধাপের পর আরেক ধাপে যেতে হবে। প্রথম ধাপে বিপ্লব করে ফেললাম এ জাতীয় তৃপ্তি পাবেননা মানসিকভাবে, কিন্তু এই ধাপগুলো পার না হয়ে আপনি বিপ্লবী রূপান্তরের জায়গাটায়ও যেতে পারবেননা। তার মানে সুনির্দিষ্ট রূপকল্প, আদর্শিক কাঠামো এবং তার মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট কাজ- এই চর্চা যারা আগেও বাম রাজনীতি করেছেন- যারা কিছু কিছু ব্যর্থতা সত্ত্বেও এখনো টিকে আছেন, অনেক রকম হতাশা ব্যঞ্জক ঘটনা ঘটার পরেও যারা হাল ছাড়েন নাই এরকম যারা আছেন, আর যারা নতুন প্রজন্ম আছে, তাদের মধ্যে এই নতুন বিষয়গুলি তৈরি করতে হবে। এছাড়া পরিত্রানের আর কোন পথ নেই।

পুঁজিবাদ বিরোধী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে চিন্তা বিশ্বব্যাপী তৈরি হচ্ছে তা আগের চেয়ে মোটেই দুর্বল নয়। বরং তা নতুন মাত্রায় অনেক শক্তিশালী। বাংলাদেশ কী করে সেটার বাইরে থাকবে? বাংলাদেশকে তার নিজের জন্য নিজের বুঝ থেকে নিজের মতো করে কাজ এগিয়ে নিতে হবে। প্রতিরোধের, নতুন চিন্তা ও সমাজের বৈশ্বিক ঐক্য তার মধ্যে দিয়েই শক্তভাবে গড়ে উঠবে।

২০ মার্চ ২০১০
১২তম কর্মশালার সমাপনী বক্তৃতা
